কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা

সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন
ডিসেম্বর ১৯৬৮, জানুয়ারি ১৯৬৯
দশম ও একাদশ সংকলন, ১৯৭৪

প্রতিভাস

প্রতিভাস □ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ ❑ ১৭ ডিসেম্বর, ২০০২

প্রকাশক ❑ বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা-৭০০০০২

মুদ্রক ❑ বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ ❑ সুব্রত চৌধুরী

কলকাতা

কবিতা কি গল্প যেমন নীরবে, নির্জনে, নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে, সারা সংসার যখন ঘুমিয়ে, তখন একা লেখার, পত্রিকা তেমনই সরবে, চা-কফি-হুইস্কির পাত্রে ঝড় তুলে, মধুর সখ্যে সকলে মিলে গড়ার। 'আত্মহত্যার বিবৃতি' কি চার আমি একা লিখেছিই বলা চলে—কিন্তু 'কলকাতা' পত্রিকা? তা কি শুধু মাস্তুলে যাদের নাম বেরুতো—অমিয় দেব, সুবীর রায়চৌধুরী, জ্যোতির্ময় দত্ত* —সেই ত্রয়ের? অথবা যদি 'সহযোগী' সম্পাদক শুদ্ধশীল বসুকে ধরি—ঐ চার-এর? প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা যাঁর কবিতা দিয়ে শুরু, সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নয়? যাঁর তোলা প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে দাঙ্গার ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ—সেই স্টেটসম্যান-এর আলোকচিত্রী সুদিন বাগের নয়? আজকাল কেউ যখন সেই আদি 'কলকাতা' পত্রিকার সম্পাদক ব'লে কেবল আমার উল্লেখ করেন, আমি কেবল বিনয়বশত প্রতিবাদ করি না, সত্যের কারণে করি।

বিশেষত, পাঠকের হস্তধৃত বর্তমান 'বুদ্ধদেব বসু', কিংবা আশুপ্রকাশ্য 'সত্যজিৎ রায়' ও 'রাজনীতি' সংখ্যা আমরা এতোজন মিলে করেছিলাম যে ঐগুলির কৃতিত্ব একা আমি নিলে তা চুরির অধম হবে।

'রাজনীতি' সংখ্যার 'সম্পাদক' কে, বা কাহারা? শুধু গৌরকিশোর ঘোষ ও জ্যোতির্ময় দত্ত? শম্ভু রক্ষিত নন? প্রশান্ত বসু নন, যাঁকে মতাদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও শুধু ব্যক্তিগত আনুগত্যের কারণে কারাবাস করতে হয়েছিলো। কেন 'রামকৃষ্ণ দাশগুপ্ত' ছদ্মনামের আড়ালে থেকে যিনি ইন্দিরা গান্ধীর 'জরুরী অবস্থা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন সন্ধিহীন, অনামা, খ্যাতি কিংবা জেল, দুটোই উপেক্ষা ক'রে—সেই নির্ভীক নিরঞ্জন হালদার নয়? কেন শান্তিদা, কি গৌরী, কি আজিজুর নয়?

আর 'সত্যজিৎ রায়' সংখ্যা! যদি 'রাজনীতি' সংখ্যার মূল লেখক গৌরকিশোর ঘোষ, তবে স. রা সংখ্যার তারকা নিঃসন্দেহে করুণাশঙ্কর রায়। যাঁরা এখন তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের বাঘা ব্যারিস্টার কে এস রে-নামে চেনেন, তাঁরা হয়তো কল্পনাই করতে পারবেন না ষাট দশকের শেষ বর্ষের সেই সদ্যবিলাতপ্রত্যাগত চলচ্চিত্রের চলমান-বিশ্বকোষ করুণাশঙ্করকে, যাঁর প্রবাসের ছয় বছরের সিকিভাগ যদি ব্যয়িত হয়ে থাকে আইনশিক্ষায়, বাকি বারো আনা খরচা হয়েছিল চলচ্চিত্র চর্চায়। সত্যজিৎ ও করুণাশংকরের সাক্ষাৎকারের সাক্ষী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মতে তা ছিলো ভীষ্মার্জুন দ্বৈরথরণ। অর্জুন যদি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করেন, ভীষ্মের উত্তর বরুণাস্ত্র। সত্যজিতের মতে ঐ সাক্ষাৎকারই ছিলো তাঁর জীবনের

দীর্ঘতম শুধু নয়, সবচেয়ে উপভোগ্যও বটে।

যে কোনো উপলক্ষে ঐ সংখ্যাগুলির স্মৃতিরোমন্থন যে করি, তা হয়তো একটা সতর্কসংকেত—তা জানান দিচ্ছে যে আমারও হয়তো বয়সের ঝিম ধরেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে 'বুদ্ধদেব বসু' সংখ্যা বিষয়ে কয়েকটি তথ্য অন্তত ইতিহাসের প্রয়োজনে উল্লেখ্য। প্রথম বু. ব. সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন একই প্রজন্মের কিন্তু কাব্যাদর্শে দুই মেরুর দুই উৎকৃষ্ট কবি, যাঁদের উপযুক্ত মূল্যায়ণের সময় হয়তো এখনও আসেনি—নরেশ গুহ এবং অরুণকুমার সরকার। মোটা দাগে চিহ্নিত করতে গেলে, নরেশ গুহ রোমান্টিক, অরুণ সরকার ক্লাসিসিস্ট। একজন আবেগসিঞ্চিত, অপরজন আধারসচেতন। 'দুরন্ত দুপুর'এর যেমন লাবণ্য, 'দূরের আকাশ'-এর তেমনই আঙ্গিকের উপর প্রভুত্ব। উভয়ের মিল—দুজনেই ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কবিতাভবনের সালোঁ-র স্নাতক। বুদ্ধদেব বসু-র ষাট বর্ষ পূর্তি সংখ্যার এঁরা দুজন দুই স্বপ্নের সম্পাদক! এঁরা শুধু লেখা সংগ্রহ, সংস্কার, প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি গতানুগতিক সম্পাদকীয় কর্মই করেননি, তাঁরা ঐ সংখ্যা ঘিরে কয়েক সপ্তাহের জন্য একটা বুদ্ধদেব বসু ক্লাব রচনা করেছিলেন। একটা লাউঞ্জ এবং বার, যার মেম্বারশিপের কষ্ঠি একটাই—সাহিত্যপ্রীতি, রাজনীতি কি মতাদর্শ নয়।

এই বই প্রকাশ ক'রে বীজেশ আমাকে একটা সুযোগ ক'রে দিলেন, যার অপেক্ষায় ছিলাম দীর্ঘদিন। নরেশদা-র এক মধুর কবিতার অনুকরণে বলি : ধন্যবাদ নরেশ গুহ, ধন্যবাদ অরুণকুমার সরকার।

কলকাতা   জ. দ.

ডিসেম্বর ২০০২

* যদি কোনোদিন আত্মজীবনী লেখার ভীমরতি হয়, তবে ঐ প্রথম দুজন—পলিনাথ অ. দে. এবং সু. রা. চৌ.—নিশ্চয় তার একাংশ জুড়ে থাকবেন।

ক ল কা তা

সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন
ডিসেম্বর ১৯৬৮, জানুয়ারি ১৯৬৯

বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা

কলকাতা

দশম ও একাদশ সংকলন
১৯৭৪

বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা

আমাদের প্রকাশিত এই সম্পাদকের অন্যতম বই

গল্প সংগ্রহ (১) / জ্যোতির্ময় দত্ত

কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা

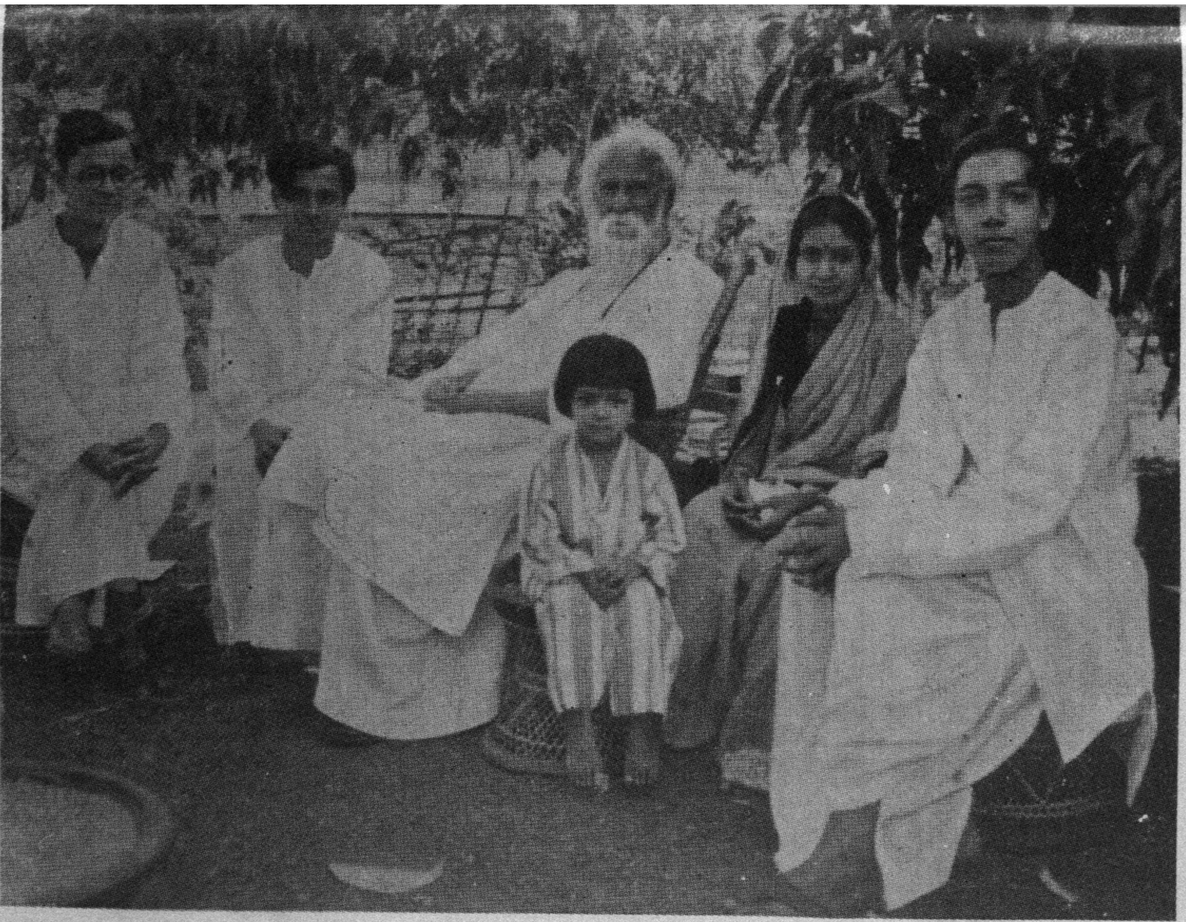
সপ্তম + অষ্টম যুগ্ম সংকলন
ডিসেম্বর ১৯৬৮ জানুয়ারি ১৯৬৯



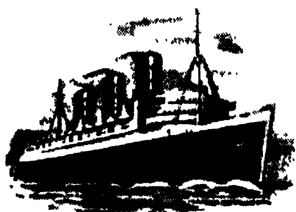
কবিতাভবন • ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ • কলকাতা ১৯৬৬



জগদীশ ঘোষ • বুদ্ধদেব বসু • অমলেন্দু বসু • মন্মথনাথ ঘোষ • পরিমল রায় • অজিত দত্ত (১৯২৭ ?) • অশোক মিত্রের সৌজন্যে



সমর সেন • বুদ্ধদেব বসু • রবীন্দ্রনাথ • বুদ্ধদেব বসুর কন্যা • প্রতিভা বসু • কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতনে শ্যামলীর সম্মুখে • এপ্রিল ১৯৩৮



Cunard Line

R.M.S "Queen Mary"

উদ্ভ্রান্ত

আমিও তোমার মতো নিঃসঙ্গ হয়েছি এখন।
তীর নেই, শস্য নেই, নেই পল্লী, কুটির, কানন।
শুধু ঢেউ, চঞ্চলতা; ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস, আর
সকল দিগন্ত জুড়ে আশাহীন ক্ষুধার বিস্তার।
যেন কোন জন্মান্তরে চিরন্তনী পরম-প্রিয়ারে
পেয়েছিলে ঈশ্বরের হাত থেকে এই অঙ্গীকারে
'যারে ভালোবাসো তারে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে।'
তাই শান্তি নেই। নেই চাপা-কান্নার অন্তরে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আবেগ প্রকাশ।
অন্ধ-কালা ঢেউয়ের খুনির নিশানে, স্রোতে, ~~তরঙ্গের কান্নার~~ অন্তরে
হাঙরের দাঁতে ছেঁড়া মৃতদেহ। তাই সমুদ্রের স্বাদ
আর-কিছু নয়, শুধু তিক্ত তীব্র রক্তের লবণ।

আমিও তোমার মতো সর্বস্বান্ত হয়েছি এখন।

বুদ্ধদেব বসু বাংলাভাষার তরুণতম কবি ছিলেন আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে। এ-মাসে তাঁর বয়স ষাট পূর্ণ হ'লো, এখনো, আমাদের বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সমবয়সী হ'য়েও তিনি আজও আমাদের তরুণতম লেখক। তাঁর সাহিত্যকীর্তি একদিক থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরই একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস। একদা যে-কিশোর কবির রচনা পরীক্ষা ক'রে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় হয়েছিলো 'কেবল কবিত্বশক্তি মাত্র নয়, এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে, একদিন প্রকাশ পাবে', চল্লিশ বছরব্যাপী অবিরল সাহিত্যকর্মের শেষে আজও দেখা যাচ্ছে তিনি এক তমুল বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, যা শুধু একথাই প্রমাণ করে যে প্রতিভার জঙ্গমতা তাঁকে আমাদের আরামপ্রদ অভ্যাসে পরিণত করার বিরোধী। তাঁর গুণগ্রাহীদের তুলনায় বীতরাগীদের সংখ্যা বোধকরি কম নয়। কিন্তু এই নিরলস বিশুদ্ধ শিল্পী যে সম্প্রতিকালের বাংলাদেশের সব চাইতে জীবিত লেখক একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় তাঁর সৃষ্টিশীল উৎসাহ একমাত্র অন্য যাঁকে মনে পড়িয়ে দেয় তিনি রবীন্দ্রনাথ।

শুধুমাত্র রচনার বিপুলতার কথা স্মরণ করলেও তাঁকে আমরা দোষ দিতে পারতুম না যদি তিনি নিছক নিজের লেখাতেই নিবদ্ধ রাখতেন নিজেকে। অথচ এই লেখকশোভন আত্মমগ্নতা তাঁর স্বভাবে নেই। যা-কিছু সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত, মাতৃভাষার নিরাপত্তা কি শিল্পীর স্বাধীনতা, কবিত্বের মর্যাদা অথবা কবিতার গুণগ্রাহিতা, তার জন্য কোনো ত্যাগ, কোনো ক্লেশ স্বীকারই তাঁর কাছে কখনো অতিরিক্ত নয়। তাই রাজনৈতিক বা দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে বনিবনা না-হ'লেও কোনো যথার্থ শিল্পীকে তিনি অস্বীকার করেননি: সাহিত্যের বিচার করেননি গোষ্ঠীর গণ্ডিমানা বিধানে। সব প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য ক'রে, স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে শিল্পের এবং শিল্পীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত দেখিয়েছেন। বাংলাভাষায় তাঁর নিজের বিষয়ে আলোচনার তবু যে স্বল্পতা দেখা যায় তার প্রধান হেতু এই যে শিল্পী আর সমালোচক তাঁর মধ্যে অভিন্ন হ'লেও নিজের লেখার আলোচনা রুচিবহির্ভূত। এই ত্রুটির কথা মনে রেখে, বুদ্ধদেব বসুর ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর বিচিত্র পথগামী সৃষ্টিশীলতার এবং প্রভাবপ্রসারী ব্যক্তিত্বের মোটামুটি একটা পরিচয় উপস্থিত করার ইচ্ছে থেকেই বর্তমান সংকলনের জন্ম। সময়ের স্বল্পতাবশত, এবং স্থানাভাবেও বটে, পরিকল্পনা মতো অনেক কিছুই করা গেলো না। বুদ্ধদেবের ছোটোগল্প, তাঁর কৃত বিদেশী এবং প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ, বাংলাভাষার ব্যবহারে

তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা, সম্পাদক এবং শিক্ষক হিশেবে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় প্রায় অনুল্লেখিত র'য়ে গেলো ব'লে আমরা লজ্জিত। বিবেচক পাঠক এ-সব অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি এই ভেবে হয়তো ক্ষমা করবেন যে বুদ্ধদেবের সৃজনীশক্তি আর উদ্ভাবনী প্রতিভায় এখনো এতটুকু ভাঁটা পড়েনি, ভবিষ্যতে তাঁর বিষয়ে আরো বিস্তারিত গ্রন্থ প্রকাশের তাই অবকাশ রয়েছে। আমরা শুধু একটি উপলক্ষ রচনা ক'রে তাঁর প্রতি আমাদের নমস্কার জানালুম।

অরুণকুমার সরকার • নরেশ গুহ

চিঠি

(কুড়ি বছরের পত্রধারা থেকে সংকলিত)

বুদ্ধদেব বসু

১ শান্তিনিকেতন

২১ জানুয়ারি ১৯৪৫

কল্যাণীয়েষু,

তুমি যে নিঃসঙ্গতার কথা লিখেছো সেটা যৌবনের নিঃসঙ্গতা। সেটা দুঃখ দেয়, আবার সেই সঙ্গে বেঁচে থাকার মাধুর্যও বাড়ায়। আর-এক রকম নিঃসঙ্গতা আছে — সেটা কবির নিঃসঙ্গতা। যদি মনে-প্রাণে সাহিত্য-রচনাতেই লিপ্ত থাকো তাহ'লে পরিণত বয়সে তার স্বাদ পাবে। সেটাও দুঃখের, সে-দুঃখ বেঁচে থাকার গভীরতা বাড়ায়। কবিত্বের জন্য এ-মূল্য দিতেই হয়, সকলকেই দিতে হয়েছে। ...এবার আর রতনকুঠি নয়, আলাদা একটা বাড়ি নিয়ে আছি। ... তবে এরোপ্লেনের গর্জন আর কামান মহড়ার তর্জন আজকাল শান্তিনিকেতনেরও শান্তিভঙ্গ করছে। ...

†

২. ১৬ চৈত্র ১৩৫২

(কলকাতা)

অল্ডস হক্সলির বইখানা আমারও খুব ভালো লেগেছে।[১] তাঁর লেখার বরাবরই আমি অনুরক্ত : অসাধারণ তাঁর বুদ্ধির প্রখরতা, অসামান্য তাঁর নৈপুণ্য। শুধু একটি অভাব তাঁর মারাত্মক : তাঁর মনের পথিকবৃত্তি অনেক সময় যাযাবর বৃত্তিরই ছদ্মবেশ। শেষ পর্যন্ত মিস্টিসিজম-এর তাঁবুতে তিনি আশ্রয় পাবেন, এ-আশা তাঁর সাম্প্রতিক বই থেকে মনে জাগে, কিন্তু সত্যিই যে তিনি কখনো মনে-প্রাণে অতীন্দ্রিয়ের উপাসক হ'তে পারবেন হয়তো এ সম্ভাবনা মরীচিকা-মাত্র। বুদ্ধিকে অবদমিত করতে হক্সলি কখনোই হয়তো পারবেন না, আর তা না-পারলে বোধি জাগ্রত হয় না।

বইখানার শেষ এপিলোগটি কিন্তু আমার খুব খারাপ লেগেছে। সেবাস্টিআনের অঙ্গহানিটা একেবারেই নিরর্থক, সমস্ত পরিচ্ছেদটাই তা-ই। বক্তৃতা, তর্ক, আলোচনা — এই হ'লো ইংরেজি উপন্যাসের কাল। ফর্ম-এর চেতনা ইংরেজি উপন্যাসিকদের বরাবরই অত্যন্ত ক্ষীণ, সমসাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভার্জিনিয়া উলফ ছাড়া আর একজনের মধ্যে দেখলাম না সুন্দর রূপকরণের

দিকে উন্মুখতা। ... ইউসটাস-এর 'আত্মা'কে যেমন ইউসটাস ব'লে চেনা যায় না, লড়াই-ফেরতা দার্শনিক সেবাস্টিআনকেও সেই কিশোর-কবি ব'লে আর চেনা যায় না — তুমি অবশ্য বলবে, তাতো যাবেই না, কিন্তু কথাটা এই যে ইন্দ্রিয়বিলাসী ইউসটাস আর ঐ কিশোর কবিকেই আমার ভালো লাগে — ভালো লাগে এই জন্যে যে বইয়ে তারা জীবন্ত, তারাই সত্য, শিল্পলোকের সত্য, যেমন যুধিষ্ঠিরের চাইতে হনুমান সত্য। যে-মানুষ ভালো, তাকে আঁকবার চেষ্টা হক্সলি অনেকবার করেছেন, একবারও পারেননি, এ-বইয়ের ব্রুনোও রক্তমাংসে জীবন্ত নয়। মন্দ আঁকাতেই তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা — জীবন ভ'রে তা-ই করেছেন — মন্দ স্বভাবত 'চরিত্রবান' বলে সাহিত্যে তার স্থান অনেকটা বিস্তৃত — অতবড়ো শেক্সপিয়রেও প্রধান চরিত্রের মধ্যে ক'টা ভালো লোক তুমি পাবে? কর্ডেলিয়াকে আঁকতে — মানে, বিশ্বাসযোগ্য ক'রে আঁকতে যে-কবিচৈতন্যের প্রয়োজন বলা বাহুল্য হক্সলির তা নেই। ...

†

৩.

১ জুন ১৯৪৭

(কলকাতা)

...এর আগে একবার 'কালো চুল' নামে একটা কবিতা লিখেছিলাম। তাতে মাত্রাবৃত্ত আর মাত্রিক পয়ার মেশানো ছিল।[১] আমি যতদূর জানি, এ-ধরণের মিশ্রণ বাংলায় একেবারেই নতুন। ইতিমধ্যেই দু-একজন 'নেপথ্যনাটকে'র ছন্দ সম্বন্ধে সংশয় জানিয়েছে।[২] কেউ কেউ ভেবেছে গদ্যকবিতা! তোমার চিঠি প'ড়ে বুঝলাম তুমি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছো। মনে হচ্ছে বাংলায় ফ্রী ভার্সের রাস্তাটা আমি এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি — কিছুদিন আগেও এটাকে অসম্ভব জ্ঞান করেছি। তবে এখনও আমার বিশ্বাস নয় যে ইংরেজির মতো দুতিন রকম ছন্দ এবং সেই সঙ্গে গদ্য, কবিতার গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে, বাংলায় মেশানো যেতে পারে। তার কারণ ইংরেজি গদ্য আর পদ্য স্বভাবতই কাছাকাছি, বাংলায় স্বভাবতই দূরবর্তী। বাংলা ছন্দের তাল অত্যন্ত স্পষ্ট : ইংরেজিতে সুইনবর্ণ বিস্ময়কর, বাংলায় ওটাই সাধারণ নিয়ম। বাংলা গদ্য আর পদ্যকে আরো অনেকটা কাছাকাছি আনা এ-যুগে, রবীন্দ্রনাথের পরে, আমাদের করবার আছে। আমার চেষ্টা সেদিকেই। ...

†

৪.

২২.১২.৪৮

(কলকাতা)

এলিয়টের ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ প'ড়ে আমার মন তর্কে ছটফট করছে : কাল তোমাকে বলছিলাম।[৩] তাঁর মূল কথা না-মেনে পারি না, কিন্তু সব কথা মানতে চাই না — এই রকম অবস্থার মধ্যে আছি। রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'-এর কথা বার-বার মনে পড়ছিলো। সেটাও আবার পড়া উচিত, কিন্তু আমার পড়বার সময় এত কম, আর এ-সব পড়াতে মনের উপর এমন চাপ পড়ে যে তখনকার মতো নিজের কাজে গোলমাল হ'য়ে যায়। তবে এইটে ভেবে দেখছিলাম যে আমাদের 'liberal humanist' মনে সে-যুগের রবীন্দ্রনাথের বা এ-যুগের এলিয়টের সমাজকল্পনা প্রথমে একটা উল্টো ধাক্কা দেয়, বলতে ইচ্ছে করে 'reactionary'

— কিন্তু তার কোনো মানে হয় না। আমি স্থিতি চাই, শৃঙ্খলা চাই, জীবনের ধ্রুব আদর্শ চাই — আর এই চাওয়াটাই মার্ক্সীয় মতে 'reactionary' — এবং এই ধ্রুব আদর্শকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োগ করতে গেলে যে-ছবি ফোটে, তার মধ্যে আমাদের অনেক প্রিয় জিনিসের স্থান হয়তো হয় না। যদি জীবনে সময় থাকতো তা হ'লে এই জীবনতত্ত্বের অগাধ সলিলে ডুব দিয়ে দু'টো-একটা রত্ন হয়তো নিজের হাতে তুলতে পারতাম। কিন্তু তা আর হ'লো কোথায়, বেলা প'ড়ে এলো, আর আমার মন ঠিক তত্ত্বদর্শীর নয়, আর আমাদের দেশ এমন নয় যেখানে যোগ্য ব্যক্তির কাছে জ্ঞান আহরণ করতে পারি।[৫] প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক মানুষকে অ-আ-ক-খ থেকে আরম্ভ ক'রে নিজেকেই সমস্তটা ক'রে নিতে হবে — নয়তো কিছুই হ'লো না। এলিয়ট কথিত tradition-এর মূল্য এখানেই, আর এজন্যই আমাদের দেশে সংস্কৃতির এই দুর্গতি। আর অতএব আমার জীবন বিপ্রলাপের মধ্যেই কাটলো। ...

নিম্নলিখিত ঠিকানায় একবার বিজ্ঞাপনের চেষ্টা করলে পারো :[৬]...

†

৫. ২ জানুয়ারি ১৯৪৯

(কলকাতা)

... গান্ধীর জীবনদর্শন আমি এখনো তেমন নিবিড়ভাবে অনুধাবন করতে পারিনি; শহর, কলকারখানা ভেঙে না-ফেলে তার প্রয়োগ সম্ভব কিনা তাও ঠিক জানি না। (হয়তো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগের প্রবন্ধাবলীতে গান্ধীবাদেরই পূর্বাভাস আছে।) গান্ধীর চিন্তার সঙ্গে আরো ভালো ক'রে পরিচিত আমাকে হ'তে হবে; — কিন্তু ঐ 'হতে হবে', 'করতে হবে'-র মধ্যে এত কিছু আছে এবং দিন দিন এত নতুন জিনিসের যোগ হচ্ছে যে এক-এক সময় মনে হয় যে কিছুই হবে না।[৭] তোমাকে একটা কথা বলি : চট পট মনস্থির কোরো না, সব সময় মনের মধ্যে সংশয়ের অবকাশ রেখো — হয়তো ঐ সংশয়ের জানলাতেই মাঝে মাঝে সত্যের আভাস ঝিলিক দিয়ে যায়।

এখন Sartre পড়ছি। অসুখী, অস্থির, উন্মাদ ইওরোপ! আর সে-তুলনায় আমরা আছি স্বর্গ-নরকের মাঝামাঝি purgatory-তে; না ভালো, না মন্দ, না জীবিত না মৃত। ঐ নরকে কি আমাদেরও নামতে হবে? আর তার পরেই কি স্বর্গ?...

তোমার সর্দি কি এখন প্রশমিত : শীতের সূচনা থেকে Angiers Emulsion খেতে থাকলে সর্দির হাত থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি মেলে। কিন্তু তুমি তো আবার ওষুধবিরোধ! ...

†

৬. ১৫.৯.৫০

(কলকাতা)

তোমার কথা রাখলাম, ম্যাকবেথ দেখলাম।[৮] তেমন ভালো লাগলো না, কিন্তু ভালো লাগলেও তোমার উপর রেগেই থাকতাম। তুমি কি ভাবছো আমি তোমাদের মতো যুবক

আছি? বলামাত্র সিনেমায় — বা যে-কোনো জায়গায় — যেতে পারি? কত কথা ভাবতে হয়! কাজের অবস্থা, শরীরের অবস্থা, মেজাজ, মন, ওয়েদার, ভিজে জুতো, ধোবাবাড়ির দূরত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি পঞ্চাশ গ্রহনক্ষত্রের যোগবিয়োগের ফল মিলে গেলে তবে তো আমার বেরোনো! তার উপর লাইটহাউস ইত্যাদিতে যা শীত! একটিমাত্র আলোয়ান এক বছর ধ'রে ধোবার কাছে প'ড়ে আছে — ভয় হচ্ছিলো এ-যাত্রা নিউমোনিয়ার খপ্পরে পড়বোই — কিন্তু এখন পর্যন্ত বহাল তবিয়তে আছি। তাতে আশা হচ্ছে ফাঁড়া কাটলো।

কথা হচ্ছে এ-রকম আচমকা টিকিট কেটে আমাকে তুমি আর কক্‌খনো পাঠাবে না! ... অরুণ সেদিন যে পালালো তারপর সে কি আর তোমাদের দিগন্তে উদিত হয়েছে?[১]

†

৭. চাঁইবাসা

১১ অক্টোবর ১৯৫১

কাল থেকে বাদলার পালা চলছে। প্রকৃতি জড় পদার্থ, কোনোরকম কাণ্ডজ্ঞান মেনে চলে না, ঠিক বিজয়া দশমীর তিথিতে ভিজে মেঘের রেজিমেন্ট নামিয়ে বিখ্যাত শুক্লপক্ষটাকে একেবারে সাবোটাজ ক'রে দেয়। সম্ভবত এই বৃষ্টিতে কলকাতার ভাসানের আমোদ পণ্ড হ'লো (না কি আরো বাড়লো কে জানে?) — এদিকে আমরা যারা বঙ্গীয় বর্ষায় ক্লান্ত এবং পীড়িত হ'য়ে ভিন্ন রকমের স্বাস্থ্য সঞ্চারী আবহাওয়ার আশায় ট্যাঁকের কড়ি খসিয়ে গৃহকোণ থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলুম, আমাদের কথাও একবার চিন্তা করলেন না প্রকৃতি দেবী — এমন কি এ-কথাও ভাবলেন না যে আমাদের বেশ নতুনতর দৃশ্য-টৃশ্য দেখিয়ে খুশি করলে আমরা তাঁর বিষয়ে গ্রন্থরচনা ক'রে তাঁর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের মাহাত্ম্য আরো রটনা করতে পারতুম। হাবে ভাবে মনে হচ্ছে এই মেঘাচ্ছন্নতা আজও কাটবে না — নাকি পূর্ণিমা পর্যন্তই চলবে? — তা যাই হোক আপাতত এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছি যে যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে নিশ্চয়ই — এবং এর পর যখন মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে শুকনো শীতের আমেজ দেবে, তখন অন্তত কয়েকটি সুন্দর সোনালি দিন এই পাহাড়ে ঘেরা উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে আমরা ভোগ করতে পারবো।

... মনে-মনে আপাতত আমি এই সংকল্প করেছি যে যদি আমি পুনরায় সুস্থ সক্ষম এবং ইচ্ছুক হ'য়ে পূর্বের মতো পত্রিকার ভার নিতে পারি তাহলেই 'কবিতা' চালাবো, আর তা যদি না-পারি তাহলে বুঝতে হবে যে এবার বিদায় নেবার সত্যিই সময় এসেছে, অভ্যর্থনা অতিক্রম ক'রে আর অবাঞ্ছিত অতিথির মতো বসে থাকা চলবে না।[১০] তোমাদের আপত্তি আমি খুবই বুঝি, তোমাদের বেদনাবোধ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি — কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও অস্বীকার করতে পারি না যে সম্পাদকরূপে আমার নাম মুদ্রিত করার অর্থ ক্রমশই ফিকে হ'য়ে আসছে। 'কবিতা' পত্রিকা আমিই একদিন এ-সংসারে এনেছিলাম, আমি যদি তাকে যথেষ্ট স্নেহে-যত্নে লালন করতে আর না পারি তাহ'লে তার অস্তিত্বের কোনো অর্থই হয় না — এই যুক্তি আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো।...

৮. চাইবাসা

১৯ অক্টোবর ১৯৫১

... সম্প্রতি আমি স্থির করেছি যে স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় লেখার কাজ ছেড়ে দেবো।[১১] ওতে এই দুই বছরে আমার ভিতরের দিকের প্রভূত লোকশান হয়েছে — তার মেরামতেও কম দিন লাগবে না। অথচ ছেড়ে দিলে সাংসারিক দিকে আপাতত ক্ষতির আশঙ্কা খুব। ... আমার ইচ্ছা কলকাতায় ফিরেই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বইটি হাতে নেবো। ... মনে হচ্ছে সে-বই লেখার জন্য এখন আমি তৈরি হয়েছি, কেননা এখানে এসে দেখছি আমাকে দারুণ রবিতৃষ্ণায় পেয়েছে — রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কিছুই পড়তে ইচ্ছা করে না, শেক্সপিয়র প্লেটো হোমর প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত যে-সব লেখকদের সঙ্গে এনেছি তাঁদের সকলকেই সম্প্রতি মনে হচ্ছে অর্থহীন।[১২] তাছাড়া ইংরেজি ভাষাটার উপরেও আমার একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা হয়েছে — আমি নিশ্চয় জানি স্টেটসম্যানের কর্মই তার কারণ, এবং এও জানি যে ইংরেজি ভাষাকে ভালোবাসার জন্যই ও-সব ছাড়তে হবে। সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু। সাবধান!

আরো একটি কথা আমি ভেবেছি। আমি বাড়িতে বসে বি.এ. পরীক্ষার্থী দুটি তিনটি ছাত্রছাত্রী পড়াতে পারি। তুমি তোমার কলেজে এবং বন্ধুদের সাহায্যে অন্যত্র এ-বিষয়ে খোঁজ করিয়ো।[১৩] ... যদি আমি সাহিত্যে না ফিরতে পারি তাহ'লে আমার সুখ শান্তি স্বাস্থ্য কিছুই হবে না — তার জন্য যে-কোনো উপায় বরেণ্য!...

†

৯. মেটকাফ্ হাউস, দিল্লী

৩.১২.৫২

...আমারও খুব ইচ্ছে করে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যেতে, কিন্তু আমার ভাগ্যরেখায় ভ্রমণের পথ প্রশস্ত নয় — আর এবারের মতো 'আপিশ' ভাবে এলে বেড়ানো হয় না — বেড়াতে হ'লে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, আর তার মানেই আর্থিক স্বাধীনতা। সে-স্বাধীনতা আমার জীবনে কখনো আসবে না, তার জন্য আক্ষেপও করি না, এখন সমস্ত দুরাশাকে গুটিয়ে এনে বাংলাদেশের একটি গৃহকোণে বাংলারচনায় মন দিতে পারলেই ধন্য মানি জীবন। — অরুণের আর বিশ্বর বইয়ের রিভিয়ু আমি লিখে পাঠাবো।[১৪] ...

†

১০. বঙ্গভবন, নিউ দিল্লী

৭.১.৫৩

... গান্ধীবাদ বিষয়ে য়ুনেস্কোর আন্তর্জাতিক বৈঠকের কাল উদ্বোধন হ'লো — শ্রোতাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আমরাও ছিলুম। শ্রোতব্যের চাইতে দ্রষ্টব্যও কিছু কম ছিলো না — পুরুকার্পেট পাতা পার্লামেন্টের গোলাকৃতি হল, মিনিটে-মিনিটে ক্যামেরার ঝলসানি — চারদিকে নাম-না-জানা কে জানে কত নামজাদারা — বেশ জমকালো ব্যাপারটি মোটের উপর। আজ

শুনলুম বক্তাদের মধ্যে অ্যাটলি সাহেবও ছিলেন — স্টেটসম্যান দুটো শূন্য চেয়ারের ছবি দিয়েছে (রুশ আর চীন) — এদিকে এক ভারতীয় ভদ্রলোক স্টালিন Peace Prize পেলেন। বেশ মজার ব্যাপার — কী বলো? ভারতবর্ষকে হাত করা, হাতে রাখার জন্য সবাই দেখছি উঠে-প'ড়ে লেগেছে — এর মধ্যে নেহরু যদি রাণী এলিজাবেথের মতো সকলকেই খুশি রেখে অথচ কারো হাতেই ধরা না-দিয়ে চলতে পারেন তাহলেই ভারত-ভাগ্যবিধাতার তৃপ্তিসাধন হবে তাতে সন্দেহ নেই। ...

†

১১.

বঙ্গভবন, নিউ দিল্লী
২৫.১.৫৩

... দিল্লীতে এসে অবধি সম্পূর্ণ অলস জীবন যাপন করছি। বদলেয়ারের আলস্য এ নয়, 'সোনার তরী', 'চিত্রা'র রবীন্দ্রনাথেরও না, যখন মানুষ কোনোরকম 'কাজ' না-ক'রে ভিতরে-ভিতরে প্রাণের আবেগে স্পন্দিত হ'তে থাকে — এ-যদি সেই আলস্য হ'তো তাহ'লে তোমরাও ঝুড়ি-ঝুড়ি চিঠি পেতে, আমার খাতাও ভ'রে উঠতো, এবং আমার জীবনে আনন্দের অন্ত থাকতো না।'' কিন্তু সেই আনন্দের যখন অবসান হয়, তখনই মানুষ 'সুখে থাকা'র চেষ্টা করে। নিজের সম্বন্ধে বরাবর আমার এই ধারণা যে আমি মজুর প্রকৃতির মানুষ — কোনো কিছু না-ক'রে থাকতে পারি না, কুড়েমি করার প্রতিভা আমার নেই। কিন্তু দিল্লীতে দেখছি বিনা কাজে, অথচ বাঁশি না-বাজিয়ে, দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছে : সকালে চা রুটি ডিম খেয়ে তথাকথিত কর্মস্থলে যাই, তথাকথিত কাজ সেরে দুপুরবেলা ফিরে আসি, খেয়েদেয়ে হয় পুরানা কিল্লা লাল কিল্লা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো, নয়তো বাইরে রোদ্দুর অথবা ঘরের মধ্যে তাপযন্ত্রের ধারে ব'সে-ব'সে আনমনাভাবে বইয়ের পাতা ওল্টানো — এছাড়া নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কেনাকাটা ইত্যাদিতে দিনের পর দিন মসৃণভাবে গড়িয়ে চলেছে — দেখতে-দেখতে জানুয়ারি মাস প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। অথচ কুড়েমি করার প্রতিভা যে আমার নেই, এ-কথাটা এখনো সত্য থেকে যাচ্ছে, এই অবস্থার মধ্যে ভিতরে-ভিতরে একটা সূক্ষ্ম কিন্তু ভুলতে-না-পারা অতৃপ্তি খোঁচা দিচ্ছে মাঝে-মাঝে — সেটা যখন থেমে যাবে তখনই একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো।

এ পর্যন্ত লিখে মনে হচ্ছে যে এ-রকম মন খুলে তোমাদের সঙ্গে কথা বলা আমার উচিত নয়, আমার এই উত্তরচল্লিশের পোড়োজমির সঙ্গে তোমাদের শ্যামল তারুণ্যের কিছুই তো মিল নেই। আমার এই নৈরাশ্যের ভাবটা তোমাদের মনেও যদি সংক্রমিত হয় সে অত্যন্ত দুঃখের কথা হবে। আমার অতীত জীবনের সমস্ত ফেলাছড়া অপব্যয় বাদ দিয়েও এখানে-ওখানে দুটি একটি আলোর কণা জ্বলছে হয়তো — অন্ততপক্ষে যতদিন দম ছিলো অবিরাম চেষ্টা ক'রে গিয়েছি, আজ যদি ক্লান্ত হ'য়ে থেমে যাই তোমরা ক্ষমা না-করলেও ভাগ্যবিধাতার দপ্তরে হয়তো ছুটি মঞ্জুর হবে। কিন্তু তোমরা, যারা সবেমাত্র শুরু করলে, তোমাদের কথায় এখনই কেন ক্লান্তির সুর? ...

১২.

মহীশূর
২৮ এপ্রিল ১৯৫৩

তুমি জিগেস করেছো গদ্য কবিতা কেন? এর উত্তর হচ্ছে, আমার খুশি। উত্তরটা রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু তাই ব'লে অন্য কারো ওতে অধিকার নেই তা নয়, এই 'কেন'-র ও ছাড়া কোনো জবাবই হ'তে পারে না। 'আমার খুশি' — কথাটা শুনতে একটা বেয়াড়াগোছের মনে হ'তে পারে, কিন্তু এর আসল মানে হচ্ছে ও-রকম না-হ'য়ে উপায় ছিলো না। রচনা-কর্মের মধ্যে একটি অনিবার্যতা আছে। সত্যি বলতে, কবি তা আমরা লিখি না, কোনো-কোনো কবিতা আমাদের দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়। তার রূপ, ছন্দ, গড়ন সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট করে, আমরা সেই হুকুম তামিল করি মাত্র। কবিতার এই ডিক্টেটরি মেজাজের একটা প্রমাণ হচ্ছে এই যে আমরা কত মুহূর্তে কত অসংখ্য কবিতাই তো ভাবি, কিন্তু লিখে ওঠা হয় তার কতটুকু অংশ? আর তারই বা কতটুকু অংশ বেঁচে থাকে? যার আদেশের জোর সবচেয়ে বড়ো সেইটেই প্রেতলোক থেকে প্রাণলোকে উত্তীর্ণ হয়, যার দাপট কম, যে দুর্বল, সেই বেচারারা দরজার ধারেই পৌঁছতে পারে না, কিংবা বেরিয়ে এসেও অকালে মারা পড়ে। এই ব্যাপারটাকে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দেখতে পারো। নারীর গর্ভের পুরুষের প্রাণবীজ একসঙ্গে লক্ষ-লক্ষ যাত্রা করে, কিন্তু সেটা যাত্রা নয়, পাল্লা-দৌড়, তাতে প্রবলতম একটিমাত্রই শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ করতে পারে, অন্যগুলোর ক্ষীণ প্রাণ পথে-পথেই অবসিত হয়। এই কথাটা প্রথম যেদিন জেনেছিলাম ভারি বিস্মিত হয়েছিলাম, আজও ভাবতে বড়ো আশ্চর্য বোধ হয়। এবং সন্তানের গায়ের রং, চুলের রং, স্বভাব-চরিত্র, সবই যেমন গর্ভবাসকালেই ক্রোমোজোমদের বিকাশ-পরম্পরায় নির্ধারিত হ'য়ে যায়, তেমনি কবিতার আকৃতি-প্রকৃতিও লিখিত হবার বহু পূর্বেই স্থির হ'য়ে গেছে—কোন রহস্যলোকে জানি না।[১২]

...কিছুদিন আগে বদলেয়ারের গদ্যকবিতা একখণ্ড আমার হাতে এলো।[১৩] বইটি দিল্লীতে আমার সঙ্গে ছিলো, এখানেও আছে। ছোটো বই, প'ড়ে উঠতে একঘন্টার বেশি লাগে না, কিন্তু প'ড়ে ফেলতে সারা জীবন কেটে যায়। তোমাকে বলবো কী — ঘুমের আগে বইখানা খুলে যে-কোনো পাতায় দুটি-চারটি লাইন যদি পড়ি, তাহলেই সমস্ত মন এক বেদনা-মধুর শান্তিতে ভ'রে যায়। ঐ একটুকুর বেশি দরকারই হয় না, ঐ একটুকু নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই মন যেন অসীমে গিয়ে পৌঁছয়। তাও তো অনুবাদে পড়ছি; মূলে না জানি ভাষাশিল্পের দিক থেকে কত আশ্চর্য! অথচ বদলেয়ারের অন্যান্য রচনা ছন্দ-মিলের ধ্রুপদী আদর্শে বাঁধা, সে-বিষয়ে তাঁর প্রকর্ষের কথা বলতে তাঁর দেশের বিশেষজ্ঞরা উচ্ছ্বসিত। সেই বদলেয়ার কেন গদ্যকবিতা লিখেছিলেন? কেন, রবীন্দ্রনাথ, 'লিপিকা', 'পুনশ্চ'? নিশ্চয়ই কোনো বাধ্যতা ছিলো তাই, নিশ্চয়ই ও-সব কবিতা ও-ভাবে ছাড়া হ'তেই পারতো না — তাই। অতএব এ-প্রশ্ন কোরো না 'কেন' — যদিও কোনো বিশেষ রচনা ভালো না-লাগলে সে-কথা নিশ্চয়ই বলতে পারো। ...

আজ সকাল থেকে শরীরটা তেমন সুবিধের ছিলো না, অ্যাস্পিরিন খেয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলাম। খেয়ে উঠে একটু ভালো বোধ করলাম, এখন তোমাকে এই চিঠি লিখতে-লিখতে বিকেল হ'লো। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, সামনে মাঠের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীগুলো তরুণী মেয়ের

কানের গয়নার মতো চটুলভাবে দুলছে — কিন্তু আমাকে সেটা দেখতে হ'লে লেখা থামিয়ে চোখ থেকে চশমা খুলতে হয়। বড়ো ভালো লাগছে জায়গাটা।[১৮]

†

১৩.

মহীশূর

১৮.৪.৫৩

... গত কয়েকদিন ধ'রে আমার মনে হচ্ছিলো আমার পক্ষে আবার কবিতা লেখা সম্ভব হ'তে পারে।[১৯] বড়ো আনন্দে ছিলাম। অকস্মাৎ স্কন্ধে অপদেবতা চাপলো, সপ্তাহান্তে বাঙ্গালোর চ'লে এলাম। এসে অসহ্য বোধ হচ্ছে। কাল আমার নির্জন বাংলোয় ফিরতে পারলে বাঁচি। স্টেটসম্যানে যামিনী রায়ের জন্মদিনের ছবি দেখে বড়ো ভালো লাগলো।

†

১৪.

পেনসিলভানিয়া কলেজ ফর উইমেন

পিটসবার্গ/১৯.৯.৫৩

...ওয়াশিংটনে পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু খুব বেশী সুখী হ'তে পারিনি।[২০] আমার ধারণা ছিলো, পাউণ্ড রোগা ছিপছিপে মানুষ — তা তো নয়, প্রকাণ্ড জোয়ান, জাহাজের কাপ্তেনের মতো দেখতে। যদিও গরম ছিলো, তিনটে-চারটে উলের জামা প'রে রোদ্দুরে ব'সে ছিলেন, চোখে রোদের চশমা, এবং ঘন-ঘন দ্রুতবেগে চকোলেট ইত্যাদি খাচ্ছিলেন। কথাবার্তায় নতুন কিছু পেলাম না — আর সমসাময়িক যে-কোনো লেখকের উল্লেখেই নিন্দা বা বিদ্রূপ করছিলেন — এটা আমার ভালো লাগলো না। মুখে যে অত্যন্ত চেঁচিয়ে বলে ভিতরে-ভিতরে তাকে দুর্বল ব'লে সন্দেহ হয়। — তবে হয়তো আমারই ভুল হ'তে পারে, প্রথম দেখেই মানুষকে ঠিক বোঝা যায় না, হয়তো ঠিক সুর লাগলো না সেটা আমারই অক্ষমতা।

পিটসবার্গ বড্ড মন-খারাপ করা জায়গা।[২১] শহরের জৌলুষ নেই, গ্রামের রমনীয়তাও নেই। ন্যুইয়র্ক বা ওয়াশিংটন হ'লে আমার প্রবাস আরো সার্থক হ'তো। কলেজের মধ্যে সাহিত্যের হাওয়া তেমনভাবে বয় না। শুধু একজন দক্ষিণ-মার্কিনির দেখা পেয়েছি, তিনি "তাগোর"-কে "অ্যাদোর" করেন, খুব ভালো লাগলো মানুষটিকে। ...

†

১৫.

পিটসবার্গ

২০ নবেম্বর ১৯৫৩

প্রথমে লিখি এলিয়ট অনুবাদের কোনো 'নির্মম' সমালোচনা আমরা 'কবিতায় ছাপাতে পারবো না। কোনো-একটা লেখা ভালো হয়নি, সে-কথা বলা এমন কিছু প্রয়োজনীয় মনে করি না যার জন্যে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটানো যায়। ... অতএব * * কে বোলো কাব্য বিষয়ে সাধারণ ভাবে তাঁর কোনো আলোচনা পেলে খুশি হবো — এলিয়ট-অনুবাদের রিভিয়ু নয়। ...

১৬.

নিউ ইয়র্ক

১ জুলাই ১৯৫৪

...আমেরিকা ছেড়ে যাবার আগে দু-তিন সপ্তাহ বড়ো ব্যস্ততার মধ্যে আছি। ... তোমার চিঠি ভ'রে বিষাদের সুর লক্ষ্য করলাম। ও-বস্তুটি আমার নিত্য সঙ্গী, কাজেই অন্যের মধ্যে সেটা দেখলে আমি উপদেশ দিতে উদ্যত হই না। বিষণ্ণ থাকাই যে মন্দ, আর ফুর্তিতে থাকাই যে ভালো, তাও আমার বিশ্বাস নয়। বড়ো জোর আমরা এই প্রার্থনা করতে পারি — 'আমার বিষাদও সৃষ্টিশীল হোক' — তাকে রূপে-রসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাও করতে পারি। দুঃখকে হার মানাবার সেটা একটা আশ্চর্য উপায় : এই রকমের একটা ঘটনা রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী'তে প'ড়ে অভিভূত হয়েছিলাম — কেমন ক'রে জাহাজে যেতে-যেতে শরীর যখন খুব খারাপ হ'লো, মন অবসাদে আচ্ছন্ন, তখন শুধু কবিতা লিখে লিখে সেই সাময়িক মৃত্যু তিনি জয় করে উঠেছিলেন। এটা কি তিনি রবীন্দ্রনাথ ব'লেই পেরেছিলেন, না কি পেরেছিলেন ব'লেই রবীন্দ্রনাথ, এই কথাটা অনেক দিন চিন্তা করেছি। আমাদের কার মধ্যে কী শক্তি আছে তা কি আমরা জানি ? আমরা কি সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মনের সাধ্য ব্যবহার ক'রে থাকি ? কাকে বলে প্রতিভা ? কাকে বলে প্রতিজ্ঞা ? কাকে বলে পরিশ্রম ? শরীরের সঙ্গে আত্মারই বা সম্বন্ধ কী ? — খুব ভাগ্যে ঠিক এখানেই কাগজ ফুরোলো, এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লেই মরেছিলাম আর কি।

†

১৭.

শিকাগো

২১ মার্চ ১৯৫৪

...'দেশান্তর' লেখাটা বিষয়ে তুমি ঠিকই বলেছ — আমার ভ্রমণকাহিনীতে ভ্রমণের অংশটা অনেক দূরে এগিয়ে গেলো, কাহিনী রইল পিছনে প'ড়ে।[১১] জানি না এ-দুটোকে কবে আবার কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা কখনোই পারবো কিনা। পিট্‌সবার্গ ছেড়েছি আজ ঠিক এক মাস হ'লো, কিন্তু ঐ মহিলা-কলেজের সংকীর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ছ-ছটা মাস যেন অর্থহীন বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে — এদিকে এই এক মাসের ভ্রমণের ফলেই অনেক নতুন দরজা আস্তে-আস্তে খুলে যাচ্ছে। এতদিনে আমেরিকাকে সত্যি-সত্যি দেখতে পাচ্ছি, পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর স্পন্দন বিশাল প্রবল সঙ্গীতের মতো বেজে উঠছে। সমুদ্রে নাইতে নামলে যেমন হয় তেমনি ঢেউয়ের পর ঢেউ অভিজ্ঞতা ব'য়ে যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে — আপাতত শুধু অনুভব করছি, তার বেশি সময় নেই — কিন্তু এগুলো পরিপাক ক'রে সাহিত্যের রক্ত মাংসে পরিণত করা সময় সাপেক্ষ, তার জন্য দীর্ঘ অবসর চাই — দেশে ফিরে গিয়েও সে-অবসর আবার পাবো কিনা কে জানে। ... তার উপর আমার মনটা ক্রমশ যেন সেই দিকে ঝুঁকছে যাকে ওঅর্ডস্বার্থ বলেছিলেন আবেগের শান্তিময় অনুব্যবসা। অনুভব করার সঙ্গে চিন্তা করারও প্রয়োজন অনুভব করি আজকাল। যে-সুরে 'দেশান্তর' লেখাটা আরম্ভ করেছিলাম, তার সঙ্গে আমার এখনকার মনের সুর ঠিক মিলছে না, সে-ও আর-এক সমস্যা। অতএব, নিশ্চিত জেনো, 'দেশান্তর'-এর নতুন কিস্তি বহুকাল আর পাবে না। আমাদের জীবনে অনেক কিছুই নিয়তি-

নির্বন্ধে ঘ'টে থাকে — লেখাটাও তার অন্তর্গত, অতএব, দুঃখ না-ক'রে ধৈর্যভরে অপেক্ষা করাই সমীচীন। অপেক্ষার সঙ্গে প্রার্থনাও আছে, প্রার্থনার সঙ্গে মনের অচেতন উদ্যম। ...

†

১৮.

কলকাতা

১ জানুয়ারি ১৯৫৬

... গুজব নামক রাক্ষসের দ্বারা জীবনে অসংখ্যবার পীড়িত হ'য়েছি আমি: সুখের বিষয় ওগুলো স্বভাবতই অতিশয় মরণশীল; আর — যে-সব লোকের কোনো কাজ করবার নেই — তারা রাস্তার মোড়ে-মোড়ে যে-সব বাজে কথা চিবিয়ে-চিবিয়ে সময় কাটায়, তাদের দিকে কান দিতে গেলে বেঁচে থাকাই শক্ত হ'য়ে ওঠে। কিছু শুনে যেটুকু আমরা বিচলিত হই সেটুকুই আমাদের পরাজয়, তবে কাজের বেলায় শান্ত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করতে হবে বইকি।

†

১৯.

২৪ মে, ১৯৫৭

বিকেল — আমি ক্লান্ত

(কলকাতা)

...আশ্চর্য! তোমার সঙ্গে আমার কি একেবারেই মনের মিল নেই? মেঘদূত অনুবাদে যে-সব অংশ তোমার খারাপ বা অসহ্য লেগেছে, ঠিক সেইগুলোই (অন্তত বেশির ভাগ) বিশেষভাবে খুশি করেছে আমাকে, বইয়ের 'অনুবাদকের বক্তব্য' অংশে কোনো-কোনোটির উল্লেখও করেছি। ... সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে আমরা আমাদের স্বকীয় রচনায় আজকাল যে-রকম মিশোল ক'রে থাকি, এই অনুবাদেও তা-ই আমার চেষ্টা ছিলো। সর্বত্র যে ঠিক আমার মনোমতো হ'য়েছে তা নয় — কিন্তু মূল সুরে ভুল হয়েছে ব'লে মনে হয় না। তুমি বাংলা ব্যবহার করবে ভাবিনি — আমার কাছে ওটাই এই অনুবাদের পাঠযোগ্যতার কারণ — আমি সমালোচক হ'লে যে-যে স্থলে আপত্তি তুলতাম (যেমন মাঝে-মাঝে তিন শব্দের সমাসে) তার একটাও তুমি লক্ষ্য করোনি। হয়তো, বইটা বেরিয়ে গেলে, ভূমিকা টীকা ইত্যাদি সমেত আবার পড়লে, তোমার মতও কিছু বদলাবে। অনুবাদেও খুচরো কিছু বদল করেছি।

— থাক মেঘদূত, বহুদিন যেন এ ছাড়া আর কিছু ভাবছি না, বইয়ের ছাপা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এ নিয়েই প'ড়ে থাকতে হবে। তুমি শীঘ্র ফিরবে ভাবতে খুব ভালো লাগছে — তুমি ফিরলে বাঁচি, যাদবপুরের নানা ঝামেলা আমাকে আর একা টানতে হয় না।[২৫] ...

†

২০.

(ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানা)

১২ সেপ্টেম্বর, (১৯৬৩) রাত্রি

... আমেরিকা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমার মাঝে-মাঝে তর্ক হ'তো, কিন্তু এই দশদিনেই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি যে নিউ ইয়র্কের সঙ্গে মফস্বলের কী রকম আকাশ-পাতাল তফাৎ।[২৬] ...শুনে অবাক হবে যে এবার আমরাও দুপুরে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছি। রানুর খাটুনি বাঁচাবার জন্যই পাস্নার

ও আমার এই মহৎ স্বার্থত্যাগ। রানুর শরীর ঠিক যেন স্বাভাবিক হচ্ছে না এখনো — হয়তো মানসিক অবসাদ ও সঙ্গীহীনতাই এর একটা কারণ।...

মল্লিকমশাই রুমিকে একখানা ভারি সুন্দর চিঠি লিখেছেন, তাঁকে আমি যে-ভাবে জেনেছি — অত্যন্ত নির্মল ও উন্নত চরিত্রের মানুষ — চিঠিখানা যেন তারই দর্পণ।...এই ১৯৬৩ বছরটা আমাদের ভালো যাচ্ছে না. পর-পর এতগুলো দুর্ঘটনা ঘটলো যা সাধারণত দশ বছরের মধ্যেও পাওয়া যায় না। এর পিছনেও কি কোনো অভিপ্রায় আছে? — কী জানি, এ-মুহূর্তে আমার কাছে সবই অস্পষ্ট।...আমাদের তিনজনেরই অর্ধেক অংশ কলকাতায় প'ড়ে আছে জেনো, সেখানকার স্বাদগন্ধস্পর্শের জন্য তৃষিত আছি।...

†

২১.

(ব্লুমিংটন. ইণ্ডিয়ানা)

৩ অক্টোবর. ১৯৬৩

...আর একটা কথা — লাইব্রেরির বাণেশ্বর আমার কাছে বই বাঁধাই বাবদ পাঁচ টাকা পাবে — সেটা আমি দিয়েছিলুম কিনা মনে পড়ছে না. তুমি ওটার ব্যবস্থা করলে সুখী হবো।[২৭]...

†

২২.

ব্রুকলিন. নিউইয়র্ক

৫ এপ্রিল. ১৯৬৪

... আমরা না বহুকষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা হারাই, এই আশঙ্কা মাঝে-মাঝে হানা দেয়। নিউইয়র্ক টাইমস-এ বেরিয়েছে, নেহরু নাকি কাশ্মীরে গণ-ভোটে রাজী হয়েছেন — কথাটা কি সত্য? পাকিস্তানের এই জুলুম মেনে নিলে ভারতের আর মর্যাদা রইলো কী? তাহ'লে প্রমাণ হবে যে ভারত একেবারে বলহীন (চীনের ব্যাপারেও তা বোঝা গিয়েছিল), এবং সংসারে বলহীনের স্থান নেই, এই কথাটা নিষ্ঠুর হ'লেও নিতান্ত সত্য। এখনই এ-সব দেখে অনেকেই পাকিস্তানের দিক টেনে কথা বলছে — সত্যঘটনা জানা সত্ত্বেও। চীন-পাক মিতালিও স্বচ্ছন্দে মেনে নিচ্ছে এরা। তোমার কি মনে হয় যে গুণ্ডামিরই জয় হবে চিরকাল? এই দুই-যুদ্ধ-পেরোনো বিশ শতকেও? যে ঈস্ট নদীর তীরবর্তী প্রকাণ্ড দপ্তরটা কিছুদিন পরে এক বিশাল-হোটেলে পরিণত হবে? আমার যেন সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে।

নেহরুর জন্য দুঃখ হয় আমার। তিনি আদর্শবাদী ভদ্রলোক, অনেক কূটনৈতিক চাল ধরতে পারেননি, হয়তো কিছুটা সরলভাবে অনেককেই বিশ্বাস করেছিলেন। আন্তর্জাতিক দাবাখেলায় শেষ পর্যন্ত তাঁর হার হ'লো।

কিন্তু রাজনীতি থাক — ওটা আমার বিষয় নয় — কোনো দুর্যোগ ঘটলে ঝরা পাতার মতো যারা মিলিয়ে যায়, আমি তাদেরই একজন মাত্র।...

আপাতত মল্লিকমশাইয়ের দেখা পাবার আশায় এই উপসাগরের তীরে বসে আছি।...

২৩.

বোলডার, কলোরাডো

২২ জুলাই, ১৯৬৪

... জীবনে কিছু-কিছু ব্যাপার আশাতীত ঘটে যায়, আমার পক্ষে দেশভ্রমণ তেমনি। ১৯৫৩-র আগে বিদেশে আসার কল্পনাও করিনি, এখন এই তৃতীয়বারে মনে হচ্ছে মাত্রা কিছুটা বেশি হ'য়ে গেল। এক-এক সময় ভাবি, য়োরোপে হ'লে বেশি সার্থক হ'তো এই প্রবাস — কিন্তু ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্সের কোনো গ্রামে বন্দী হ'লে ভালো লাগতো কী? এবং তুমি জানো, মার্কিনী গ্রাম ভারতীয় গ্রামের চেয়ে বেশি গ্রাম্য — টেলিভিশনের প্রাচুর্য সত্ত্বেও জগতের ঢেউ এখানে খুব ক্ষীণ হ'য়ে পৌঁছয়। ব্লুমিংটন আমরা নিজেরাই মস্ত দল ছিলাম, তিনবেলা অনেকগুলো ক'রে বাসন ধোয়া যেতো অন্তত, ... কিন্তু এখানে নিজের মধ্যে তাকানোটাই আমার পেশা হয়ে উঠেছে, এবং তার ফলাফল আরো বেশি অপ্রীতিকর। ...

†

২৪.

ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানা

২৮.১১.৬৪

... আর দুদিন পরে আমার ছাপ্পান্ন বছর পূর্ণ হবে। এক কালে লোকেরা এ-বয়সে নিজেদের বৃদ্ধ ভাবতো, এখন আমাদের মনের ভাব বদলে গেছে। তবু এ-কথা সত্য যে আয়ুর সীমা আছে, আর এক বছর কাটলে একটা বছরই কেটে গেল। এবারে কৃতকর্মের ব্যবস্থাপনা করলে ভালো হয়, অকৃতকর্ম ফেলে রাখারও আর সময় নেই। বাংলাদেশে আমার বইয়ের কাটতি নেই জেনেও আমার মন সেখানেই প'ড়ে আছে। ...

†

২৫.

ব্লুমিংটন, ইলিনয়

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৪

.... পাছে বই খোয়া যায়, সেই ভয়ে অনবরত কম্পিত ছিলাম; ঠিক তাই হ'লো। [২৬] ... এখন তোমার কাছে কয়েকটা খবর জানতে চাই, ** চিঠিটা এত সংক্ষেপে লিখেছে তার নানা রন্ধ্র দিয়ে আমার দুশ্চিন্তা মিনিটে-মিনিটে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো এই —

(১) 'কবিতা'র বাঁধানো সেট (দুটো পুরো সেট ছিল), রবীন্দ্ররচনাবলী (২৯ খণ্ড বিশ্বভারতী, প. বঙ্গ সরকারের কয়েকটা), Heinrich Zimmer-এর বইগুলো ও অন্যান্য আর্ট-পুস্তক, Monier-Williams-এর সংস্কৃত অভিধান, হরিচরণের বাংলা অভিধান, Shorter Oxford Dictionary (দুই খণ্ড) — এগুলো আছে কি নেই?

(২) ডস্টয়েভস্কি ও মান্-এর সেট, বোদলেয়ার ও তৎসংক্রান্ত বইগুলো, হ্যেল্ডার্লিন, র‍্যাঁবো, মালার্মে, ভালেরি — এ-সব থেকে চুরির পরিমাণ কতদূর?

(৩) স্টীলের আলমারি কি ভেঙেছিল? আমাদের দু-জনের স্বরচিত বই, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, এবং আরো কিছু রক্ষণযোগ্য জিনিশ ছিলো তাতে। (আমার পুরোনো কবিতার খাতা, প্রভৃতি)।

(৪) আর কী চুরি হয়েছে? বাসন, বস্ত্র, অলঙ্কার?

বুঝতে পারছ, আমি ক্ষতির সঠিক পরিমাণটা জানতে চাচ্ছি, এটা জানা বিশেষ জরুরি। আমাদের কষ্ট বাঁচাবার জন্য কিছুই গোপন কোরো না — সব লিখো, এই ক্ষতিতে অভ্যস্ত হ'তে হবে তো।... এর দুটো উদ্দেশ্য — যদি এ-দেশ থেকে কিছু আবার সংগ্রহ করতে পারি, আর 'দেশে' বা 'আনন্দবাজারে' একটা আবেদন পাঠাবার কথাও ভাবছি — যদি কোনো পুরোনো বইয়ের দোকানে কেউ খুঁজে পায়।.. তুমি আমাকে বই বিষয়ে দফায়-দফায় উত্তর দিয়ো — ধরো যদি জানতে পারি যে 'কবিতা'র সেট ও ‍'র 'রচনাবলী' যথাস্থানে আছে তাহলে কিছু সান্ত্বনা পাই — এমনি আমার মনের অবস্থা।... আমরা আর্ত ও অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছি — চিঠি লিখো যদি চিঠিতে দুঃসংবাদ ছাড়া কিছু নাও থাকে তবু সেটা সান্ত্বনার কাজ করবে।...

†

২৬.

ব্লুমিংটন, ইলিনয়
৮ ফেব্রুয়ারী,৬৫

... সত্যের পরাভব যুগে-যুগেই ঘটেছে, তার দ্বারা আহত হবার বয়স আমরা পেরিয়েছি। আমার বিষয়ে অন্য অনেকে যা বহুদিন ধ'রেই জানে আমি তা মাত্র সম্প্রতি উপলব্ধি করলাম — আমার স্বভাবে উৎসাহ বেশি সতর্কতা কম, আমি আবেগের ঝোঁকে চলি, যুক্তির বড়ো ধার ধারি না — এর ফলে দুঃখ পেয়েছি ব'লে দুঃখ করি না (কেননা আনন্দও কম পাইনি) — মনস্তাপ এইজন্য যে আবেগের বশে অনেক নির্বোধ ও পাষণ্ডকে বিশ্বাস করেছিলাম।...বন্ধুতা ও ভালোবাসার চেয়ে মহৎ কিছু নেই জীবনে, আর যদি একজনের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরে থাকো তাহ'লেই জেনো তোমার জীবন ব্যর্থ নয়।... কলকাতার যত চিঠি পাই সবই অত্যন্ত মনখারাপ করা। কিন্তু জলে যেমন মাছ, প্যারিসে যেমন হাইনে, চোদ্দ অক্ষরে যেমন রবীন্দ্রনাথ, মন-খারাপে তেমনি — বু. ব.।

১৯৪৫ সাল থেকে একজনকে লেখা শতাধিক চিঠির মধ্যে এই ক'খানি এমন ভাবে সংকলিত হ'লো যাতে ব্যক্তিগত অংশগুলো প্রায় নির্মম ছাঁটাই করা সত্ত্বেও পত্রের রচয়িতা এবং গ্রহীতার মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুস্পষ্ট ছাপ তাতে রক্ষিত হয়, এবং যাতে তা থেকে লেখকের জীবনী সংক্রান্ত কিছু দরকারী উপাদান ঘটনার পারম্পর্য রেখে সন্নিবেশ করা যায়। অন্তত এই শেষোক্ত কারণেও, আশাকরি, আরো অসংখ্য ব্যক্তিকে লেখা পত্রাদি সযত্নে রক্ষিত হবে। মুদ্রিত চিঠিগুলি নরেশ গুহকে লেখা।

উল্লেখ পরিচয় :

১. হক্সলির উপন্যাস 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ'।

২.৩ 'কালোচুল' ছাপা হয় 'কবিতা' ১৩৫৩ পৌষ সংখ্যায় (এখন 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে আছে; পরের সংখ্যায় 'নেপথ্য নাটক' (কোনো গ্রন্থে নেই)। 'কালোচুল' কবিতার ছন্দ বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪. 'নোট্‌স্ টুঅর্ডস্ এ ডেফিনেশন অব কালচার' (১৯৪৮) এবং, খুব সম্ভব, 'দি আইডিয়া অব এ ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটি' (১৯৩৯)। এলিঅট সে-বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

৫. চল্লিশ বছর বয়সেই 'বেলা প'ড়ে এলো' বলার ধরনটা সহজেই অনুমেয়।

৬. 'কবিতা' পত্রিকা এই সময় অতি কষ্টে চালাতে হচ্ছিলো। এমনিতে বিজ্ঞাপন জুটতো সাড়ে চার থেকে পাঁচ পৃষ্ঠা, কদাচিৎ একটু বেশি। কিন্তু ১৩৫৫-র পৌষ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন পাওয়া গিয়েছিলো মাত্র দেড় পৃষ্ঠা। রাজশেখর বসু বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে দিয়েছিলেন আধ পৃষ্ঠা; এক পৃষ্ঠা ছিলো বিশ্বভারতীর।

৭. কবি নন এরকম মাত্র একজনের নাম বুদ্ধদেব বসুর রচনা এবং চিঠিপত্রে বহুবার উল্লিখিত আছে, তিনি মহাত্মা গান্ধী। যদ্দুর মনে পড়ে, 'কবিতা' পত্রিকায় শিরোনামহীন দুটি মাত্র রচনা ছাপা হয়েছিলো, গদ্যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে, আর ছন্দোবদ্ধ ভাবে গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে। কবিতাটি ছাপা হয়েছিলো বিলম্বিত ১৩৫৪, চৈত্র সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় : 'অসম্ভব আজীবন শোক করা। স্তম্ভিত পাথর ...।' (দ্র. 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর')।

৮. অরসন্ ওয়েল্স-এর ম্যাকবেথ।

৯. অরুণকুমার সরকার।

১০. অর্থাভাবে 'কবিতা' চালানো দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠছিলো ক্রমেই। কবি বা লেখক না-হ'য়েও বিমলেন্দুভূষণ সিংহ নামে অপরিচিত এক ভদ্রলোক অযাচিতভাবে এই সময় শস্তায় তাঁদের প্রেসে 'কবিতা' ছাপিয়ে দেবার প্রস্তাব নিয়ে আসেন ব'লে পত্রিকা শেষ পর্যন্ত বন্ধ হ'লো না। ১৬.৪ সংখ্যায় তাই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছিলো : 'সাহিত্য পত্রিকার ঘোর দুর্দিন এখন; ইংলণ্ডে 'হরাইজন' চললো না, একমাত্র কবিতা-পত্রিকা 'পোইট্রি লণ্ডন'ও সেদিন বন্ধ হ'লো। ...'কবিতা'র মতো পত্রিকা যে ষোলো বছর ধ'রে চলতে পারলো, একে বাঙালির দুর্মর সাহিত্যপ্রীতিরই প্রমাণ ছাড়া আর কী বলা যায়।'

১৯৫০-৫১ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর নিজের কোনো লেখা নেই।

১১. স্টেটসম্যান পত্রিকায় তৃতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার কর্ম নিয়েছিলেন ১৯৫০ সালে। পরের বছর এ-কাজ ছেড়ে দেন।

১২. বইটি 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' (১৯৫৫)। 'রবীন্দ্র রচনাবলী' প্রকাশের পরে 'কবিতা'র ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যা নিয়মিত রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা বেরোতে থাকে। কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার পর সামগ্রিক আলোচনা ছেড়ে শুধু কথাসাহিত্যে বেছে নেন, কারণ 'প্রথমত, আমার মনে হলো, রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনায় কাহিনীর আলোচনায় আমার পক্ষে অপঘাতের আশঙ্কা কম। ... দ্বিতীয়ত, আমি অনুভব করেছি (এখনো করি) যে এই কথাসাহিত্য বাঙালি পাঠকের কাছে যথাযোগ্য সম্মান পায়নি।'

চিঠিতে উল্লিখিত ইচ্ছে মতো সম্পূর্ণ নতুন কোনো বই শেষ পর্যন্ত লেখেননি। লেখা হয়েছিলো একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ যেটি পরের বছর (১৯৫২) মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত হয়। এখন সেটি 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের অবতরণিকা। গ্রন্থের 'অন্য প্রবন্ধগুলিও 'কবিতা' বা অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধের আক্ষরিক পুনর্মুদ্রণ নয়। 'অনেক অংশ বর্জিত, এবং অন্যান্য, যুক্ত হ'য়ে অনেক স্থলে পূর্বের কাঠামো ছাড়া বিশেষ কিছু বজায় থাকেনি।' বাংলা এবং ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর লেখা পাঁচটি বইয়ের মধ্যে এটি দ্বিতীয়।

১৩. ছাত্র পড়ানোর কর্ম নিতে হয়নি শেষ পর্যন্ত। অল্পকাল পরেই য়ুনেস্কো দ্বারা পরিচালিত 'সেমিনার অন এ্যাডল্ট এডুকেশনে'র উপদেষ্টা হয়ে দিল্লী যান, পরে মহীশূর। এক বৎসর এই কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

১৪. পৌষ ১৩৫৯, 'কবিতা' দ্র।

১৫-১৯. দীর্ঘদিন কবিতা না-লেখার পরে ১৩৫৯-এর আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা'য় একসঙ্গে তিনটি অনুবাদ বেরোলো : "বোদলেয়ার অবলম্বনে" ("একমাথা চুল", "শব", "আলবাট্রস")। এগুলি ছিলো নেহাৎ গদ্যধাচের খসড়া মাত্র, পরে যা রূপান্তরিত হয়েছে কবিতায়। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতাবলিরও সূচনা হয় এই সময়ে। কবিতার জন্মপ্রক্রিয়া

বিষয়ে বর্তমান চিঠিতে উল্লিখিত অংশের সঙ্গে 'না-লেখা কবিতার প্রতি : ১' রচনাটির বিবিধ মিল লক্ষণীয়।
জায়গাটা মহীশূর।

২০. প্রথম বার আমেরিকায়। এর কয়েক বছর আগেই 'কবিতা'য় (১৪.৩) অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধের পরিপূরকভাবে লিখেছিলেন "পাউণ্ড প্রসঙ্গে আরো।" পাউণ্ড-কৃত চীনা থেকে অনুবাদ-গ্রন্থ 'আনালেক্টস্'-এর কবিতাভবন-সংস্করণ এর আগেকার।
২১. পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গে অধ্যাপনার কর্ম নিয়েছিলেন।
২২. 'দেশ' পত্রিকায় এই সময় 'দেশান্তরে'র কিছু অংশ ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছিলো।
২৩. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের (তু. সা.-র) প্রধান হিশেবে যোগ দেন ১৯৫৬ সালের ১লা অগস্ট। পত্রের গ্রহীতা তাঁর বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন এর অল্পকাল পরেই।
২৪. তৃতীয়বার মার্কিন দেশে অধ্যাপনা।
২৫. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি
২৬. কবিতাভবনের তালা ভেঙে এক পুরাতন ভৃত্য বহু বইপত্র চুরি করে। খুচরো কিছু 'কবিতা'র সংখ্যা ছাড়া কিছুই উদ্ধার হয়নি।

শাপভ্রষ্ট দেবশিশু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আর পাঁচজন বাঙালী ছেলের মতোই আমারও ছিল ডাকে লেখা পাঠাবার বাতিক। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে একটা দুটো ছাপাও হ'তো। কিন্তু অমনোনীত হওয়াটাই ছিল তখন মোটের ওপর আমার লেখার বিধিলিপি।

ক্রমে একটা সময় এল, টুক্‌টাক যা পাঠাই তাই লেগে যায়। এই সময় 'কবিতা'-সম্পাদকের কাছ-থেকে-পাওয়া চিঠি আমার প্রথম চমক। একটি পোস্টকার্ডে দুটি কবিতা মনোনীত হওয়ার দু-ছত্র খবরের তলায় একটি রোমহর্ষক নামের স্বাক্ষর—বুদ্ধদেব বসু। চিঠিতে আমাকে বলা হয়েছিল সুবিধে মতো আমি যেন একদিন যাই।

তখন আমরা থাকি রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে মহানির্বাণ মঠের কাছে। সেখান থেকে কবিতাভবন দু-ফার্লংও নয়। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

তখন পর্যন্ত আমার যত বাক্‌ফাট্টাই বন্ধুদের সামনে। তার বাইরে সাত চড়েও বড়ো একটা রা-কাড়তাম না। বলতে গেলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি বন্ধুদের হাতে মানুষ; ভাষাশিক্ষা, সাহিত্যের চিন্তাভাবনা — এ-সমস্তই বন্ধুদের সূত্রে পাওয়া। নামকরা লোকদের পাড়া মাড়াবার সাহস হ'ত না।

কবিতাভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর বুক ঢিপ-ঢিপ করছে।

বুদ্ধদেব বসুকে কখনও চোখে দেখিনি। কবিতা পড়েছি, অসম্ভব ভালো লেগেছে; গল্প উপন্যাস পড়েছি সামান্যই। তখন পর্যন্ত আমার ধারণা, বড়ো কারো কাছে যাওয়া মানেই নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করা। কথাটা মনে হ'তেই আমার উৎসাহ নিবে এল।

তা সত্ত্বেও সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম নিতান্তই বুদ্ধদেব বসুকে দেখবার অদম্য কৌতূহলবশে। ভীরু হাতে ক্ষীণতম শব্দে কড়া নাড়িয়ে ভাবছি বুদ্ধদেব বসু বাড়িতে না-থাকলে কী ভালো যে হয়! হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আন্দাজেই বুঝতে পারলাম দরজা খুলেছেন খোদ বুদ্ধদেব বসু। আমার আর তখন পিছু হটার উপায় নেই।

আমি নাম বলতেই 'এস, এস' বলে তৎক্ষণাৎ সাদরে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। একটা ঢাকা বারান্দায় বসবার জায়গা। লোকটা দেখছি বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয়। বেশ অমায়িক কণ্ঠস্বর। তবু ভয়ে জড়সড় হ'য়ে বসলাম। বেশ বুঝতে পারছি আমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

বসতে-না-বসতেই 'সকালের প্রার্থনা' আর 'রোমান্টিক', আমার পাঠানো এই দুটি কবিতা নিয়ে উনি কথা শুরু ক'রে দিলেন। কোথায় কোন শব্দ কেমন লাগসই হয়েছে তা বললেন। মুখ

বুজে ব'সে আমি কথাগুলো গিলছিলাম। একজন অজানা অচেনা আনাড়ি লেখকের ডাকে-পাঠানো পাণ্ডুলিপি প'ড়ে অমন একজন ডাকসাইটে লেখক এত কথা ভেবেছেন, এতেই আমি কী যে আনন্দে আটখানা হয়েছিলাম বলার নয়। ঠিক আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ভাব হ'ল তা নয় মনে অসম্ভব জোর পেলাম।

পরদিন বন্ধুদের না-বলা অবধি আমার পেট ফুলে থাকল। বলতে গিয়ে দেখি এক নতুন জ্বালা। কেউ বিশ্বাস করে না। যে-বন্ধুর কাছে আধুনিক কবিতায় আমার প্রথম হাতেখড়ি, যদি-বা সে বিশ্বাস করল, তবু আমার এই আত্মবিজ্ঞাপনে সে শঙ্কা অনুভব না ক'রে পারেনি। কেননা এতে মাথা ঘুরে যাওয়ার ভয় থাকে।

আমার 'পদাতিক' বইটি বার হওয়ার পর বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'য় তা নিয়ে যে-দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, ছাপা হওয়ার আগে সে-সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও আমি জানতাম না। অথচ ততদিনে আমি 'কবিতা'র আড্ডায় নিয়মিত যাই-আসি। কবিতা লেখেন-না এমন অনেকেই সে-আসরে আসতেন। কবিতা তো বটেই, আরও বহু ব্যাপারে আমাদের মতের তফাত ছিল — কিন্তু ভিন্ন মতের জন্যে সেদিন কেউ কাউকে দূরে ঠেলে দেয়নি। 'কবিতা' পত্রিকা আর 'কবিতাভবনের আড্ডা' — এ-দুটোর ছিল পৃথক সত্তা। 'কবিতা' ছিল একজনেরই হাত-ধরা — বুদ্ধদেব বসুর। তাতে অনেকের সহযোগ থাকলেও, আর-কারো হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য হ'ত না।

নিজের বইয়ের প্রসঙ্গ যদিও এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন, তা সত্ত্বেও নতুন লেখকের অভিজ্ঞতা হিশেবে কয়েকটি কথা বলা এখানে বোধহয় অবান্তর হবে না।

'পদাতিক'-এর আলোচনা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন — অতি-প্রশংসায় ছেলেটির মাথা ঘুরে যাবে। নিজের মাথা ঘুরে গেলে নিজে টের পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু সমর সেনের মাথা যে ঘুরে যায়নি, সেটা আমি দেখেছি। আজকালকার নামী সম্পাদকেরা সেদিক থেকে অতিমাত্রায় হিশেবি; নতুন লেখকদের পাছে মাথা ঘুরে যায়, সেইজন্যে তাদের চুল পাকা পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেন। অনেকে অপেক্ষা করেন লেখক টেঁসে যাওয়া পর্যন্ত। থুথু দিয়ে সাহিত্যে চিড়ে ভিজে না এই আপ্তবাক্য মনে রেখেও আমি বলব, নিরুত্তাপ আশ্রয়ের চেয়ে নতুন লেখকদের লেখার পক্ষে বরং স্বাস্থ্যকর ঈষদুষ্ণ প্রশ্রয়।

তিরিশ বছর আগের কথা। এখনও মনে হয় এই সেদিন।

আমি তখন লেখা ছেড়ে আস্তে-আস্তে পার্টির কাজে ডুবছি। মাঝে-মাঝে বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি যাই। বেআইনী কাগজপত্র পড়াই, চাঁদা আদায় করি, বিবৃতিতে সই নিই। আমার নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প তাঁর মধ্যে সংক্রামিত করতে পেরেছি মনে ক'রে খুশী হ'য়ে ফিরে আসি। কিছুদিন পরে গিয়ে দেখি আমার সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। ইতিমধ্যে কার কাছে কী শুনে উল্টো কথায় তিনি নেচে ব'সে আছেন। উল্টে আমাকেই কিনা বলেন, পার্টির খপ্পরে প'ড়ে লেখা নষ্ট করছি। সেই রাগে দীর্ঘদীন তাঁর মুখদর্শন করিনি।

দীর্ঘ দিন। কিন্তু বরাবর নয়। হঠাৎ-হঠাৎ গিয়েছি। আবার সেই তর্ক। আবার সেই অনুযোগ। কবিতা তখন আমার কাছে দূরের স্মৃতি। গিয়েছি কবিতার টানে নয়, মানুষটার টানে।

ব'লে না-দিলে আমার মনেই পড়ত না বুদ্ধদেব বসুর বয়স হয়েছে। তিরিশ বছর ধ'রে তাঁকে দেখছি। সমানে লিখছেন। সমানে নিজেকে বদলাচ্ছেন। লেখার মধ্যে কোথাও এমন

ক্লান্তি নেই যা-দিয়ে ধরা যাবে যে, তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির উৎস আজও অফুরন্ত। এখনও নতুন পথে পা-বাড়াতে তিনি ভয় পান না, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এখনও তিনি অকাতর। একে কি বয়স হওয়া বলে?

কিন্তু তার চেয়েও আমার অবাক লাগে, অবিরাম নিজে লিখেও অন্যের লেখা সম্বন্ধে কি ক'রে একজন এতটা শ্রদ্ধা এতটা আগ্রহ দেখাবার ফুরসত ক'রে উঠতে পেরেছেন! যখন 'প্রগতি' বেরিয়েছে, বলতে গেলে তখন থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সারথ্য তাঁর হাতে। তাই প্রতিপক্ষ সবচেয়ে বেশী শরবর্ষণ করেছে তাঁরই বিরুদ্ধে। সমকালীন লেখকদের মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানানো, অঙ্কুরেই প্রতিভাকে চিহ্নিত করা, বুক দিয়ে আগলানো — সাহিত্যে এভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আর কে করেছেন? অথচ তার মধ্যে বিন্দুমাত্র মুরুব্বিয়ানার ভাব নেই। বাংলা সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা পৃষ্ঠপোষকের নয় — প্রহর-জাগা শান্ত্রীর কিংবা সেনাপতির।

অথচ লোকটাকে ভালো লেগেছিল অতশত বুঝে-শুনে নয়, বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসামান্যতার হিশেব-নিকেশ ক'রে নয় — প্রায় অকিঞ্চিৎকর কারণে। লেখার ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতেও মানুষ হ'তে পারে। তা সে কবিতার পাণ্ডুলিপিই হোক আর বাজারের ফর্দই হোক। দামী কাগজে রঙীন কালিতে ছবির মতন হস্তাক্ষর। বানানে, শব্দচয়নে, যতিচিহ্নে মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ। ছাপার হরফ নির্বাচনে, পৃষ্ঠসজ্জায় পুঙ্খানুপুঙ্খতা। লেখার বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ছেলেমানুষী বিস্ময়। ঘর-ফাটানো হো হো শব্দে হাসি। পরনিন্দা পরচর্চায় আগ্রহের অভাব। বাংলাভাষার প্রতি সীমান্তহীন মমত্ব। বিত্তবৈভবের সোনার-হরিণে তাঁর সম্মোহ। সাহিত্য তাঁর লক্ষণের গণ্ডি। তার বাইরে তিনি সর্বদাই অপহরণযোগ্য। দোষেগুণে মানুষ তো সবাই। কিন্তু এমন অকৃত্রিম অকপট খোলামেলা মানুষ কম আছে। আপাদমস্তক বর্মাবৃত হ'য়ে তিনি লড়েন না; স্থির লক্ষ্যে তাঁর গায়ে তীর বেঁধানো সম্ভব। মনে এক, মুখে আর-এক নয়; বাইরে থেকে তাঁর ভেতর দেখা যায়।

বিরুদ্ধ মত নিয়েও সাহিত্যে সহাবস্থানে আমি বিশ্বাসী। ঘোঁট-দলাদলিকে যাঁরা নিরেট নিশ্ছিদ্র ব'লে ধ'রে নেন, তাঁদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতায় মেলে না। যুদ্ধের সময় যখন আমরা 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' গ'ড়ে তুলছিলাম, তখন সব দলের লেখকের কাছেই আমাকে যেতে হয়েছিল। দেখা গেল, গোষ্ঠীগত ভাগগুলো চূড়ান্তও নয়, দুরপনেয়ও নয়। আড়ালগুলো সরাতে পারলেই লেখকদের এক করা যায়। পরস্পরের অনেক মন-গড়া সন্দেহ-অবিশ্বাস সাক্ষাতে দূর করা সম্ভব। ঘরকুনো, মেজাজী, অনমনীয় বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে আমার যে-ভয় ছিল, দেখলাম আমাদের উৎসাহের বানে তিনিও ভেসে গেছেন।

যুদ্ধ শেষ হ'তেই আবার সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। কবিতাভবনের ঝুলবারান্দায় টাঙানো নেতাজীর প্রতিকৃতি দেখে বোঝা গেল, হাওয়া এখন দিক বদলেছে। ভয়ে-ভয়ে কড়া নাড়ি। সেই চিরপরিচিত সহৃদয় অভ্যর্থনা। আবার তর্ক। আবার অনুযোগ। আমার বিশ্বাস স্থির; কলম স্তব্ধ। তাঁর বিশ্বাস পরিবর্তমান; কলম নিরলস।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রকাশ্যে মতের লড়াই ক'রে দেখেছি, তাতে ব্যক্তিগত সম্পর্কে চিড় খায়নি।

জেল থেকে বেরিয়ে একবার 'কবিতা-ভবনে' গিয়েছি। তখন তাঁর রাজনৈতিক মত রীতিমতোভাবে আমাদের বিপরীত মার্গে। কথায়-কথায় ম্লান হেসে বলেছিলেন — শুনেছি, ফরাসীদেশে রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও আরাগঁ আর মরিয়াক নাকি পরস্পরের লেখা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েন।

সুখের বিষয়, ফরাসীদেশের সে-ঘটনা না-জেনেও বুদ্ধদেব বসু কিংবা বিরোধী মতের লেখকদের লেখা সে-সময়ে আমি কিংবা আমার সমমতের লেখকরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই পড়েছি। কখনও হয়ত বক্তব্য এড়িয়ে রচনার গুণ মন স্পর্শ করেছে। মতামতের উত্তাপ ়সবোধে কোনো প্রভাব ফেলেনি তা নয়। কিন্তু মন খোলা রাখার চেষ্টা ছিল।

এলোমেলোভাবে বছরের পর বছর টপ্‌কে অনেক দূর এসে পড়েছি। অথচ আসল কথাটাই বলা হয়নি। গদ্যের চেয়েও বুদ্ধদেব বসুর কবিতাই আমাকে বেশি টানে। বলা উচিত, তাঁর চিন্তামূলক গদ্য যত বেশি ভালো লাগে তার চেয়েও ঢের বেশি ভালো লাগে তাঁর কবিতা। অন্য-সব দায় সেরে কবিতায় তিনি হ'তে চান সহজ স্বচ্ছন্দ: কিন্তু নির্ভার নয়। সেইজন্যেই বোধহয় পয়ারের পদবন্ধই তাঁর হাতে সবচেয়ে বেশি খোলে। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো হ'য়েও 'বন্দীর বন্দনা'র আবেগ এখনও ক্ষুরধার।

শাপভ্রষ্ট দেবশিশু? মূলত তাই। আর সেইজন্যেই বুদ্ধদেব বসু সব-কিছু ছাড়িয়ে কবি। ঘরের বাইরে তাঁর অপার বিস্ময়। সব জেনে-বুঝে শেষ ক'রে ফেলার মধ্যে তিনি নেই। বোধহয় সব কবির মধ্যেই থাকে সেই শিশু। যার বয়স কখনও বাড়ে না। জীবনে যার ক্লান্তি নেই। শব্দ নিয়ে যার খেলা।

শব্দের চোখ-কান আছে। সেইজন্যেই বোধহয় শব্দও এক রকমের অভিজ্ঞতা। এ-কথা বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে কয়েকবার আমার মনে হয়েছে। নইলে ঘর ছেড়ে যিনি নড়েন না, বাইরের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক প্রধানত লেখা আর মুখের শব্দে — কী ক'রে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন?

আসলে মানুষ শুধু লেখা বদলায় না, লেখাও মানুষকে বদলায়। বাইরের তাড়না যতটা না, তার চেয়ে অন্তঃপ্রেরণাই হয় সে-পরিবর্তনের আসল চাবিকাঠি। যত দিন গেছে, ততই বুদ্ধদেব বসু যে মাটির টান বেশি-বেশি ক'রে অনুভব করেছেন, তার কারণ বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর নাড়ির বন্ধন।

শব্দের ভেতর দিয়ে এই যোগ। দেশজ ভাবনায় এ-যেন তাঁর দূর দেশান্তর থেকে ক্রমশ ঘরে ফেরা।

কবিতার এই পালাবদল তাঁর বহিরঙ্গে, তাঁর অন্তর্দেশীয় আর বহির্দেশীয় যোগাযোগে নতুন ক'রে কোনো রূপান্তর ঘটাবে না কি? মাটি আর মানুষের কোনো দায়ই তাঁর ওপর বর্তাবে না?

আমি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা নই। কিন্তু ঘোর আশাবাদী।

দূরে এসে ভালো থাকি
অশোক মিত্র

নতুন দিল্লি
২৯ অক্টোবর, ১৯৬৮

প্রিয়বরেষু,

নরেশ, ক্ষমা চাইছি। লিখতে ব'সে কলম *ঠেকে-ঠেকে* যাচ্ছে। বুদ্ধদেব ষাট পেরোলেন — যেমন বোধহয় আরো পেরোলেন বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, এঁরা সবাই, — কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও তো বুড়িয়ে গেলাম, ফুরিয়ে গেলাম। বছরের পর বছর আরো গড়াবে, বুদ্ধদেব তাঁর তন্নিষ্ঠায় স্থিত থাকবেন, কিন্তু আমরা? কতগুলি নিছক কঙ্কাল আমরা, প্রেতস্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, অথচ নিহিত কোনো বাণী বা বাসনা *নেই* আমাদের। আমার-আপনার আলাদা-আলাদা কিছু বিশ্বাস আছে হয়তো, কিন্তু আস্থাকে যা দীপ্ত ক'রে তোলে সেই নিষ্ঠা কোথায়? সুতরাং, *স্রেফ* তারিখকে বিনম্র প্রণাম জানাবার উপলক্ষসূত্রেও, যা-ই বলতে যাবো-না-কেন, একটা ফাঁক থেকেই যাবে। নিষ্ঠা, যার আরেক নাম প্রেম, আমাদের হৃদয়ে কোনোদিন নাড়া দিয়ে যায়নি। সাময়িক ব্যসনে আমরা মাঝে-মাঝে দোলায়িত হয়েছি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সুতরাং আজ কোন সাহসে বুদ্ধদেবের উপর দু'ছত্র প্রবন্ধ রচনা করতে বসবো, লজ্জায় যে আমার মাথা কাটা যাবার উপক্রম হবে।

দূর থেকে শ্রদ্ধা জানানোই তাই ভালো। এমন-কি কলকাতা গেলেও, আপনি তো জানেন, বুদ্ধদেবের সঙ্গে ইদানীং কচিৎ-কদাচিৎ আমার দেখা হয়। টালিগঞ্জের সুদূর দক্ষিণ রাসবিহারী এভিনিউ-র সেই স্মৃতিলাঞ্ছিত ফ্ল্যাটটির প্রতিতুলনায় অবশ্যই বহুতর দুর্গম, কিন্তু বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা না-হবার সেটা একমাত্র, অথবা প্রধান, কারণ নয়। মনের প্রবাহ দুই সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের উপত্যকা বেয়ে এগোচ্ছে, সময় যতই আরো-একটু পা-বাড়াচ্ছে, দূরত্ব বাড়ছে। যে-আমি একদা বুদ্ধদেবের কবিতার স্তবকে আমার জিভকে হ্লাদিনী ক'রে নিয়ে ঢাকা শহরের করোনেশন পার্কের প্রান্ত থেকে নীলক্ষেতের নীলিমার দিগন্তে পায়ে হেঁটে-হেঁটে বিলীন হ'য়ে যেতে পারতাম, যে-আমি '*হঠাৎ-আলোর ঝলকানি*'র গদ্যের স্বাদে আমার কৈশোরকে প্লাবিত ক'রে বেঁচেছিলাম, যে-আমি '*যেদিন ফুটলো কমল*'-এর অপাপবিদ্ধ মৌসুমী প্রেমের আশ্লেষে মৃত্যুর কাছাকছি চ'লে গিয়েছিলাম, সেই আমি স্মৃতিসর্বস্বতা ছাড়া এখন আর অন্য-কোনো উপচারই দাবি করতে পারি না। '*যে-আঁধার আলোর অধিক*'-এর উত্তরপর্বের সঙ্গে আমার মনের আবেগের মিলনক্ষেত্র *নেই*। আবু সয়ীদ আইয়ুব যখন '*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*'কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সহিত্য-কীর্তির সমান সোপানে অধিষ্ঠিত করেন, নিজেকে ভীষণ নিরক্ষর মনে হয় আমার। দূরে এসে তাই ভালো থাকি, দূর থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে।

সুতরাং আমার শুধুই পিছনে-ফিরে-তাকানো, নিছক স্মৃতিতে দহিত হওয়া। এলোমেলো স্মৃতি, সময়ের পরম্পরা না-মেনে তার নিজেকে উজাড় ক'রে আনা। 'আমায় খেপিয়েছিলো যেই-কবিতার বইগুলো সেই প্রথম ফাগুনে', বোধ হয় ১৯৪০ সাল; 'ভাঙা গলার বাঙাল কথা রাঙালো প্রাণ মন নারানগঞ্জের ইস্টিশানে দুপুরবেলায়', হয়তো ১৯৪১; উজ্জ্বল ঝকঝকে 'কবিতা' পত্রিকার একাদিক্রম সংখ্যা, হঠাৎ তারই কোনো একটিতে : 'বিনয় বৃদ্ধের বিদ্যা, দাম্ভিক যৌবন/মনে করে সূর্য তারই সম্ভোগের পথের প্রতীক,/রতিহ্রস্ব রাত্রির পাহারা' — আমি তাহ'লে ১৯৩৯-এ পৌঁছে গেলাম· 'নতুন পাতা'র শিরশিরানি দমকা মেরে আমাকে ছুঁয়ে গেলো : 'তার মুখ কি এখন দক্ষিণে, কলকাতার দিকে ফেরানো?' পুরোনো 'ভারতবর্ষ'-এর বাঁধানো সংখ্যা, যতদূর মনে পড়ে সেটা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প 'ইতি', সরলার করুণোপাখ্যান, যে-পৃষ্ঠায় শেষ হ'লো ঠিক সেখানে, প্রায় মেপে-বসানো, শ্রী বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : 'সব শেষ হলো তবে, তাই হোক, অশ্রু ফেলিয়ো না;/জানো না কি অশ্রুজল ওষ্ঠপুটে ঠেকে বড়ো নোনা,/বিষম বিস্বাদ—/যে-ওষ্ঠে রেখেছো এঁকে প্রণয়ের সম্পূর্ণ সম্বাদ?' কিন্তু জলধর সেনের চমক-লাগানোর ওখানেই ইতি নয়, সামান্য কয়েকটা পৃষ্ঠা এগিয়ে শ্রী বুদ্ধদেব বসুর গল্প : হালতু-ফালতু গল্প নয়,— ভেবে দেখুন, সেটা ১৩৩৪ সাল, এবং পত্রিকাটির নাম 'ভারতবর্ষ' — একেবারে সেই ভীষণ রকম দুঃসাহসী গল্প, যার শুরু আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই বাসি পাঁউরুটির-রঙের মেসের বর্ণনায়, যে-মেসের মুখোমুখি এক পানের দোকান, যে-দোকানে রিক্সাওয়ালা- হ'তে-পারে-কিন্তু-গুণ্ডা-হওয়াই-সম্ভব এমন চেহারার কিছু লোক সর্বক্ষণ আড্ডা দেয়, কিন্তু যে-দোকানের চাইতে রসালো পান কলকাতা শহরের অন্য কোথাও পাবেন না, চুন-খয়েরের পারস্পরিক অনুপাত এতই 'পার্ফেক্ট'।

আরো : 'রাত্রির মতো তোমার চুল, হৃদয়ে তাহার স্বপ্ন দেখি', অথবা সেকালের রাজাদের দুই প্রধান ব্যসনের বিবরণ, রাধারানীর নিজের বাড়ি কী ক'রে রক্তকে-সত্তাকে-সন্তানকে দীর্ণ ক'রে গাঁথুনির-পর-গাঁথুনি উপরে উঠলো, যে-বাড়ির লাল সিঁড়ি, সিঁড়ির জন্মকাহিনী, বিক্রমপুর পরগণার গহনারণ্যে সোনারঙ্-মধ্যপাড়ার কোন শ্যাওলায়-নিবিড়-হ'য়ে-আসা পুকুরপাড়ে বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা-ডুবোনো প্রেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শান্ত-চোখ অস্ফুট মেয়েটি, যার নাম অপর্ণা, সে যেন আমাকেই অনুযোগ ক'রে বললো, 'বড়ো দেরি ক'রে এলেন...'।

আমার শৈশব-কৈশোর-প্রথম যৌবন, বুদ্ধদেবের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ-প্লাবিত ঢাকা শহরের সেই দিনগুলি, যারা এখন ছায়া-ছায়া হ'য়ে এসেছে। স্বীকার করতে আদৌ সংকোচ নেই, দুটো পাশাপাশি স্মৃতি আমার মনে একত্র জড়িয়ে আছে : ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট-গাছপালা, আরমেনিটোলা স্কুল-জগন্নাথ কলেজ-ঢাকা হল, আমার প্রথম প্রেমিকা, কিন্তু তারই পাশাপাশি 'বন্দীর বন্দনা'-'কঙ্কাবতী'র সঙ্গে প্রথম প্রণয়ের উতরোল আনন্দ, 'ছুটি যতই কাছে আসতে থাকে, মনের ভিতর একটা গান বেজে ওঠে : চলো, চলো' — এ-রকম উজ্জ্বল গদ্যের গহনে রোমন্থনসুখ, 'কবিতা'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলির সংস্কৃত পরিবেশে বেড়িয়ে-আসার প্রদীপ্ত অভিজ্ঞতা। ঢাকা শহরে আর কোনোদিন ফিরে যাবো না, কৈশোরের লীলাসঙ্গিনীরা আজ সবাই-ই প্রৌঢ়ত্বের উপান্তে, এখানে-ওখানে ছিটকে আছেন, রমনা অথবা অর্ফ্যানেজ রোডের

সেই ঝাঁকড়া-মাথা উদ্ধতশাখা কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির আগুনের কমলারঙও আমার স্মৃতিতে স্তিমিত-নিস্প্রভ, 'শাপভ্রষ্ট' কবিতাটিও আর প্রথম-থেকে-শেষ পর্যন্ত মুখস্থ বলতে পারি না, 'মন-দেয়া-নেয়া' নামে একটি ছোট্টো উপন্যাস, যা ক্লাস সেভেনে প্রথম পড়েছিলাম, তার নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে কী সম্বোধনে ডাকতো তা-ও আর মনে আনতে পারি না। 'আমরা যখন ছোটো ছিলাম, পরিমল, মনে নেই কি কী হতো?' এই পদ্যের পাশাপাশি 'একটি পরীর গল্প' মিলিয়ে নিয়ে অপার্থিবলোকে উত্তীর্ণ হবার অলৌকিক সৌভাগ্যের ঋতু বহুদিন শেষ। কিন্তু তাহ'লেও স্মৃতিকে কী করে অস্বীকার করি, কী ক'রে এটা ভুলে থাকি বুদ্ধদেবের তখনকার সমস্ত রচনা আমার উন্মেষের সংগোপনবৃত্তান্তের সঙ্গে জড়ানো? আজ যত দূরেই যাই — এমনকি বুদ্ধদেবও যদি বহুদূরে চ'লে যান — অতীতকে এড়ানো অসম্ভব, সে আমাকে তাড়া ক'রে ফিরবে। প্রজ্ঞা থেকে প্রজ্ঞান্তরে আমরা বিহার ক'রে ফিরি, নাবালক চিন্তা-ধারণা ইত্যাদি আস্তে-আস্তে খ'সে পড়ে, কিন্তু পলিমাটি প'ড়েই থাকে, আমার সেই পলিতে ঢাকা শহরের পুঞ্জ-পুঞ্জ রেণুসম্ভার, বুদ্ধদেবের কবিতার কণার ছড়ানো ঐশ্বর্য। যে-আমি এখন কবিতার নামে বিবিক্ত বিষাদে ঢ'লে পড়ি, বিরক্তিতে কুঁচকে উঠি, সেই আমাকেও মানতে হয় : আমার চেতনার পরতে-পরতে কবিতার সংবেদনা, এবং সে-সংবেদনার স্পর্শে আমি ধন্য। উন্মেষমুহূর্তে কবিতার পুষ্পবৃষ্টি না-ঘটলে আমি অন্য জীবে পর্যবসিত হতাম। সুতরাং বুদ্ধদেবের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

যতদিন ঢাকা ছিলাম, বুদ্ধদেব-বিভোরতায়ই কেটেছে। উপরে যা বলেছি, ঢাকা এবং বুদ্ধদেব-উন্মাদনা, আমার স্মৃতিতে দুটো তাই একীভূত। ভালো ক'রে যখন জ্ঞান হ'লো, 'প্রগতি' ততদিনে বন্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু উজ্জ্বলতার রেশটুকু প'ড়ে আছে ঢাকা শহরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হলাম, সাহিত্যের বিশ্লেষণশৈলী শেখাতেন মন্মথমাথ ঘোষ-অমলেন্দু বসু, ধনবিজ্ঞানকে প্রায় সাহিত্য ক'রে নিয়ে বোঝাতেন পরিমল রায়। খুব ঘরোয়া পরিবেশ ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে এক আশ্চর্য-অদ্ভুত নিবিড়তা; সুতরাং ক্লাসের বাইরেও, সকাল-সন্ধ্যা-ছুটির দিন জুড়ে আমাদের সম্মিলিত সাহিত্যালোচনা, যে-আলোচনার অনেকটা জুড়ে বুদ্ধদেব বসু। পরে দুশো দুই নম্বরের বাড়িতে বহু সন্ধ্যা আড্ডা দিয়েছি, আপনি-আমি-অরুণকুমার সরকার, সন্ধ্যা রাত্রি হয়েছে, রাত্রি মধ্যরাত্রি হয়েছে, মধ্যরাত্রি পেরিয়ে আকাশের ফিকে হবার উপক্রম, অন্যায় আবদারে প্রতিভা বসুকে বিপর্যস্ত করেছি, অজস্র বিনিময়ের প্রহর গেছে সেই সব; কবিতাভবন থেকে বেরিয়ে রাসবিহারী এভিনিউ-র ট্রাম লাইনের ঘাসে আমাদের আড্ডা ফের জমায়েৎ হয়েছে, রাত হয়তো তখন সাড়ে-তিনটে, ট্রাম লাইন থেকে উঠে আমরা হয়তো আরেক-দফা দেশপ্রিয় পার্কের স্তব্ধতাকে দীর্ণ করতে গেছি, কিংবা নিরুপম হয়তো গেছে জারুল পাড়তে কোথাও, আমি এবং আরো কয়েকজন হয়তো সকাল ছ'টায় আপনার ব্যাল্‌কনিতে লম্বা হ'য়ে শুয়ে এক-সময়ে সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি, উজ্জ্বল রোদের প্রহারে ঘুম ভেঙে গেছে। এই যে আড্ডা, সময়-না-মানা, নিয়ম-না-মানা, ভব্যতা-না-মানা আড্ডা, তাতেও তো প্রথম-থেকে-শেষ পর্যন্ত জায়গা জুড়ে বুদ্ধদেব বসু। যে-আড্ডার ঢাকা থেকে শুরু, বহু বছর ধ'রে সেই একই আড্ডা আমি দিয়ে এসেছি, যার আবরণ-আচ্ছাদন-উন্মোচন-উচ্চারণ সব-কিছু বুদ্ধদেব কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস-গল্প-সম্পাদনা প্রতিভা-ব্যক্তিত্ব নিয়ে। সেই স্বপ্নময়

বছরগুলির সঙ্গে আজ যদি হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হ'য়ে যায়, কোন সাহসের নির্ভবে আমি অন্যদিকে ঘাড় ফেরাবো তাহ'লে?

অথচ কোনোরকম পাপবোধও নেই আমার। আপনার চিঠিতে অনুশোচনা ছিল : হায়, বুদ্ধদেবকে সম্মানজ্ঞাপনার্থ যে-প্রবন্ধসংগ্রহের পরিকল্পনা এ-বছর শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ পেলো, তা কেন দশ বছর, অথবা কুড়ি বছর, আগে আমরা উদ্যোগ করিনি। এই অনুশোচনায় আমার সায় নেই। বুদ্ধদেবকে যা দেয়, এক-সময়ে আমরা হয়তো একটু বেশি পরিমাণেই দিয়েছি : আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের ভক্তি, আমাদের অভিভূত অনুরাগ। একবার তাকিয়ে দেখুন হালের তরুণদের দিকে : পূর্বসূরীদের নিয়ে তাঁদের মাথা-ঘামানো নেই। ঐতিহ্যকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে ধ'রে নিয়েছেন, ঐতিহ্যের ইতিহাসে তাঁরা আগ্রহহীন। তাঁরা একমাত্র নিজেদেরই চেনেন, জানেন, পছন্দ করেন, তাঁদের পত্রিকায় শুধু পরস্পরকে-নিয়ে আলোচনা, এক কিংবা দেড়দশক আগে যে-কবিরা স্পন্দিত হচ্ছিলেন, তাঁদের ব্যথাবেদনারূপকউপমা নিয়ে আলাপের বিলাসিতা নেই। ১৯৪৭-৪৮ সালে ফিরে গিয়ে নিজেদের কথা ভাবুন : নরেশ গুহ-কে নিয়ে অরুণকুমার সরকার প্রবন্ধ ফাঁদেননি কোনোদিন, অরুণকুমার সরকার-কে নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে নিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-কে নিয়ে নরেশ গুহ। সমর্পিত সম্ভ্রমের যুগ গেছে সেটা : আমরা আলোচনা করেছি বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দেকে নিয়ে, আমাদের তর্ক গড়িয়েছে সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের প্রদাহপ্রজ্ঞাআনন্দ নিয়ে। বাংলা সাহিত্যে এ-রকম আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কোন যুগে খুঁজে পাবেন? নিজেদের সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কবিদের তর্পণ, নিজেদের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ রুচিচিন্তাগর্হিত। বুদ্ধদেবরা যাট পেরোলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও তো বুড়িয়ে গেলাম, প্রৌঢ়ত্বের যূপকাষ্ঠে দাঁড়িয়ে অরুণকুমার সরকার-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-নরেশ গুহ-রা কী সান্ত্বনায় এখন স্থিত হ'তে পারছেন?

না, দেওয়া হ'লো না যে আপনাকে, সে-রকম পরিশীলিত ব্যথা মনে লাগার আদৌ উপলক্ষ নেই। রাখি-ঢাকিনি, আমরা নিজেদের নিঃস্ব ক'রে দিয়েছি, সুতরাং যেন কোনো গ্লানি না-লেগে থাকে। গ্লানি নয়, অপরাধবোধ নয়, আমার মন ছাপিয়ে যা তা দুঃখ। আমার অন্তত, স্মৃতি ছাড়া অন্য-কোনো আশ্রয়ই নেই : এই রিক্ততার দুঃখ। আমরা কেউ-ই এক জায়গায় স্থিত থাকি না, হয়তো থাকা উচিতও নয়। স্থিতি মানেই তো মৃত্যু; যেহেতু প্রত্যেকেরই আমাদের স্বতন্ত্র চেতনায় অধিকার, আমরা আলাদা হ'য়ে ভাবি, আলাদা হ'য়ে এগোই। আমি এখন যে-পৃথিবীতে, তার মানসতা হয়তো বুদ্ধদেবের ন্যক্কার উদ্রেক করবে; বুদ্ধদেবের চিন্তার বর্তমানে যে-পরিমণ্ডল, আমার কাছেও হয়তো তা সমান অস্বস্তিকর। এখনো মাঝে-মাঝে, যখন কয়েক সপ্তাহের জন্য কুহকিনী কলকাতার অতিথি হই, ইচ্ছে হয় পুরোনো কবিতাভবন না-ই থাকলো, সবাইকে জুটিয়ে তাহ'লেও চ'লেই না-হয় যাই সেই পল্লীপ্রান্তে, হৈ-হৈ ক'রে কিছুটা আড্ডা দিয়ে আসি, বুদ্ধদেবকে রূঢ় ক-টা কথা শুনিয়ে আসি, যে-কথা শুনে ভদ্রলোক উত্তেজিত হবেন, আমাদের দুর্বিনয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে চেঁচাবেন, কিন্তু খেয়াল ক'রে যে এতদূর গেলাম দেখা করতে, তাতে খুশিও হবেন খুব। কিন্তু হয় না, কোথাও থেকে জড়তার আড়াল নামে, ভয়, কী হবে গিয়ে, হয়তো প্রসঙ্গক্রমে কোনো অপ্রিয় বিষয়ে পৌঁছবো, হয়তো যা তাঁর প্রাপ্য নয় এমন

অন্যায়-অসঙ্গত কতিপয় কটূক্তি ক'রে বসবো, হয়তো আবহাওয়া ঘন হবে, হয়তো অনুশোচনায় তারপর জ্বলবো, পুড়বো। তার চেয়ে দূরে থাকা ভালো, স্মৃতিকে সম্বল ক'রে, ক্বচিৎ-কখনো ঢাকা শহরে ফিরে যাওয়া, আমার প্রথম প্রেমিকার মুখ, শাড়ির যে-রঙ তার সবচেয়ে প্রিয় ছিলো সেই রঙ হুবহু মনে আনবার চেষ্টা, আর বুদ্ধদেবের অজস্র-অপরিমিত কবিতা, যে-কবিতার বন্যায় ডুবে-মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম।

দেশভাগের পর বাংলাদেশ থেকে — অন্তত এদিককার বাংলাদেশ থেকে — মফস্বল অবলুপ্ত। কলকাতা পেরিয়ে পশ্চিম বাংলায় নগর-এবং-পল্লীর-মাঝামাঝি-অবস্থানের লক্ষণযুক্ত অন্য-কোনো সত্তা নেই, কলকাতা পেরিয়ে হয় দুর্গাপুর-বার্নপুরের অশ্লীল ঘড়ঘড়ানি, নয়তো শ্যাওড়াফুলি-কোন্নগরের কোটর-হাঁ-করা জীর্ণতা। অন্যদিকে সীমানার ঐ-প্রান্তে আমার শৈশবের মফস্বলের মদিরতা বুলোনো ঢাকা-ও রাজধানীর শরীরে হারিয়ে গেছে : হয়তো খুলনা কিংবা চট্টগ্রামে, রাজশাহী অথবা বগুড়ায় মফস্বল এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু তার খবর আমার কানে পৌঁছয় না। সুতরাং আমার কাছে মফস্বল মানেই দুই মহাযুদ্ধ-মধ্যবর্তী ঢাকা শহর, যে-শহরে 'গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে, ফেলে যায় গায়ের সুবাস।' শান্ত মফস্বল, সীমিত মফস্বল, যেখানে সবাই সবাইকে চেনে, ছোটো ছোটো একটা পাড়া যেখানে ঘরোয়া সুষমায় সমাহিত। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সেই ঋতুতে এই বাংলাদেশেই বেকার সমস্যা তীব্র হ'য়ে দেখা দিয়েছিল, আমাদেরই পিতামহপিতাপিতৃব্যকুল শোষণে-পীড়নে মুসলমান প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন, ধান-পাটের দাম নামতে-নামতে প্রায় তুচ্ছতায় গিয়ে পৌঁছেছিল, পল্লী-অঞ্চলে থমথমে নিহিত অশান্তির মধ্যেই দেশভাগের সূচনা ঠিক সেই ঋতুতেই লিপিবদ্ধ হচ্ছিল। এ-সমস্তই মানি, না-মেনে উপায় নেই, ইতিহাসের সঙ্গে রসিকতা চলে না। কিন্তু তা ব'লে জীবনানন্দ দাশের বরিশাল, বুদ্ধদেব বসু-র ঢাকা, টলোমলো ভরাবুক মফস্বল, মিথ্যে হবার নয়। 'কখনো সে-হাত ছুঁই যদি, তবু জানিব না/এ-ই সেই হাত' এমন পংক্তি ঐ-মফস্বলকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না, বাংলাদেশের মফস্বল না-থাকলে এমন কবিতা কখনো লেখা হ'তো না। অথচ, কোনো বিকল্প-প্রস্থান নেই, ইতিহাস এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার নয়, এমন-কি ভূগোলও ব'দলে যাচ্ছে অহরহ। আমাদের প্রকৃতি ব'দলে যাচ্ছে, আমাদের আচরণে অন্য নদীর হাওয়ার উচ্ছ্বাস। পৃথিবীটা হঠাৎ মস্ত বড়ো হ'য়ে গেছে; তাই আমি, অশোক মিত্র, ছিটকে একদিকে, আমার কৈশোর-স্বপ্নের, প্রথম-প্রেমের ঢাকা কুয়াশায় ঢাকা পড়লো, বুদ্ধদেব বসু-র জগৎ ভীষণরকম তফাৎ হ'য়ে গেলো। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাপাতে আমি স্তম্ভিত, আমার কণ্ঠ-পর্যন্ত-উঠে-আসা শোকাকুল কান্না। কিন্তু এ-কান্নার কোনো ভাষা নেই। ঢাকার মৃত্যু ঘটেছে, আমার মৃত্যু ঘটেছে, বুদ্ধদেব বসু গত আট-দশ বছরে যা-যা লিখেছেন, আমার উপলব্ধির বাইরে সে-সমস্ত রচনার হৃদয়তা। অথচ যুবক সমর সেনের বুলি আত্মসাৎ ক'রে নিজেকে নিয়ে রঙ্গ পর্যন্ত করতে পারছি না : স্তব্ধ রাত্রে তুমি কেন বাইরে যাও?

সুতরাং আপনার কাছে, অরুণকুমার সরকারের কাছে : মার্জনাভিক্ষা করছি : বুদ্ধদেবের উপর আমার পক্ষে কোনো-কিছু লেখা সম্ভব নয়। আমার স্মৃতিকে আমি কবর দিতে চাই। ইতি —

বিশুদ্ধ শিল্পী বুদ্ধদেব

অম্লান দত্ত

সাধু ও শিল্পীর ভিতর এক জায়গায় একটি গভীর অমিল আছে। সাধু চান চিত্তশুদ্ধি। অ্যারিস্টটল-এর অনুকরণে কেউ-কেউ বলবেন, শিল্পীও তাই চান। কিন্তু এতে শুধু শব্দের অভিন্নতায় অর্থের বিভেদ ঢাকা প'ড়ে যায়।

দিবা ও রাত্রি দু-টি অনির্বাণ জ্বলন্ত কাঠ। এতে জীবগণ নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। সাধু চান চিত্তকে এমনভাবে তৈরি করতে যাতে এই দাহ তাঁকে স্পর্শ করবে না। শিল্পী চান রাতদিন পুড়তে এবং সেই জ্বালাকে শিল্পে প্রকাশ করতে।

ধরা যাক প্রেম, যে-প্রেম পোড়ায়। গান্ধীজী চেয়েছিলেন প্রবৃত্তিকে এমনভাবে সংযত করতে যাতে অন্তরে-অন্তরে প্রতিদিন ক্রোধে ও হিংসায় দগ্ধ হ'তে না-হয়। আত্মজীবনীতে তিনি জানিয়েছেন যে, ব্রহ্মচর্যে সাফল্যের পর কস্তুরবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তি ও মাধুর্য স্থাপিত হয়। বুদ্ধদেব কবিতায় যে-প্রেম প্রকাশ করেছেন তা, অন্যপক্ষে, তিক্তমধুর। এর অধিক মাধুর্য বুদ্ধদেবের সাধ্যও নয়, কাম্যও নয়।

গান্ধীজীর শিল্পে প্রয়োজন ছিলো না। ভজন ও অনাবিল আকাশ, এই তো যথেষ্ট। রাত্রির তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষের শিল্পকে তাঁর নগণ্য মনে হয়েছে। বুদ্ধদেবের কাছে প্রকৃতি তিক্ত ও কদর্য, শিল্পে রূপান্তরিত হ'য়ে তবে সে মধুর ও সুন্দর। শিল্পের জন্যই বাঁচা সার্থক। তার জন্যই তিনি বাঁচতে চেয়েছেন।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানেন যে, বুদ্ধদেব ও আইয়ুবের ভিতর একটি অপ্রকাশিত তর্ক আছে। পত্রালাপে তর্ক। আমার পড়বার সুযোগ হয়নি; তবে দু-জনের মুখেই কিছু-কিছু শুনেছি। আইয়ুব প্রগতিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষ ধীরে-ধীরে জ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, অগণিত অন্যায়কে অতিক্রম ক'রে উত্থানপতনের ভিতর দিয়ে সমাজ বৃহত্তর ন্যায়ের অভিমুখেই চলেছে। বুদ্ধদেবের মন এমন ধরনের আশাবাদে সায় দেয় না। বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে, মানুষের আয়ু বাড়ছে, ক্রীতদাস প্রথা আধুনিক কালে ধিকৃত ও মানুষের অধিকার অন্তত মৌখিকভাবেও স্বীকৃতির পথে, এসব কথা তিনিও জানেন। কিন্তু মানুষের মনে শান্তি কি বেড়েছে? তর্কের ভাষায় এ-কথা বলবার আগ্রহ নেই বুদ্ধদেবের। কবিতাই তাঁর ভাষা।

শান্তি কি সম্ভব মানুষের জীবনে? এমন-কি কাম্য? কবি বুদ্ধদেব নির্বাণ চান না। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতাও তাঁকে টানে না। যুবতী স্ত্রী যেমন স্বামীর বৈরাগ্যসাধনাকে ভয় করে, বুদ্ধদেবও তেমনি সাধু-কবিকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ ক'রতে পারেন না। তিনি জানেন যে, সাধুত্বের

যেখানে পরিণতি কাব্য সেখানে বাহুল্য। জীবনকে যিনি অন্তরে পরম মধুময় ব'লে লাভ করেছেন, কবিতার মাধুরীতে তাঁর আর প্রয়োজন নেই।

এই সাধুসন্তের দেশে বুদ্ধদেব নির্বাণের চাইতেও সেই তৃষ্ণাকে বরণীয় ব'লে গ্রহণ করেছেন কাব্যে যার ফলশ্রুতি।

'যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রসঙ্গে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বহুলাংশে স্বতন্ত্র। যে-প্রেম ও প্রেমজ কামনা 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের প্রধান উপজীব্য তা 'যে-আঁধার আলোর অধিকে'ও কিঞ্চিদধিক উপস্থিত; এবং গ্রন্থের প্রধান বিষয়সূত্র, শিল্প-ভাবনা বা শিল্প-চেতনা বুদ্ধদেব বসুর পূর্ববর্তী কবিতার বইগুলিতেও একেবারে অনুপস্থিত নেই। তাহ'লে? এ-বিষয়ে নতুন ক'রে ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল যে, তাঁর পুরোবর্তী কবিতার আবেদন মূলত আবেগগ্রাহ্য। ভালো কবিতামাত্রই, অন্তত পক্ষে প্রাথমিক স্তরে, অনুভূতিগোচর ও আবেগগ্রাহ্য; 'যে-আঁধার আলোর অধিকে'র কবিতাও তা-ই। কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে, এই অলক্ষণীয় আবেগগ্রাহ্যতা ছাড়াও আলোচ্য বইটিতে এমন একটি আয়তন আস্তৃত হ'য়ে আছে যাকে বহুলাংশে বুদ্ধিগ্রাহ্য বা ধারণাগ্রাহ্য বলা চলে।

এমন একাধিক বিষয়বস্তু ও থীমের প্রসঙ্গ আমরা মনে করতে পারি যা একই সঙ্গে 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এবং প্রাগ্বর্তী কোনো কাব্যগ্রন্থে উপস্থিত। 'দময়ন্তী'র 'বিচিত্রিত মুহূর্ত' অংশের "ছন্দ" কবিতাটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> আমার বিশ্বের জন্ম তোমার লীলায়,
> তোমারই চকিত স্পর্শে কেঁপে ওঠে কল্পনার শ্রেণী,
> কবিতার জন্ম হয়।
> আমার হৃদয়
> পূর্ণ ক'রে তুমি আজ এলে
> বৃষ্টি-ঝরা রাত্রিতে পা ফেলে
> ঝঙ্কারে, নিক্কণে...।

প্রায় একই বিষয়ে 'যে-আঁধার আলোর অধিক' থেকে উদাহরণ :

> দেবতা, নির্জ্ঞান মন, নাকি এক চতুর শয়তান?
> তার মুখে অনন্ত রাত্রির মায়া। তাই সে করুণা ক'রে
> পাঠিয়েছে প্রতিভূ, প্রবক্তা, দূত — ছন্দ, মিল, ধ্বনির ইশারা,
> নিরঞ্জন গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান —
> যার পূত শাসনে সঞ্চিত জল, নর্দমায় স্বেচ্ছায় না-ঝ'রে
> হ'য়ে ওঠে অধীন, উদ্দেশ্যময়, উজ্জ্বল ফোয়ারা।

প্রথম কবিতাটিতে 'ছন্দ'কে তুলনা করা হয়েছে কোনো নটী বা নৃত্যপরা প্রণয়িণীর সঙ্গে, পায়ে যার নূপুর, বৃষ্টি-ঝরা রাত্রিতে যার ঝংকৃত অভিসার। শুধু তাই নয়, এই নারীরূপিণীর আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে : 'আমার হৃদয় পূর্ণ ক'রে তুমি আজ এলে'। 'দময়ন্তী'

(১৯৪০) প্রকাশের প্রায় আঠারো বছর পরে যখন 'ছন্দ'কে আবার সরাসরি কবিতার বিষয়বস্তু করা হ'লো, তখন সে আর নটিনী বা অভিসারিকা নয় — 'নিরঞ্জন গণিত', যাকে রচনা করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর বা চতুর কোনো শয়তান। অর্থাৎ, শেষের এই কবিতাটির আবেদন আমাদের আবেগের কাছে নয়, বা শুধুমাত্র আবেগের কাছে নয়; কবিতাংশটির বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ধারণাগ্রাহ্য সূত্রটিই এখানে অনেক বেশি জরুরি। একইভাবে, 'দময়ন্তী' এবং 'যে-আঁধার আলোর অধিক' থেকে আরো দু-একটি সমধর্মী উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়, যেমন, "কুকুর", আর "কোনো কুকুরের প্রতি", এবং "এখন বিকেল" আর "স্মৃতির প্রতি : ১" ইত্যাদি।

১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'রূপান্তর'-এ উৎসর্গ-পত্রের কবিতাটিতে (কবিতাটি পরে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে অন্তর্গত করা হয়) একটি জরুরি থীমের অবতারণা আছে। থীমটি হ'লো "রূপান্তর"— অর্থাৎ আমাদের কল্পনা এক বস্তুকে আরেক ব্যঞ্জনায় পাল্‌টে নেয় বা সৃজনী শক্তি শিল্পোপকরণকে উত্তীর্ণ করে শিল্পে, 'রূপান্তর'-এর প্রাথমিক অর্থ হ'লো এই। থীমটিকে জরুরি বলছি দু-টি কারণে : এক, বিষয়বস্তুটি সদর্থেই চিরকালীন; দুই, এই থীম নানাভাবে বুদ্ধদেব বসুর অনেক কবিতাতেই পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে :

ধাতুর সঙ্গে সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে

এবং এই বইটিরই আরেকটি কবিতা "সেতু"-র একটি পঙ্‌ক্তি —

পথ হ'লো নদী, রাত হ'লো লিলি।

কিন্তু, 'যে আলোর অধিক'-এ একই থীম ব্যবহৃত হচ্ছে সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য, গাণিতিক এক সমীকরণে —

ঘটায়, ঘোমটার তলে, মৌলিকের নিত্য রূপান্তর —
পদার্থের, চেতনায়; স্পন্দমান মাংসের, মানসে;

("সর্বেশ্বরী")

যে নারীবন্দনা ("মোহমুক্ত") বা নারীদেহেরে বন্দনা ("কিছুই প্রেমের মতো নয়") 'বন্দীর বন্দনা'তে (১৯৩০), বা 'কঙ্কাবতী'তে (১৯৩৭), 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ তারই রূপান্তরিত অভিব্যক্তি :

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘন্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।'

("রাত তিনটের সনেট : ১")

শিল্পের জন্যই যে শিল্প, এই কলাকৈবল্যবাদ 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর একাধিক কবিতার বিষয়বস্তু। বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক অন্যান্য রচনাকর্মও এই মতের সমানুপাতিক। দীর্ঘদিন আগে, 'দ্রৌপদীর শাড়ি'-র "স্বর্গ-মর্ত্য" কবিতাতেও বুদ্ধদেব লিখেছিলেন —

তাই মনে হয়, পৃথিবীতে
যা হচ্ছে হোক গে,

ঘুম না-এলে ল্যাম্পো জ্বেলে
বসি লেখার যজ্ঞে;
বাঁচতে হ'লে বাঁচি আমার
মন-বানানো স্বর্গে।

লক্ষণীয় যে, যথোচিত ব্যঙ্গের সঙ্গে বিষয়টির অবতারণা করেছেন লেখক, এবং কলাকৈবল্য সম্পর্কে লঘু কোনো মন্তব্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কোনো-কোনো কবিতায় এই একই থীম অনেক বেশি গম্ভীর এবং চাপল্যবিহীন। যেমন :

উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী

ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া।
তাই বলি, ভগবানেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে;

("রাত তিনটের সনেট : ১")

এ-পর্যন্ত আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, একই থীম ও বিষয় বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে অনেক বেশি আবেগগ্রাহ্য ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ (একেবারে শেষের উদাহরণটি ছাড়া) কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতায় — তা মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ধারণা-নির্ভর। এখন আরো একটি সূত্র এই বক্তব্যের সঙ্গে যোগ ক'রে নিই : 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অধিকাংশ কবিতাই একটি প্রধান থীমের অন্তর্গত; প্রায় প্রতিটি কবিতাই পরস্পরের পরিপূরক — একটি কবিতায় যে-আলো জ্ব'লে ওঠে তারই সংস্পর্শে উদ্ভাসিত হয় পাশের কবিতাটি। এই প্রধান থীম বা বিষয়-সূত্র হ'লো : প্রকৃতি ও শিল্পের সম্পর্ক।

বুদ্ধদেব বসুর পূর্বের কবিতায় এই থীম যে একেবারে উপস্থিত ছিলো না তা নয় — ১৯৪৮-এ 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তেই "মায়াবী টেবিল" কবিতাটি আছে, যার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই সোচ্চার শিল্পবন্দনা : 'তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে/সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও'। কিন্তু ঐ একই বই থেকে এমন অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায় যা এই শিল্পপ্রাণতার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। পক্ষান্তরে, এক ধরনের শিল্পমনস্কতা, এবং আরো স্পষ্টভাবে বলা চলে যে, শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্কজনিত থীমটি, 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর প্রায় অধিকাংশ কবিতার প্রাণরস। শুধু তাই নয়, তিনি যে অপেক্ষাকৃত নতুনভাবে তাঁর শিল্প ও জীবন বিষয়ক অভিজ্ঞতাকে অনুধাবন করছেন তা এই কবিতার বইটি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায়। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৫৮-র মে মাসে। আগের বছরের এপ্রিলে, 'কঙ্কাবতী'-র পরিবর্ধিত নাভানা সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, "যে-সব স্থলে পরিবর্তন করেছি — যেমন 'পৃথিবীর পথে'র কবিতাবলীতে, বা "কোনো বিদেশিনীর প্রতি" বা "বিবাহ" কবিতায় — সেখানেও আমার আজকের দিনের কোনো অভিজ্ঞতাকে প্রবেশ করতে দিইনি।" এই 'আজকের দিনের অভিজ্ঞতা'র অনুপ্রবেশ ঘটেছে 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অধিকাংশ কবিতায়।

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর মূল বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তৃততর ইঙ্গিত তাহ'লে এই : প্রকৃতি হ'লো অফুরন্ত, অসম্পূর্ণ সম্ভাবনাপুঞ্জ, আর শিল্প — অমোঘ, কৃত্রিম, অব্যর্থ রূপকার; যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে সর্বত্র প'ড়ে থাকে, তাকেই পরিমার্জিতও রূপান্তরিত করে শিল্প, এবং এই

দিক থেকে শিল্প শুধু প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র নয়, গুণগতভাবে উৎকৃষ্টও বটে। বোদলেয়ার, তাঁর কবিতায়, নগ্নিকার অঙ্গেও অন্তত একটি অলংকার পরিয়ে দিতেন, কেননা অলংকার কৃত্রিম ও নির্মিত : শিল্পের প্রতীক। টোমাস মান প্রায় অঙ্কের মতো ভাগ করেছিলেন প্রকৃতি ও শিল্পের সম্পর্ক : দক্ষিণ য়ুরোপ রৌদ্রোজ্জ্বল, শস্য-আকীর্ণ, জীবননিষ্ঠ — অর্থাৎ প্রকৃতি; উত্তর য়ুরোপ শীতশীর্ণ, কৃত্রিম, সংকুচিত — অর্থাৎ শিল্প। শুধু তাই নয়, যে-লোকটি অসুস্থ, যার দাঁত খারাপ, এমনকি সে-ও শিল্পের প্রতীক বা শিল্পী, আর যে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাস্থ্যবান — সে প্রকৃতির প্রতীক। অসুস্থতা মানে স্বাভাবিকতার বিচ্যুতি, এক হিশেবে প্রকৃতির বিরোধিতা, সুতরাং এই সূত্রে শিল্পের সঙ্গে তার সাযুজ্য। মধ্যযুগের য়ুরোপে অসুস্থ ভিখারি, বা কখনো-কখনো কুষ্ঠরোগীকে যে 'দ্রষ্টা' বা 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি' বলা হ'তো, তা-ও সম্ভবত একই কারণে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কবিতার দুই রীতি বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধে শিলারেরও প্রধান অভিনিবেশ হ'লো : নাঈভ লেখক হ'লেন তাঁরাই, যাঁরা প্রকৃতির সমধর্মী, আর সেন্টিমেন্টাল লেখক প্রকৃতিবিজয়ী, প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র — বিদগ্ধ। লেখা বাহুল্য নয় যে, 'সেন্টিমেন্টাল' বিশেষণটি এখানে এক বিশেষ অনুষঙ্গের দ্যোতক; অর্থাৎ, শব্দটির সাম্প্রতিক অর্থকে এখানে অগ্রাহ্য করতে হবে।

'দ্রৌপদীর শাড়ি'র প্রথম ও শেষ কবিতায় শিল্পের ''মায়াবী টেবিল''-এর উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ''কার্তিকের কবিতা''য় এই শিল্পতত্ত্বকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে :

> হায়রে, মানুষ করেছে ফন্দি
> প্রকৃতির হবে প্রতিদ্বন্দ্বী! —
> কেড়েছে শক্তি, শেখে নাই তার ছন্দ
>
> ...
>
> প্রকৃতির কোলে যে-নতুন আসে
> তারই ছোঁওয়া লেগে বিশ্ব বিকাশে,
> এমনকি, পীত শীতের আভাসে
>   খানিক ঝরায় সুধা

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর বহুলাংশেই ''কার্তিকের কবিতার'' প্রতিবাদ। এই গ্রন্থের ''আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২'' শুরু হচ্ছে এইভাবে —

> প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
> ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায় — ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ;
> ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস;
> ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।

ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ, ফুল সব কিছুই এখানে আক্ষরিক অর্থে প্রকৃতির অন্তর্গত। একমাত্র 'পুতুল' বিষয়টি প্রাকৃতিক নয় — পুতুলও নির্মিত সামগ্রী, এবং 'শিল্প'। এক্ষেত্রে, পুতুলকে অবশ্য অজরুরি খেলনা হিশেবে ভাবা হয়েছে — 'বিশ্বস্ত নির্বেদে' যার কোনো ভূমিকা নেই। আসল কারণ, আমার অনুমান, অন্ত্যমিল। 'ফুলের' পাশাপাশি 'পুতুল'।

এই যে 'নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে', নিমজ্জিত হ'তে আহ্বান জানাচ্ছেন লেখক, তার কারণ এই যে, প্রকৃতির প্রতারণা প্রধানত অ-ফলপ্রসূ, বাহির থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে পারলেই এই ফাঁকি ধরা পড়ে — এবং তখন, শুধুমাত্র তখন, প্রবঞ্চক প্রকৃতি থেকে ছিনিয়ে

নেয়া চলে এক কণা শিল্প :

গাদ, ক্বাথ, বুদ্বুদের পরপারে এক কণা অব্যয় কস্তুরী,
কঠিন ছিপিতে আঁটা, স্বচ্ছতায় সঞ্চিত আঁধার;
অথবা, প্রপাত যার অভিপ্রায় কোনোদিন চুরি
ক'রে নিতে পারবে না — সেই দূরনিবদ্ধ নীহার।

("অপেক্ষা")

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর শেষ কবিতা সর্বশেষ স্তবক এই বইটির প্রধান থীমের স্পষ্টতম ঘোষণা :

শূন্য শিশি ধ্বংস ক'রে যেদিন
গন্ধ হ'য়ে জ্বলবো আমি, স্বাধীন,
ঠাণ্ডা, রোগা, ঝকঝকে, আর মেকি!

এখানে 'ঝকঝকে' শব্দটিতে বোঝানো হ'লো শিল্পের চূড়ান্ত ঔজ্জ্বল্য। 'মেকি' শব্দটিও, এই সূত্রে, অনুধাবনযোগ্য। মেকি — অর্থাৎ কৃত্রিম, নির্মিত, অ-প্রাকৃতিক। বলা বাহুল্য, শব্দটি এখানে নঙর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

"প্রেমিকের গান : ১" এবং "দেবযানী স্মরণে কচ : ৩" এই দু-টি মাত্র সরাসরি প্রেমের কবিতা ছাড়া 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর প্রতিটি কবিতাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই থীমের অন্তর্গত। প্রতিটি কবিতাই যে শিল্পবিষয়ক তা নয়; কোনো-কোনো কবিতা স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত; একাধিক কবিতার নাম "প্রেমিকের গান"; কোনোটি-বা জনৈক তরুণ কবির উদ্দেশে রচিত; কোনো-কোনো কবিতা গ্যেটের প্রণয়বহুল জীবনের প্রতিধ্বনিতে অনুরণিত; দেবযানী ও কচ কোনো কবিতার নায়িকা ও নায়ক, এবং একাধিক কবিতার মূল চরিত্র স্বয়ং তৃতীয় পাণ্ডব; সর্বোপরি, কোনো-কোনো কবিতা, আক্ষরিক অর্থেই, ঈশ্বর বিষয়ক। এতৎসত্ত্বেও, সমস্ত কবিতা থেকেই একটি সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করা চলে, যাকে আমরা বলতে পারি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত উপকরণপুঞ্জকে যা এক বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিণত করে। যখন 'ছন্দ ও মিল'-কে অবলম্বন ক'রে লেখক বলেন, 'যার পূত শাসনে সঞ্চিত জল, নর্দমায় স্বেচ্ছায় না-ঝ'রে/হ'য়ে ওঠে অধীন, উদ্দেশ্যময়, উজ্জ্বল ফোয়ারা', এবং 'অনুরাধা'র প্রসঙ্গে লেখেন, 'আবর্তমান কমলালেবুর/পরিশ্রমে/অম্ল-মধুর ইন্দ্রিয়লোক/সকল দিকে উঠছে জ'মে' বা অন্য-একটি কবিতায় প্রেমিকার উদ্দেশে লেখেন, 'শুনি অতল জলরাশির দোলা/যেখানে জড় — অন্ধ, অনিচ্ছুক —/বাধ্য তোমার সৃষ্টি করার কাজে —/তাতেই ভরে বুক, আমার বুক', এবং স্মৃতিকে সম্বোধন ক'রে "স্মৃতির প্রতি" কবিতায় রচনা করেন, 'অবিরাম চলে অধঃপাত।/বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত/ চিরকাল মূর্ছার কন্দরে/রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন —/রূপান্তর থেকে রূপান্তরে —/পৃথিবীর প্রথম যৌবন।' তখন বিষয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমরা এই একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অভিব্যক্তি অনুধাবন করি।

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের তাৎপর্য কী? বহিঃপ্রকৃতির কথাই প্রথমে ধরা যাক। গাছ, ফুল, মেঘলা দিন, গা-বেয়ে-ওঠা আঙুরলতা, আকাশ-রাঙানো হলুদ-ফুলে-ঢাকা দিগন্তের খেত, এদের কি সত্যিই আমাদের 'গণিতের কঠিন সংকেত' ব'লে মনে হয়?

'পউষে-ফাল্গুনে-গাঁথা কান্না-হাসি-দোলানো' জীবন কি আমাদের কাছে "অন্যায়ের" সমতুল্য? 'দিন', 'রাত্রি', 'আলো', 'ছায়া' — তারা কি 'নির্বোধ উচ্ছ্বাসে' 'দিগন্ত ডুবিয়ে দেয়'? এই ধরনের প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর নেই তা বলা বাহুল্য, কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে বহিঃপ্রকৃতিকে আমরা সর্বদাই অসম্পূর্ণ খণ্ডতা, বা সংযোগবিহীন গাণিতিক সংকেত হিশেবে অনুভব করি না। অথচ, কোনো লেখক যদি বুঝিয়ে দেন যে অসম্পূর্ণ প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে শিল্পের উপকরণ, এবং শিল্পই সদর্থে রূপান্তরিত করে প্রকৃতিকে, তাহ'লে এই সংবাদের তত্ত্বগত দিকটিতে আমরা সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দিতে পারি। এজন্যেই এই নিবন্ধের প্রথমাংশে দাবি করেছিলুম যে, অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর আবেদন অনেক বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ধারণানির্ভর। বুদ্ধদেব বসু দর্শন-বিরোধী, এই তথ্য স্বয়ং লেখকই একাধিকবার ঘোষণা করেছেন, এবং এই খবর বহুলাংশেই নির্ভুল। কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর রচয়িতা সম্পর্কে এই উক্তি পুরোপুরি খাটে না। অথচ তত্ত্ব ও দার্শনিকতার গুরুভারকে তিনি অন্যভাবে পুষিয়ে নিয়েছেন তাঁর কবিতায়, যার অধিকাংশ চিত্রকল্প ও উপমা একাধারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনুভূতিগোচর, এবং আবেগ-উদ্দীপক।

প্রকৃতি-শিল্পদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে বোদলেয়ার ও টোমাস মান-এর যে নাম উল্লেখ করেছিলুম কিছু আগে, তা শুধু নামোল্লেখের বিশুদ্ধ আনন্দে নয়। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর পটভূমিকায় এই দুই নামের বিশেষ তাৎপর্য আছে। আরো একজন লেখকের নাম এই সূত্রে অবশ্যস্মরণীয় : রাইনার মারিয়া রিল্‌কে। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অনেক কবিতা ও বোদলেয়ারের কবিতার বুদ্ধদেবকৃত অনুবাদ একই সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছিলো 'কবিতা' পত্রিকায়। রিল্‌কের 'অর্ফেউসের প্রতি সনেটগুচ্ছ'-এর সঙ্গেও 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর আত্মিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে কখনো-কখনো — 'রূপান্তর'-থীমটির সূত্রে বিশেষত। প্রায় ঐ সময়েই, অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের তৎকালীন কর্ণধার বুদ্ধদেব বসু তাঁর এম.এ. ক্লাসের ছাত্রদের পাঠ দিতেন টোমাস মান-এর গল্পগুচ্ছ, প্রধানত 'ভেনিসে মৃত্যু', 'ট্রিস্টান', এবং 'টোনিয়ো ক্রোগার' গল্প তিনটি। কোনো হঠকারী পাঠক যদি মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ ক'রে বসেন, 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতা রিল্‌কে বা বোদলেয়ারের কবিতার প্রতিধ্বনি বা মান-এর শিল্প-দর্শনের অনুসরণ, তাহ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল বুঝবেন। আমি শুধু মানসতার অভিন্নতা বোঝাতে গিয়ে এই চার লেখকের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছি। শিল্প ও জীবন সম্পর্কে বোদলেয়ার, রিল্‌কে এবং মান একই সত্যকে বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোকিত করেছিলেন; বাংলা কবিতায় সেই দায়িত্ব পালন করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

শুধু তাই নয়। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলা কবিতায় একটি আবহাওয়াগত পরিবর্তন ঘটেছিলো। যাঁদের আজকাল 'পঞ্চাশের কবি' বলা হয়, তাঁদের অনেকেই এই গ্রন্থের দ্বারা জন্মান্তরিত হয়েছিলেন। অনেকদিন পরে, 'যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রসঙ্গে এই তথ্যটি স্মরণ করতে আমার ভালো লাগলো।

‘কবিতা’র সাত বছর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমার কৈশোরকালে সবচেয়ে বড়ো নেশা ছিলো দু-শো দুই রাসবিহারী এ্যাভিনিউ। প্রতি সন্ধেয় সেখানে হাজির হ'তে না-পারলে মন খারাপ হ'য়ে যেতো।

সেই বাড়ির সামনে ছিলো একটি আশ্চর্য একেশিয়া গাছ। ফুটপাথের গাছ — ফুটপাথের মানুষের মতোই অনাদরে অবহেলায় বড়ো হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু তার বাঁকা-বাঁকা ডাল, তার রেশমী পাতলা পাতা, তার অদৃশ্যপ্রায় রেণুর বিশেষ এক ধরনের মৃদু অচেনা গন্ধ মন কেড়ে নিতো।

সেখানে যে-আড্ডা বসতো সেটা সাহিত্যসভা নয়। তখন নিয়মিত যে-সাহিত্যসভা বসতো সেটা ‘পরিচয়’-এর। সেখানে নিয়মিত বহু জ্ঞানী-গুণী আসতেন। প্রচুর ইন্‌টেলেকচুয়াল আলোচনা এবং বহুবিধ মুখরোচক বস্তুর ব্যবস্থা থাকতো সেখানে। ‘পরিচয়’-এর সভা ছিলো পোশাকী, কিন্তু দু-শো দুই-এর দৈনন্দিন আড্ডা ছিলো ঘরোয়া। সভাসমিতিতে একটা জাঁকজমক থাকে। কিন্তু বাঙালিদের কাছে যে-আড্ডার টান নাড়ির টান, তার মধ্যে জাঁকজমক নেই। এমন একটা জিনিশ থাকে যে-টা সেই একেশিয়া গাছের বাঁকা ডাল, রেশমী পাতা আর অদৃশ্যপ্রায় রেণুর মতো মন কেড়ে নেয়।

সেই ঘরোয়া আড্ডায় বুদ্ধদেব বসু একদিন জানালেন তিনি একটি পত্রিকা বার করবেন — নাম ‘কবিতা’। তাতে থাকবে শুধু নতুন-নতুন কবিতা এবং নিছক কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা। কবিতা-পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর সেই যুগান্তকারী ঘোষণা আমাদের যেমন অবাক ক'রে দিয়েছিলো তেমনি করেছিলো উৎসাহিত।

রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন যে, শরৎকালে রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বেরুতেন। সেই শরৎকালেই ত্রৈমাসিক ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরুলো ১৩৪২ সালের আশ্বিনে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এ-রকম একটা দিগ্‌বিজয়ের অভিযান আগে কখনো বেরোয়নি। তখন ‘কবিতা’র সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক সমর সেন।

‘কবিতা’র প্রথম বছরের চারটি সংখ্যা বাংলার আধুনিক কাব্য-ইতিহাসে এমন একটি স্বাক্ষর রেখে গেছে যা কোনো দিন মুছবে না। আধুনিক কবিতা যে নিছক একটা মানসিক বিলাস বা খামখেয়ালী বস্তু নয় — সে-কথা ঐ চারটি সংখ্যা থেকেই বাঙালি পাঠকবর্গ অনুভব করেন। সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেন এমন-সব কবিকে যাঁরা ভবিষ্যতে কবিতার নানা দিক বিজয় করেছেন। যেমন জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। এঁদের অনেকের কবিতাই আগে নানা পত্রিকায়

বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কবির সম্মান তাঁরা পাননি। তাঁদের কবিতা নিয়ে ভালো ক'রে আলোচনাও হয়নি। 'কবিতা' পত্রিকাই তাঁদের প্রথম কবি-সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করে। 'কবিতা'র প্রথম বছরের সংখ্যাগুলিতেই যে-বিখ্যাত কবিতাগুলি ছাপা হয় তার মধ্যে আছে : অজিত দত্তের "ন খলু ন খলু বাণঃ" (সংহত করো, সংহত করো অয়ি,/যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর); জীবনানন্দ দাশের "বনলতা সেন" (হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে); সমর সেনের "স্মৃতি" (আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে); প্রেমেন্দ্র মিত্রের "নীল দিন" (কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,/কত ঝড়, অন্ধকার মেঘ/আকাশ কি সব মনে রাখে!); বিষ্ণু দে-র "বিবমিষা" (তোমাকে রাখিয়া দূরে তবে মোর চিত্ত প্রাণ রাখে); বুদ্ধদেব বসুর "চিল্কায় সকাল" (কী, ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়/কেমন করে' বলি); সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র "জন্মান্তর" (আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে); এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছুটি" (আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি)।

'কবিতা'র প্রথম বছরের পৌষ সংখ্যাতেই ছাপা হয় বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত সম্পাদকীয় "আধুনিকতার মোহ", যাতে তিনি লিখেছিলেন : 'যত দিন যাচ্ছে, ততই স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করছি যে কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু সেকেলে। কেননা এখনো আমি কাব্যবিচার করি আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে, এবং ঈশ্বর যদি সহায় হন, বাকি জীবন তা-ই করবো। ... কোনো কবিতা পড়তে-পড়তে আমাদের নিশ্বাস ভারি হয় ... কোনো কবিতা একবার পড়বার পর আমাদের সমস্ত দিন-রাত্রিকে হানা দেয়, তারপর কোনো অলস মুহূর্তের বিদ্যুৎ-ঝলকে তার গূঢ় রহস্য উপলব্ধি ক'রে সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

এবং সেই সংখ্যাতেই ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের চিঠি : 'গদ্যে পদ্যছন্দের কারুশিল্প-কৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারে না। ... তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ।'

দ্বিতীয় বছরে (১৩৪৩-৪) 'কবিতা'য় জীবনানন্দের তেরোটি কবিতা ছাপা হয়, সমর সেনের পাঁচটি, রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতা এবং "গদ্যকাব্য" নামে প্রবন্ধ এবং সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা'র উপর বুদ্ধদেববাবুর বিখ্যাত সমালোচনা "নবযৌবনের কবিতা"। এখানে যদি এই মন্তব্য করি যে বুদ্ধদেব বসু যদি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ না-করতেন এবং সমর সেনের কবিতা নিয়ে উক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ না-লিখতেন তাহ'লে তখনকার দিনের সমর সেন হয়তো অমন উৎসাহে অত কবিতা লিখতেন না এবং তাঁর কবিতার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি পড়তো না — তাহ'লে বন্ধুবর সমর সেন হয়তো আমার উপর বিরূপ হবেন না। সেই বছরেরই চৈত্র সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু আর একটি আশ্চর্য প্রবন্ধ লেখেন জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র উপর। প্রবন্ধটির নাম "প্রকৃতির কবি"। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে আজকের দিনে প্রশংসার জয়ধ্বনি উঠেছে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু-ই প্রথম তাঁর কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে বিবেচনা করি।'

'কবিতা'র তৃতীয় বছরে সম্পাদক হিশেবে নাম ছাপা হয় শুধু বুদ্ধদেব বসু এবং সমর সেনের। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদনা ছেড়ে দেন এবং একটিও কবিতা লেখেননি। এই বছরেই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দু-টি কবিতা সেখানে ছাপা হয়। ইতিপূর্বে সুভাষের কোনো কবিতাই আমি পড়িনি। বুদ্ধদেব বসুর মহৎ একটি গুণ — সব লেখাই যত্ন ক'রে পড়তেন এবং যার মধ্যেই কবিত্বশক্তির ইঙ্গিত পেতেন তাকেই তিনি সাদরে কবিতার আসরে স্থান দিতেন। এই বছরের আশ্বিন সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্রন্দসী'র উপর তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখেন : 'সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক সহানুভূতির অভাব: তাঁর ও আমার মেজাজে মিল নেই। তবু এ-কথা বলতেই হবে যে যখনই তাঁর কবিতা পড়ি তখনই মনে-মনে প্রশংসা না-ক'রে পারিনে।' ভবিষ্যতে বুদ্ধদেব বসু অবশ্য তাঁর কবিতার অত্যন্ত অনুরাগী হ'য়ে উঠেছিলেন। কেন এবং কী ক'রে, সে-টা আমার কাছে মস্ত বড়ো প্রশ্ন। সে-প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বুদ্ধদেব বসু-ই দিতে পারেন।

'কবিতা'র চতুর্থ বছরে (আশ্বিন ১৩৪৫ - আষাঢ় ১৩৪৬) অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া'-র উপর বুদ্ধদেব বসু একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ইতিপূর্বে অমিয়বাবুর কবিতা নিয়ে কোথাও দীর্ঘ কোনো আলোচনা হয়েছিলো ব'লে আমার জানা নেই। বুদ্ধদেব বসু লেখেন : 'বিস্ময়কর বই ... পংক্তিতে পংক্তিতে মন চমকে ওঠে। ... কিছুরই সঙ্গে এ-কাব্য মেলে না ... এ একেবারেই আধুনিক, একেবারেই অভিনব। ... আঙ্গিকের দিক দিয়েও তাঁর কাব্য অতি দুঃসাহসিক। কিন্তু এটাও বলতে হবে যে, অতি দুঃসাহসিক হবার অধিকারও তাঁর আছে।'

চতুর্থ বছরের আষাঢ় সংখ্যায় অজিত দত্তের 'পাতালকন্যার' উপর একটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনা বুদ্ধদেব বসু লেখেন : 'আজকের দিনেও যদি ভালো রোমান্টিক কবিতা লেখা হ'য়ে থাকে, তাতেই প্রমাণ করে যে রোমান্টিক যুগ এখনো শেষ হয়নি। ... কবিতাগুলি ভালো, আশ্চর্য রকম ভালো। ... ব্যক্তিগত হতাশা বা আলস্যকে তিনি (অজিত দত্ত) তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্যসৃষ্টির অন্তরায় হ'তে দেবেন না, এ শুধু আমাদের আশা নয়, দাবি।' বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার এ-টাই বিশেষত্ব — সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখকদের ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়া, যে-টা সম্পাদকের প্রধান কর্তব্য এবং সমালোচকেরও।

'কবিতা'র পঞ্চম বর্ষ (আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এ-বছর থেকেই রবীন্দ্র-রচনাবলীর উপর বুদ্ধদেব বসুর অনবদ্য সমালোচনা প্রকাশিত হ'তে শুরু করে। 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা হ'লেও একটি বিশেষ কার্তিক-সংখ্যা এ-বছর প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ সংখ্যায় বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একই নামের দুইটি কবিতা বেরোয় : "এ-যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে"। কবিতার আড্ডাতেই এক দিন লাইন নিয়ে দু-জন কবিকেই এক-একটি ক'রে কবিতা লেখার অনুরোধ করা হয়, দু-জন কবিই সেই অনুরোধ রক্ষা করেন, ফলে দু-টি সুন্দর বাংলা কবিতার জন্ম।

'কবিতা'র ষষ্ঠ বছর (আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮) থেকে সম্পাদক হিশেবে নাম ছাপা হয় শুধু বুদ্ধদেব বসুর। সেই বছরেই কবিতাভবন থেকে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামের এক সংকলন। এই সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশের মূলে কিন্তু ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কবিতা'র বিশেষ কার্তিক-সংখ্যায় এই গ্রন্থের এক দীর্ঘ সমালোচনা করেন। সেই বছরেই প্রকাশিত হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই 'পদাতিক'। 'কবিতা'র পৌষ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু প্রায় ১৭ পাতা ধ'রে বইটির একটি সমালোচনা লেখেন।

এ-কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে বুদ্ধদেব বসুর এই প্রবন্ধটি কবি হিশেবে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে খুব বড়ো রকমের সাহায্য করেছিলো। এ-কথাও তিনি মানবেন যে তাঁকে কবিতা লিখতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, যেমন তিনি উৎসাহিত করেছিলেন সমর সেনকে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে লেখেন : 'এ-কবির ভবিষ্যৎ আমাদের সকলের আশার স্থল। 'পদাতিক'-এর দুটি দিকই আমি দেখিয়েছি : প্রথমে সরল, চড়া গলার কবিতা, 'গণ'-কবিতা হবার যা দাবী রাখে, অন্যদিকে জটিল আঙ্গিকের সংস্কৃতিবান কবিতা। দু'দিক বজায় রাখা চলবে না, একদিক ছাড়তে হবে। কবি কোন দিক ছাড়বেন?'

সপ্তম বর্ষের 'কবিতা'র (আশ্বিন ১৩৪৮ -আষাঢ় ১৩৪৯) আশ্বিন-সংখ্যার প্রথম পাতাতে একটি ক্রোড়পত্র ছাপা হয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন্ম : ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮, মৃত্যু ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮। রবীন্দ্রনাথের তিরোধান সম্বন্ধে রচনাটি এই ব'লে বুদ্ধদেব বসু শেষ করেছেন : '...তাঁকে হারিয়ে আজ যতই শোকাকুল হই এ-কথা কিছুতেই মুখে আনতে পারবো না যে তিনি নেই। আমাদের প্রাণে যেখানে তিনি জ্বলছেন, সেখানে তিনি স্মৃতি নন, ইতিহাস নন, সেখানে তিনি জীবন্ত, তিনি মনোগোচর, এমনকি ইন্দ্রিয়গম্য। তা যদি না হবে তাহ'লে আমরা বেঁচে থেকে সকল কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছি কেমন ক'রে?'

কেবলমাত্র কবিতা এবং কাব্য-আলোচনা দিয়ে কোনো পত্রিকা প্রকাশ করার দুঃসাহস বুদ্ধদেব বসুর আগে কেউ করেননি। 'কবিতা' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তার আগে পর্যন্ত অধিকাংশ পত্রিকাতেই কবিতার প্রয়োজন হ'তো শুধুমাত্র পাদ-পূরণের জন্য। কবিতা লিখে সম্মান-দক্ষিণা পাবার কথা কবিরাও কল্পনানেত্রে তখন দেখতে পাননি। বুদ্ধদেব বসু কবিতার সেই অপমান ঘুচিয়েছেন। বাইরের দিক দিয়ে শান্ত কিন্তু অন্তরে চির-অশান্ত এই মানুষটি তাঁর প্রতিভা, উদ্যম, উৎসাহ ও কর্মকুশলতায় বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এমন একটি স্বাক্ষর রেখেছেন যা ইতিহাস হ'য়ে থাকবে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে বলতে গেলে এমন কেউই নেই যাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাগুলি 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়নি এবং যাঁদের কবিতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসু প্রথম দীর্ঘ আলোচনা করেননি।

চলতি সাময়িকপত্রে নিজেদের কবিতা ছাপতে দিতে আজকালকার অনেক কবিই অনিচ্ছুক — এবং এ-অনিচ্ছা অন্যায়ও নয়। কেননা অগ্নিবাস মাসিকপত্রের পাঁচমিশেলি ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারের ভালো কবিতারও কেমন একটা বাজে ও তুচ্ছ চেহারা যেন হ'য়ে যায়। কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িক পত্র বর্তমানে দেশে বেশি নেই। অথচ আধুনিক কবিদের অনেকেই নতুন কবিতা লিখছেন — বাইরের পাঠক-মণ্ডলী দূরে থাক, সব সময় নিজেদের মধ্যেও সেগুলো দেখাশোনার সুবিধে হয় না।

এই কারণে আমরা একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা পত্র বার করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার নাম হবে কবিতা এবং তাতে থাকবে শুধু — কবিতা। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিরা সকলেই এতে তাঁদের রচনা প্রকাশ করবেন। নবীন কবির ভালো কবিতাও যতটা পাওয়া যায় প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যা বেরুবে আগামী ১লা আশ্বিন। প্রতি সংখ্যা ছ-আনা ক'রে দোকানে ও স্টলে বিক্রি হবে, বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। এই পত্রিকাসংক্রান্ত সর্ববিধ চিঠিপত্র আমাদের ম্যানেজার শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্তের নামে ১৬২-১ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা এই ঠিকানা প্রেরিতব্য। এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার ও ডি. এম. লাইব্রেরি ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট এই দুই ঠিকানা থেকে শহরের ও মফস্বলের পাঠকরা প্রতি সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারবেন। ইতি

('বিচিত্রা', কার্তিক ১৩৪২ থেকে সংকলিত।) বুদ্ধদেব বসু

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'নবীন কবি'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯৩১]

কিছুকাল পূর্বে একবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়েছিলুম তখন বুদ্ধদেব বসুর একখানি কবিতা আমার হাতে পড়ে। সেই সময়ে তাঁর কিশোর বয়স। মনে আছে লেখাটি প'ড়ে আমার কোনো-একজন সঙ্গীকে বলেছিলুম, এই কবিতায় ছন্দ ভাষা এবং ভাব গ্রন্থনের যে-পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েচে কেবল কবিত্ব-শক্তিমাত্র নয় এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েচে, একদিন প্রকাশ পাবে। ... বোধ করি মহাযুদ্ধের অপঘাতে বা অন্য গভীরতর ভূমিকম্পে য়ুরোপের ভিৎ ন'ড়ে গেছে। সেখানে সাহিত্য শিল্পে সমাজে বাণিজ্যে আজ সর্বত্রই যে-একটা কষ্টকল্পনা দেখা যাচ্চে সে-টাকে যদি আমরা উৎকর্ষের লক্ষণ মনে করি তবে প্রদীপের শিখার অন্তিম চাঞ্চল্যকেও তেলের প্রচুর্যের লক্ষণ ব'লে মনে করা যেতে পারে। অনেক সভ্যতা য়ুরোপীয় শরৎকালের বনপল্লবের মতো মরবার আগে অতি প্রগল্‌ভ রং ফলিয়ে গেছে। সে-টাকে বসন্তের উপরে টেক্কা দেওয়া ব'লে কেউ যেন ধ'রে না নেন। মাঝে-মাঝে ভয় হয়েচে আমরা য়ুরোপের বর্তমান কালকে চিরকাল ব'লে মেনে নেবার ভুল করচি।

যাই হোক বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলবার অধিকার আমার নেই। ... দৈবক্রমে বুদ্ধদেব বসুর লেখার প্রথম যে-পরিচয় পেয়েছিলুম তার থেকে আমার মনের মধ্যে এ-বিশ্বাস ছিল যে, বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহ তিনি সম্মান লাভ করবেন। আগামীকালের সাহিত্যদৌবারিক যাঁরা, যথাযোগ্য আসনে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার তাঁদেরই পরে। টিকিট তাঁরাই দেখে নেবেন, আমরা বাইরে থেকে নমস্কার ক'রে বিদায় নেব।

সম্প্রতি দিলীপকুমার কয়েকটি কাঁচি-ছাঁটা পাতায় তাঁর আপন মন্তব্যের দ্বারা পরিকীর্ণ ক'রে বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা আমাকে পড়তে পাঠিয়েচেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সবটা দেননি। যে-কয়টি ও যতটুকু কবিতা পাওয়া গেল প'ড়ে খুসি হলুম। খুসি হলুম বললে মনে হবে মুরুব্বিয়ানা করচি। কেননা যখন-তখন ব্যবহারের ঘর্ষণে ঐ কথাটার ধার খ'য়ে গেছে। তবু বলতে হবে খুসি হওয়ার চেয়ে বড়ো দাম কবিতার পক্ষে আর কিছু নেই। এই রচনাগুলি জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টি ছাড়া নূতনত্বের গলদঘর্ম প্রয়াস দেখা যায়। সে-দুর্লক্ষণ না দেখে আরাম পেয়েচি। কবিতাগুলিকে সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্যশালী।

যে-কয়টি কবিতা আমার সামনে এসে পড়েচে তার বাইরে নিশ্চয় আরো অনেক লেখা আছে। হয়তো কেবলমাত্র এই লেখাগুলি নিয়ে সমগ্রভাবে কবির বিচার করা সঙ্গত হবে না।

তাঁর হাতে যে-যন্ত্রটি আছে তার কতকগুলি তন্তু, তার কোন-কোন পর্দায় কত রকমের সুরের মীড় লেগেছে, তা বলতে পারলুম না। যে-লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হোলো এ যেন একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া, ফল ফুল, ধ্বনি ও বর্ণ। এর সরস উর্বরতার বিশেষ একটি সীমার মধ্যে এক জাতীয় বেদনার উপনিবেশ। দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু নিভৃত। হয়তো ক্রমে দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ, হয়তো প্রকাশ পাবে উদার বিচিত্র মহাদ্বীপে 'তমালতালীবনরাজিনীলা' তটরেখা। কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে ফরমাস চলে না। যা পাওয়া গেল সে যদি গজমুক্তার কৌটো হয় তবে আবদার করলে চলবে না কণ্ঠী কোথায়।

'বিচিত্রা', কার্তিক ১৩৩৮

'বন্দীর বন্দনা'

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

[১৯৪১]

বয়স যখন অল্প, যৌবনের প্রারম্ভ. তখন কল্পনার প্রসার হয় বিস্তৃত কিন্তু তার আকার থাকে অস্পষ্ট। নিতান্ত যারা জন্ম-পাটোয়ারী তারা বাদে সাধারণ লোকের মনেও এ-বয়সে দেখা দেয় কল্পনার কুজ্‌ঝটিকা। কাব্য সৃষ্টির দায় নিয়ে যাদের জন্ম তাদের মনও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বভাবতই তাদের মনের কল্পনা আরও সুদূর প্রসারী, ছায়াপথের মতো অনুভূতির আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং ছায়াপথের মতোই মৃদু আলোয় আলোকিত শুভ্র মেঘাকার, যার মাঝে-মাঝে দেখা যায় সংহত জ্যোতিষ্কের সমুজ্জ্বল জ্যোতি। দু-চার জন ছাড়া, যেমন কীটস্‌, প্রায় কবির প্রথম বয়সের কাব্য মনের এই ছায়াপথের প্রতিচ্ছায়া। বেশীর ভাগ কল্পনা নীহারিকার মতো ছড়ানো, আকারে গ'ড়ে ওঠেনি; কিন্তু সাধারণ মনের কুয়াশা নয়, কবি-মানসের দীপ্তি তা থেকে বিচ্ছুরিত। অল্প কিছু কল্পনা নক্ষত্রের উজ্জ্বল-কঠিন রূপ নিয়েছে, ভাবী জ্যোতিষ্কমালার পূর্বাভাস। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। বাইরের জগৎ ও সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে চেতন ও অচেতন মনে যে-অনুভূতি সঞ্চিত হয় মনের রসায়নে তা থেকে জন্মে বিচিত্র সব ছায়ামূর্তি, — ছবি, সুর, ভাব, চিন্তার। মনে কল্পনার এই প্রবাহ কাব্যের মৌলিক উপাদান। এই কল্পনার জগৎ প্রতি মানুষে ভিন্ন; কারণ এর মূলে আছে কেবল অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা নয়, সমগ্র মনের গড়নের ভিন্নতা, যা জন্মগত। কবির মনের স্পর্শানুভূতি সাধারণ মনের চেয়ে বহুতরমুখী ও অনেক বেশী তীক্ষ্ণ; সে-মনের রসায়ন অদ্ভুত বিচিত্রকর্মা। কিন্তু এ-কল্পনা-প্রবাহের প্রকাশ কাব্য নয়। মনে এ-কল্পনার প্রবেশ ও গতি খামখেয়ালী, অসংলগ্ন, নিতান্ত সাময়িক ও ব্যক্তিগত কারণে পরিবর্তনশীল। কবিকর্ম হচ্ছে এই নানাত্ব থেকে যোগ্য উপাদান মূর্তির একত্বে গ'ড়ে তোলা। সে-মূর্তির রূপ ও উপাদানের যোগ্যতাবোধ দুই-ই যোগায় কবির সৃষ্টি-প্রতিভা। কিন্তু কবিকর্মের কৌশল আয়ত্ত করতে অনেক কবিরই সময় লাগে। প্রতিভারও আছে পরিণতি। সেইজন্য কবির প্রথম বয়সের কাব্যে অনেক কল্পনা দেখা দেয় যা অনেকটা সোজাসুজি এসেছে কবির কল্পনাজগৎ থেকে কবির কাব্যে, কবি-কর্মের গড়ন সম্পূর্ণ যারা পায়নি।

বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা'র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে। এর কবিতাগুলি পরবর্তী বই 'কঙ্কাবতী' ও বুদ্ধদেবের আধুনিক কবিতাগুলির সঙ্গে একসঙ্গে পড়লে তাঁর কবিকর্মের এই পরিণতি সহজেই চোখে পড়ে। 'বন্দীর বন্দনা' নামের কবিতাটির সুর বই-এর আরও কয়টি কবিতার মূল সুর, — যেমন "শাপভ্রষ্ট", "মানুষ", "মোহমুক্ত"।

রক্তমাংসের বাসনা-কামনার অনিবার্য আকর্ষণ, আর তাতে ধরা দিয়েও মানুষের বিশেষ কবি-মনের, চরম অতৃপ্তি। কল্পনার বিষয় বস্তু বড়ো। মানুষের এই দ্বৈতরহস্য ধর্মের নানা অনুষ্ঠানে, তত্ত্বচিন্তার বহুস্তরে, আত্মপ্রকাশ করেছে। ...‘‘বন্দীর বন্দনা’’ কবিতায় এই দ্বৈতকে কাব্যের মূর্তি দেওয়া হয়েছে — বন্দনার ছলে বিধাতাকে বিদ্রূপের কল্পনায়, যে তাঁর সৃষ্টি মানুষ, প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী মানুষ, নিজেকে গড়েছে অমৃতের পুত্র, ‘শাপভ্রষ্ট দেবশিশু’ ক’রে।...

কাব্য-কল্পনার বিপক্ষে দার্শনিক সন্দেহ অবান্তর। সুতরাং এ-প্রশ্ন তোলা চলে না যে যে-বিধাতার ইচ্ছাশক্তি বিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টি করেছে, দেহের ভো া-কামনা কেন তাঁর সৃষ্টি, আর মনের মুক্তির বাসনা তাঁর সৃষ্টি নয় কেন! কিন্তু এই যুক্তির সন্দেহ অন্য সন্দেহ মনে আনে কাব্য-পরীক্ষায় যা প্রাসঙ্গিক। ‘‘বন্দীর বন্দনা’’ ... সমস্ত কবিতাটি কাব্যানুভূতির চোখে লাগে যেন নীহারিকাপুঞ্জ। তার কারণ কি এই নয় যে যে-বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশে এই কাব্যের গড়ন কবি তাকে নিয়েছেন গতানুগতিক বিশ্বাস থেকে। সে-বিশ্বাসের উপর কবি-কল্পনার সে-প্রতীতি নেই কাব্যের মায়াসৃষ্টির জন্য যা অপরিহার্য। রামপ্রসাদ যখন গেয়েছেন

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত ;

*

আমি দিন মজুরী নিত্য করি
পঞ্চ-ভূতে খায় মা বেটে।

তখন, সাধন-ভজনের কথা বলছিনে, কিন্তু কাব্য-পাঠকের কল্পনায় সে ‘মা’ জীবন্ত হ’য়ে ওঠেন। ‘‘বন্দীর বন্দনা’’র বিধাতা কবির একটা বিশেষ ভঙ্গী প্রকাশের উপলক্ষ মাত্র। পুতুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মনে বিদ্রোহ-রস জাগানো সম্ভব নয়।

‘‘বন্দীর বন্দনা’’ কবিতার এ-দিকটা আলোচনা করছি এইজন্য যে এর মধ্যে বুদ্ধদেবের কবিতার পরিণতির একটা দিকের তথ্য রয়েছে। তাঁর প্রথম বয়সের কাব্যের অনেক জায়গায় কল্পনার অবলম্বন গতানুগতিক বিশ্বাস ও মত, যার সঙ্গে কবির মনের নিগূঢ় যোগ নেই। সে-বিশ্বাস অতি প্রাচীন হোক বা অত্যাধুনিক হোক, বুদ্ধদেবের কাব্য সেখানে দুর্বল। মনকে আবিষ্ট করে না।

তাই আজ মুক্ত কণ্ঠে আমন্ত্রণ করি তোমা, হে সুন্দরী নারী,
সকল বিক্ষোভ আজ অতিরিক্ত সুরা-সম ফেলেছি উদ্গারি।
নাহিকো সংশয় আর; এতদিনে আমি বুঝিলাম —
ওগো নগ্নদেহা নারী — তোমার কী দাম!

খুব জোরের সঙ্গেই অতি আধুনিক মোহমুক্তির বাণী অতি আধুনিক নগ্নতায় প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এ-কবিতা মনকে সে-‘মুডে’ সম্পূর্ণ নিয়ে যায় না। কারণ এ ‘মুড’ কবির নিজের ধার করা, কল্পনার অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত নয়। এর ভঙ্গী ও ভাষায় যে-জোর সে বাইরের জোর, এবং সেইজন্য অতিরিক্ত জোর। ওমর খৈয়মের কথা মনে পড়ে। সে-ও ‘মোহমুক্তি’র বাণী। কিন্তু সে-কাব্যের জগৎ ও জীবনের তত্ত্বে পাঠকের বিশ্বাস-অবিশ্বাস-নিরপেক্ষতার ‘মুড’ কাব্য-পাঠককে সম্পূর্ণ ‘হিপ্‌নটাইজ’ করে। বুদ্ধদেবের কবিতাটি যে করে না তার প্রধান কারণ ও-কবিতার ‘মুড’ যথার্থ ‘মুড’ নয়, attitude মাত্র।

... বুদ্ধদেবের কবিতা সেখানেই কাব্যের অনাবিল আনন্দ দেয় যেখানে সে-কাব্যের কল্পনার মধ্যে তাঁর মনের নিবিড় আত্মীয়তার নাড়ীর সংযোগ; ঐতিহ্যের কি হাল গতানুগতিকের বাইরের চাপে জোড়া লাগানো নয়। এই বাইরের চাপ বুদ্ধদেবের কল্পনা অল্পদিনেই কাটিয়ে উঠেছে। 'কঙ্কাবতী'তে এর প্রভাব নেই। তাঁর আধুনিক কবিতাগুলি, যা 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় ছড়ানো রয়েছে, এ-থেকে মুক্ত।...

"ক্ষণিকা" কবিতার আরম্ভে আছে,

আমরা রচেছি আজ প্রেম-মুগ্ধ, মধুর মিলন
মিলাইয়া বাস্তবে স্বপন;

বইয়ের শেষ কবিতা "মোরা তার গান রচি"তে প্রশস্ত জীবন-নদীর কল্পনা, —

মিশে আছে সোনা আর ধূলা যার সলিলে শীকরে

নিখাদ বাস্তবে আর অমিশ্র ধূলায় হয়তো কাব্য গড়া চলে, কিন্তু সে-কাব্য গড়ার চেষ্টা বুদ্ধদেবের কাছে পরধর্ম। তাঁর কল্পনা যেখানে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন মিলায়, বালুতে সুবর্ণরেখা দেখতে পায়, সেখানেই সম্পূর্ণ কাব্যের মূর্তিতে গ'ড়ে উঠতে পারে। তাঁর কাব্যসৃষ্টির এই স্বধর্ম, যাতে নিধন নেই। সে-কাব্য সত্য কথা হয়তো বলতে পারে না, কিন্তু কাব্য-কথা বলে।

'কবিতা', ৭.৪. (চৈত্র ১৩৪৮)

....

পূর্বসূরীদের মতো লেখবার চেষ্টা করতে-করতেই বাক্যরচনার নীহারিকায় হঠাৎ একদিন তারকার জন্ম হয়, অনুকরণের কলরোল ছাপিয়ে বেজে ওঠে নতুন সুর, নিজস্ব সুর। এর উদাহরণ শেক্সপিয়র, এর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। আর এই প্রক্রিয়া যে ছেলেবয়সেই শেষ হ'য়ে যায় তাও নয়; পরিণত জীবনেও, নিজের নিঃসংশয় বিশিষ্টতা অর্জন করবার পরেও কোনো সমসাময়িক, প্রাচীন বা বিদেশী কবির কোনো রচনা প'ড়ে কোন কবির না মনে-মনে ইচ্ছা হয়েছে : 'আহা, এ যদি আমার লেখা হতো!' এ-ইচ্ছার মানে তো এই যে কাব্যকলার শিক্ষা আরো একটু সম্পূর্ণ হ'লো, আরো একটু বিস্তৃত হ'লো ক্ষেত্র, আরো একটু বিকশিত হ'লো প্রতিভা। এই শিক্ষিত হবার ক্ষমতাকে যিনি জীবনের যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত সজীব রাখতে পারেন, এক হিশেবে তিনি তত বড়ো কবি। একে যদি বলি অনুকরণের — বা অপহরণের — আশ্চর্য ক্ষমতা তাহ'লেও দোষ হয় না! পৃথিবীর মহৎ কবিদের সমস্ত জীবনের কাব্যসাধনার কথা যখন ভাবি তখন এ-কথা মনে না-ক'রে উপায় থাকে না যে আত্মোপলব্ধির অন্যতম উপায়ই অনুকরণ, প্রকৃত মৌলিকতার সেটাই উপলবন্ধুর বঙ্কিম পথ। সেই সঙ্গে অনুশীলন চাই। অনুকরণ করেন অনেকেই, অনুশীলন করেন না বলে ব্যর্থ হন।

বুদ্ধদেব বসু
'কবিতা' আশ্বিন ১৩৫৩

'দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণের প্রতি'

জীবনানন্দ দাশ

[১৯৩৭]

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য। এ-সব কবিতা পড়তে ব'সে এগুলো কেন বিদ্রোহের কবিতা নয়, এ-সবের ভিতর ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই কেন, কিংবা হাড়ের সৌন্দর্য ঝ'রে প'ড়ে এ-সব কবিতায় কঙ্কালমুণ্ডের টিটকারি উড়ছে না কেন — এ-রকম সব গূঢ় জিজ্ঞাসা আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর ব'লে মনে হয়। বাস্তবিক বিদ্রোহ আমাদের জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকলেও সে-টা মানবাত্মার পক্ষে ব্যর্থতারই জিনিশ; এবং যেখানে বিদ্রোহের ততটা অবসর নেই সেখানেও কি জোর ক'রে বিদ্রোহ আনতে হবে? শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনা — এমন-কি শ্রেষ্ঠ শিল্পসাধনা কি তা নয় যা বহুর স্খলন এবং ক্ষরণ এবং অসামঞ্জস্যের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে জ্যামিতির — এবং যেখানে কোনো মহত্তর জ্যামিতি আর জ্যামিতি নয় শুধু — সমন্বয় ও সৌন্দর্য খুঁজে নিতে পারে? আমরা স্বীকার ক'রে নেব যে 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য, এবং প্রেমের কবিতাগুলো এই বইয়ের ভিতর কতদূর কবিতা হয়েছে বা অপ্রাসঙ্গিক জিনিশ হয়েছে তাই নিয়ে এই কাব্যের বিচার। অন্য নানা রকম কবিতার মতো প্রেমের কবিতার আবির্ভাব হয়েছে বিভিন্ন রকম ব্যাপকতা, গভীরতা, শূন্যতা বা অন্ধকার নিয়ে। বুদ্ধদেবের এইসব প্রেমের কবিতার ভিতর কোথাও নিরালম্ব শূন্যতা, শাববাহকদের গুমোট নিস্তব্ধতা বা নিষ্ক্রিয় অন্ধকারের বিভীষিকা নেই; কিংবা শাদা সূর্যের আলোও হাড় আর কড়ি কড়ি আর হাড় ব'লে মনে হয় যে-দেশে, সে-প্রদেশ নেই এখানে। তা নাই বা রইল, এই বইটি হ'ল কবিতারাজ্যের আর একটা facet। এই কবিতাগুলোর মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। জীবন চারদিককার প্রকৃতির রস ও প্রেমাস্পদার সৌন্দর্যের ভিতর নিজেকে গহন ক'রে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আমাদের চলতি পথের ওপারে কোনো ধূসর প্রাসাদের মতো যেন : যেখানে অন্ধকার সিঁড়ি রয়েছে, রয়েছে রূপ ও কামনার আরশি, জানালায় রঙীন কাচ, বাইরে আধো আঁধার, ধূ-ধূ শাদা পথ, ঝাপসা ছায়ার ঝিকিরমিকির আলো, হাওয়ার বেহালা, সোনা ও তামার মতো চাঁদ, এবং যেখানে বেহালার বুকে নাম ফোটে কঙ্কাবতী—কঙ্কাবতী! ...

বইটির কোনো-কোনো কবিতায় পুনরুক্তি বেশি, কথার অজস্র ডালপালার ভিড়ে আবেগ চাপা প'ড়ে পাখা মেলতে পারেনি। কোনো-কোনো কবিতায় জায়গায়-জায়গায় লঘু আমোদের ছোঁয়াচ রয়েছে, কিংবা একেবারে মুখের ভাষায় প্রতিদিনকার জীবনের নানা রকম ভাঁজ আবিষ্কার করবার চেষ্টা আছে। কবিতায় সরল মৌখিক ভাষার এ-রকম ব্যবহার 'প্রগতি' পত্রিকার যুগ থেকে সুরু হয়েছে ব'লে মনে হয়; এবং বুদ্ধদেব এর একজন বড় propagandist। কিন্তু এ-

চেষ্টা সব সময় সম্যকভাবে উৎরেছে ব'লে মনে হয় না।...এইসব কবিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে গভীর এবং পৃথিবীর সীমান্তে যেন কোনো শেষ শতাব্দীতে 'তিমিরতোরণে চাঁদের চূড়া' এবং 'আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মত তারকা-কণা' নিয়ে, আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার জন্য সে যা-কিছু নিয়ে আসতে পারে তারই স্বপ্ন দেখে সময়সীমানাহীন 'শেষের রাত্রি'। আধুনিক বাংলাকাব্যে বুদ্ধদেব যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি একমাত্র এই কবিতাটির উপরেও সে-সত্য নির্ভর করতে পারত।... যাঁরা বলেন 'কঙ্কাবতী'র কবিতাগুলো আধুনিক সময়ের উপযোগী নয় — তাঁরা সময় বা আধুনিক সময় বলতে কোনো একটা কৃত্রিম কিছু তৈরী ক'রে নিয়েছেন 'একখানা হাত' চিরকালই একখানা হাতের রহস্য; 'অন্ধকার সিঁড়ি' আজকের কোনো এক্স-রের আলোতেই অন্ধকার সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু হ'য়ে উঠবে না — এবং সেই জন্যই তা সব সময়ের।... যাঁরা সময় ও সৃষ্টিকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তবুও আরো ভগ্নাংশে পরিণত করতে চান, সময় ও সৃজনের মুখের রূপ তা না-হ'লে দেখতে পারবেন না ব'লে, তাঁদের প্রীতির জন্য সৃষ্টি ও সময় নিজেদের ব্যবহার ভুলে যায় না —মানুষের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছতম শতাব্দীর কোনো একটা তুচ্ছতম দিককে তুচ্ছতম শতাব্দীর তুচ্ছতম দিক ব'লেই মনে করে শুধু সেইসব দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণ; — যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো-কোনো মানুষের মন এক কণা বালির ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে আবিষ্কার করে, স্বর্গ খুঁজে পায় একটি ঘাসফুলের ভিতর, হাতের তেলোর ভিতরেই যেন পায় সীমাহীনতাকে এবং অনুপলের ভিতরেই সময়হীনের আস্বাদ পায়। আমাদের মুখ্যতম কবিদের সঙ্গে বুদ্ধদেব সেই কবি যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন; — 'কঙ্কাবতী' সেই কাব্য যার ভিতর এই আস্বাদ পেয়ে জলকে ততটা ইন্দ্রজাল ব'লে মনে হয় না মানুষের হৃদয়ের তৃষিত হবার অনুভবকে যতটা। পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য পড়লে হৃদয়ে এই বোধ জন্মায়; হৃদয়ে এই অনুভব জন্মাতে পারেন যেই কবি (এবং তৃপ্তির অব্যর্থ পানীয় তিনি সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসেন) তাঁর কবিতাকে সময় ও মৃত্তিকা এসে কখনও ক্ষয় করতে পারে না। সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে 'কঙ্কাবতী' মৃত্তিকা-ও-সময়োত্তর কাব্য।...

'কবিতা' ৩.২ (পৌষ ১৩৪৪)

যাকে অস্পষ্টভাবে প্রগতি বলা হয়, সে বস্তুটি আর যাই হোক কবিতা কি সাহিত্য যাচাই করবার নিকষ নয়। সমাজ শোধনের কাজে ব্যবহার্যতার পরিমাণ হিশেব ক'রে সাহিত্যের বিচার চলে না। ... আমার প্রগতিশীল বন্ধুরা যখন প্রশ্ন করেন যে আধুনিক বাঙালি লেখক তাঁর বিষয় নির্বাচনে আজকের দিনের বিশেষ কতকগুলো ঘটনা বা সমস্যা এড়িয়ে যান কেন, তখন এই অভিযোগের আমি কোনো উত্তর খুঁজে পাইনে। লেখক তো বিষয়কে নির্বাচন করেন না, বিষয়ই লেখককে নির্বাচন করে। উপরন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা আজকের দিনের কোনো সমস্যারই এক চুল সমাধান হবে; সুতরাং এ-অভিযোগ সত্য হলেও সামাজিক দিক থেকে কোনো আশঙ্কা দেখি না।

বুদ্ধদেব বসু
'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৫

'অশ্লীলতার কাব্য?'

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

(১৯৩২)

... এই প্রতিভাশালী নবীন কবি কাব্যামোদী সমাজে সুপরিচিত। কিছুদিন পূর্বে 'অতি আধুনিক' সাহিত্যের প্রতি যে তীব্র বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার অনেকখানি এই কবিকে সহিতে হইয়াছে। তথাপি বিশেষভাবে যে-দু-একটি কবিতা বাজারচালান নীতির মাপকাঠিতে অপাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহা হুবহু সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবি যে দুঃসাহসী, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 'দুঃসাহসে দুঃখ হয়' — শৈশবে পাঠ্য পুঁথির মারফত এই অমূল্য উপদেশ পাইয়াও যাঁহারা দুঃসাহস প্রকাশ করেন, তাহাদিগকে ঠেকাইবার কোনোই উপায় নাই।

সাহিত্যে, কবিতায় শ্লীল ও অশ্লীলের সীমারেখা লইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুবর অমল হোম পর্যন্ত অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, — সর্ববাদীসম্মত কোনো মীমাংসাই হয় নাই — হইতে পারে না বলিয়াই হয় নাই। কাব্যে অশ্লীলতা কাব্যসৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই ছিল, আছে এবং থাকিবে। এক-এক যুগে দেশ-কাল-পাত্রভেদে প্রকাশভঙ্গির তারতম্য ও ভাষার চাতুর্যের আবরণ কোথাও নিবিড়, কোথাও তরল! একশ্রেণীর রুচিবাগীশ জগতে আছেন এবং থাকিবেন, যাঁহারা সাহিত্যে বা কাব্যে যৌনমিলন সম্পর্কিত আবেগ, আক্ষেপ ও উন্মাদনার বর্ণনা বা ইঙ্গিত মাত্রকেই অশ্লীল মনে করেন ও করিবেন। আবার একশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বা মুখ্যত স্থূল কামবিলাসমূলক পদাবলী শুনিয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণ করেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতা শুনিলে অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণবিবর রোধ করিবার ভাণ করিয়া লজ্জায় আরক্ত মুখে অধোবদন হন। এই দুই শ্রেণীর কাব্যামোদীরা নিশ্চয়ই 'বন্দীর বন্দনা'-র কোনো-কোনো অংশ বরদাস্ত করিতে পারিবেন না। এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া নিষ্ফল।

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত না-হইয়াও যাঁহারা বলেন, অসুস্থ যৌনস্পৃহার বীভৎসতাকে উলঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিয়া সস্তা বাহাদুরী লওয়া ছাড়া এই কবির কাব্যসৃষ্টির মূলে আর কোনো বস্তু নাই, তাঁহারা একদেশদর্শী। প্রত্যেকটি কবিতাকে সমগ্রভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ না-করিয়া দু-একটা পংক্তি লইয়া বিদ্রূপ, বিরক্তি এবং কটুভাষা প্রয়োগ করিলে তাহা আর যাহাই হউক, সমালোচনা নহে।

যাঁহারা সাহিত্য-পল্লীতে খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া পাড়া মাতাইয়া চলাফেরা করেন, তাঁহাদের মুখে বুদ্ধদেবের কবিতার কুৎসা ও অকীর্তির বার্তা পাইয়াছিলাম। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় এই কবির অনেক কবিতাই পড়িয়াছি। সমালোচকগণের নিন্দা ও ধিক্কার সত্ত্বেও বুদ্ধদেব যে কবি, একথা মনে-মনে স্বীকার করিয়াছি। 'বন্দীর বন্দনা' ভালো করিয়া পড়িয়া সেই ধারণাই বদ্ধমূল হইল।

বুদ্ধদেব কবি এবং বর্তমান যুগের কবি। ...

মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন;
স্রষ্টা শুধু চাহে, এ বীভৎস ইন্দ্রিয় মিলন —
নির্বিচারে প্রাণী সৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।

বিষ-তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এই উগ্র প্রশ্নকে 'অশ্লীল' বলিয়া নাক সিটকাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। প্রেম, বিবাহ, মন্ত্র ইত্যাদি আভরণহীন নিছক নিরাবরণ যৌন-লিপ্সা জীবের স্বভাব-ধর্ম — এই সুস্পষ্ট সত্য অপ্রিয় বটে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবার অধিকার কবির আছে। এবং তাহা বলিতে গিয়া কবি বাজার-চলিত ভণ্ডামির আশ্রয় লন নাই, ক্ষতকে পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া প্রকাশ করেন নাই, সৃষ্টির অন্ধ প্রেরণাকে 'জন্মজন্মান্তরের প্রেম সম্পর্ক' নাম দিয়া নরনারীকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই! ...

জানি যে রচিব কাব্য এ উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার,
তবু কেন রচিলাম এই গর্ব বিদ্রোহ — আমার

এই মনুষ্যোচিত গর্বের যে-বিদ্রোহ — সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, দর্শন, অবশেষে জড়বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া অন্ধ সৃষ্টিশক্তির অনুগামী মানুষকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র সৃষ্টির ঐশ্বর্যে মহীয়ান করিয়াছে, 'বন্দীর বন্দনা' গীতি তাহারই উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত।

বলা বাহুল্য বর্তমান যুগের মানুষের সবখানি কথা আলোচ্য কবিতার বইটিতে নাই। এই কবিতাসংগ্রহে কবির একই ভাবের দশটি কবিতা রহিয়াছে। 'উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে' বসিয়া কামনার ও বাসনার মন্থনসঞ্জাত সুধাবিষ আহরণ করিয়া কবি কবিতার পাত্র ভরিয়া আনিয়াছেন। তিনি কিছুই পরিহার করেন নাই, আবরণ করেন নাই, ... যৌবনের স্বপ্ন ও কল্পনা, ক্ষুধা ও লোভ যত বিচিত্র পথে গিয়াছে, সে সকলই পরিভ্রমণ করিয়া কবি 'মোহমুক্ত' হইয়াছেন —নরনারীর আকর্ষণ ও মিলনের অপূর্ণতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও ভালোমন্দ সমস্তই প্রথমে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া, পরে 'প্রেমিক'রূপে সন্তোষের সহিত সমগ্রই গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধির নয়নে হৃদয়াবেগের বসন বাঁধিয়া, অ-দৃষ্টের অন্ধ অনুগামী হইয়া না-জানার মূঢ় সন্তোষ লইয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা প্রসন্নতার ভান করে নাই, মহৎ ও বৃহতের উপর ধ্রুবদৃষ্টি রাখিয়া, ক্ষুব্ধ অসন্তোষ অণুমাত্র গোপন না-করিয়া, কামনা ও ভোগকে যথাযথ স্থান দিয়া কবি যৌবনকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। ...

এক অতুলনীয় কবিপ্রতিভার প্রভাবে বাংলার কাব্য-সাহিত্য যখন ... আধ্যাত্মিকতার আকাশে অস্পষ্টতার জাল বুনিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন যে-কয়েকজন কবি উহাকে মর্ত্যমানবের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাঁহাদেরই অন্যতম। এবং এই নবীন ভাবধারাকে কাব্যের রূপান্তরে বহন করিয়া আনিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে — আমি অসংকোচেই বলিব — বুদ্ধদেবের স্থান অন্যান্য অনেকের অগ্রে, কাহারো পার্শ্বে, কিন্তু পশ্চাতে নহে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা', শারদীয়া সংখ্যা ১৩৩৯

ছন্দের বারান্দা

শঙ্খ ঘোষ

আর আমি আজ বন্দী হয়েছি ছন্দোবন্ধনে : 'দ্রৌপদীর শাড়ি'

'আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোট নালিশ এই যে তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প' এ-কথা যখন বুদ্ধদেবকে লেখেন সুধীন্দ্রনাথ, 'ছোট' শব্দটি হয়তো তিনি সৌজন্যবশেই ব্যবহার করেছিলেন। আধুনিক ছন্দের কাঠামোয় যাঁরা চেয়েছিলেন গদ্যপদ্যের বিরোধভঞ্জন, তাঁদের পক্ষে এ-নালিশকে নিতান্ত তুচ্ছ গণ্য করা স্বাভাবিক ছিলো না। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতার ছন্দচর্চায় জরুরি সেই সেতুটিকে একেবারেই কি গ্রাহ্য করেননি বুদ্ধদেব বসু? মনে রাখা চাই যে সুধীন্দ্রনাথের আপত্তি উঠেছিলো কবিতার শব্দ বিষয়ে, 'গদ্যপদ্যের প্রভেদ ঘোচাতে চাই ভাষার দিক থেকে — উভয় প্রকরণে শব্দ ও বাক্যবন্ধ একরকম রেখে' এই ছিলো তাঁর ঘোষণা এবং স্পষ্টতই তিনি জানিয়ে দেন যে ছন্দোলিপিতে শৈথিল্য তাঁর একেবারেই অনভিপ্রেত। তাহ'লে ছন্দোলিপির পূর্ণ প্রথানুসরণই কি অভিপ্রেত? তার দ্বারাই পাওয়া যাবে মুক্তির পথ? তাহ'লে কি 'দময়ন্তী'র শব্দবিষয়ক ইস্তাহারের পরেই সংগত হ'তো এই অভিযোগের প্রত্যাহার? কিন্তু 'দময়ন্তী'তেই গদ্যের রীতি নিখুঁত ব'লে সুধীন্দ্রনাথ অন্তত ভাবেননি।[১]

তার একটা কারণ এই হ'তে পারে যে বাক্‌ছন্দ বিষয়ে ছ-টি অনুশাসন স্থির ক'রে নিলেও ও-বইতে সে-বিধির সম্পূর্ণ অনুসরণ দেখা দেয়নি, হয়তো তার প্রয়োজনও ঘটেনি সর্বত্র। যে-দু-চারটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ বুদ্ধদেব নিজেই উল্লেখ করেন তার বাইরেও দেখি প্রায়ই ঘটছে এই ধরনের বিচ্যুতি : 'অদৃষ্টের দোষে/বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে/ক্ষত করে', 'সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথবনে/কাটায়েছি', 'আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দুজনের চোখে', 'অতীতের ফুঁ দিয়ে নিবায়ে দেবে সব' অথবা 'তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে'র মতো অনেক প্রয়োগ।[২] বাক্‌রীতিকে যদি মূলত ক্রিয়াপদের দিক থেকে বিচার করি তাহ'লে মানতে হয় যে 'দময়ন্তী'র পরবর্তী কাব্যচর্চাতেই বরং এ-পথে আরো সিদ্ধার্থ হ'তে পারছেন কবি, ক্রমশ সরিয়ে দিতে পারছেন বাংলা কবিতার এই ভাষাগত কাব্যিকতা।

লক্ষ করবার বিষয়, 'বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন' সাধনায় ছ-টি প্রতিজ্ঞার অন্তর্বর্তী পাঁচটিই যাচাই করতে চাইছে শব্দপ্রকৃতি, কেবল প্রথম সূত্রে অন্বিষ্ট হ'লো 'বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি।' এই রীতি নিয়ে ঠিক কী ভাবছিলেন বুদ্ধদেব তা হয়তো আমরা খানিকটা অনুমান ক'রে নিতে পারি, কিন্তু তখন প্রশ্ন জাগে মনে, রবীন্দ্রনাথ থেকে কতোটা নতুন ক'রে ভাঙতে হয়েছিলো এই বিন্যাস? পদ্যকে দিয়েও যে গদ্যকবিতার কাজ করিয়ে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথই তা বহুবার করেছেন, একথা তো বুদ্ধদেবই আমাদের মনে করিয়ে দেন। এবং

তাঁর এই সিদ্ধান্তেও আমাদের কান পুরো সায় দেয় যে, '"দেবতার গ্রাস"-এর আবৃত্তি এমনভাবে হওয়া সম্ভব যাতে প্রায় মুখের কথা শুনছি ব'লেই মনে হয়'। "দেবতার গ্রাস" এ-ব্যাপারে কোনো একক উদাহরণও নয়। শব্দের বিন্যাসে তাহ'লে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতোদূর পরিণতি ঘটলো কবিতায়? 'কাব্যিক শব্দ ও সাধু ক্রিয়াপদগুলিকে যদি পয়ার থেকে নির্বাসিত করা হয়, তাহ'লে সঙ্গে-সঙ্গেই মৌখিক ভাষার ঠিক ততোটাই অনুরূপ হ'তে পারে, কবিতার পক্ষে যতোটা হওয়া সম্ভব' : এই কি হবে আমাদের শেষ কথা? কবিতার পক্ষে কতোটা সম্ভব তা কি-হিশেবে স্থির হবে? ছন্দের মধ্যেই চাই কথ্যভাষার সতেজ প্রাণশক্তির পরিচয়, কিন্তু বুদ্ধদেব যে তাকে চান ছন্দোবন্ধনের 'মাধুর্যের'ই সঙ্গে মেলাতে, ছন্দোমাধুর্যের সেই ধারণা কি কোথাও সংঘর্ষ তৈরি করছে না বাক্‌স্পন্দের বিকাশে?[২]

গদ্যের বাক্যবন্ধ নয়, আধুনিক ছন্দের অন্বিষ্ট ছিলো সমর্থ বাক্‌স্পন্দের ব্যবহার। সংগত বাক্যবন্ধ থেকে সেই স্পন্দ রচিত হয় একথা সত্যি, তাহ'লেও স্পন্দকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব মূল্যে। সেই স্পন্দের সঞ্চার আনেন নানা কবি নানা ভঙ্গিতে, কখনো-বা ছন্দদেহ অটুট রেখে তারই মধ্যে বিপরীত বলয়ে আসে গদ্যের লড়াই, কখনো ছন্দকে তার পুরোনো অভ্যাস থেকে ঈষৎ খুলে দেওয়া আপাত-বিশৃঙ্খল গদ্যসমাজের দিকে, আর কখনো হয়তো অধৈর্য প্রত্যাখ্যানে সরাসরি গদ্যধরনেই নেমে আসা। এর কোনটি হ'তে পেরেছিলো বুদ্ধদেব বসুর সন্ধান?

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় তিনি সহজে প্রস্তুত নন। কবিতার প্রাথমিক বিদ্রোহে অমিল মুক্তক লিখেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথেরও কয়েক বছর আগে, বিষ্ণু দে-র মতোই, কিন্তু ছন্দ-সুষমার গাণিতিক অভ্যাস বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে মান্যই করতে দেখি। বাংলা ছন্দের পর্ববিন্যাস যে প্রায় নিষ্ঠুররূপে নিয়মিত, এমনকি অক্ষরবৃত্তের প্রথম আটমাত্রায় ২-৩-৩ বা ৩-২-৩ বিন্যাসও যে একেবারে অচল, সুধীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবও একথা শ্রুতিধার্য রাখেন অনেককাল। 'কিন্তু *এই দুর্গ আজো টিকে আছে, না-ব'লে, অনবরত*', '*অবশেষে, যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর*', '*ছিঁড়ে নেয় বাড়ন্ত জাগরণের সবক'টি কম্পমান পাতা*', '*নিরঞ্জন গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান*' : এ-সব মুক্ত প্রয়োগ দেখা দিলো কেবল 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইতে, কিন্তু তখন তিনি আর এ-পথে একা নন, অনেকের একমাত্র মাত্র।[৪] অথচ পরবর্তী সময়ের বাঁকিয়ে-ধরা এই ভঙ্গি তাঁর প্রথম পঁচিশ বছরের রচনায় কতোই দুর্লভ! এমন নয় যে অক্ষরবৃত্তের অনুরূপ ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গেই গদ্যপদ্যের বিরোধ মিটে যায় অথবা তাকেই বলা চলে পরম সিদ্ধি। আসলে গদ্য বাক্‌বন্ধ ছন্দের ভিতর যে-ধরনের অবিরল বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে, এ হ'লো তারই এক ছোটো ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু এই বিপর্যাস এক সময়ে বুদ্ধদেব বসুকে এতোটাই অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছিলো যে 'স্ফুলিঙ্গ'-এর '*অপরাজিতা ফুটিল*' বা '*যেন পেয়েছে লিপিকা*' লাইন দু-টিকেও তিনি ভাবছিলেন তিন মাত্রার ব্যতিক্রম, একটু ফাটল-ধরানো এই অক্ষরবৃত্তকে নাম দিচ্ছিলেন মিশ্রছন্দ।[৫] আবার এই পিছুটানের জন্যই ত্রিশ বছর আগে বিষ্ণু দে-র '*জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র জানি সে যে সা ধা র ণ ই মেয়ে*' অথবা '*সং স্কৃ ত কবিতার নাগরীনাগর*' ব্যবহারে তাঁর মন আপত্তি ক'রে উঠেছিলো, উচ্চারণভঙ্গিতে শব্দ যে কখনো-কখনো টান খেয়ে যায় তা মানতে যেন পুরো প্রস্তুত ছিলেন না তখন।[৬]

সাম্প্রতিক কবিদের ছন্দোগত যথেচ্ছাচার বুদ্ধদেব যে প্রসন্ন চোখে দেখবেন না, তা এখন স্বাভাবিক ব'লেই বোঝা যায়, তাঁর নিজের পুরোনো রচনা সেই ভঙ্গিলতার বিরুদ্ধেই যেন তর্জনী তুলে আছে।

এমনকি 'পদাতিক' কবির শব্দ-সংশ্লেষ লক্ষ ক'রে যতো উত্তেজনা বোধ করেছিলেন 'কালের পুতুল'-এর লেখক (১৯৪০), 'দেখা দিলো কলকাতার আরো এক কাল' সত্ত্বেও বলা যায় না যে এর প্রয়োগও তাঁর রচনায় অবাধ হ'তে পারলো। বরং তাব অভাবই কখনো-কখনো আমাদের বিচলিত ক'রে যায়। যে-'বিদেশিনী'কে দেখে সুধীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিলো 'আমি যাকে গদ্যগুণ বলি তার বিস্ময়কর প্রাচুর্য ওই কবিতাটিতে', ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত সেই কবিতারই গদ্যটানকে থেকে-থেকে প্রত্যাহত করছে ব'লেই কিন্তু ধারণা জন্মায়। এইখানে বুঝতে পারি বাক্‌রুদ্ধ এবং বাক্‌স্পন্দের ভিন্নতা। শব্দক'টি কীভাবে বিন্যস্ত হবে গদ্যে, এই হ'লো বাক্‌বন্ধের জিজ্ঞাসা। শব্দক'টি কীভাবে ব'লে থাকি আমরা, এই হ'লো বাক্‌স্পন্দের কৌতূহল। 'তবু তার যথেষ্ট হয়নি দেখা' 'এখানে রয়েছে লেখা' বা 'কিংবা কিছু ঐ ধরণের' বিষয়ে প্রশ্ন তুলব না, কিন্তু 'হাতে হাত ঠে ক লে ও চ ম কে না-উঠে' 'বাং লো র বারান্দায়' 'ক র ব না খামকা বড়াই' 'তুমি তাঁকে বলবে আমার হয়ে' 'কে যেন উ ঠ ল হেসে' : এ-সবও কি নিঃসংকোচ রাখে আমাদের?' এ-কে কখনোই বলা যাবে না ছন্দপতনের উদাহরণ, বরং পুরানো প্রথা মতো ছন্দোরক্ষাতেই এদের সতর্কতা, কিন্তু যদি একে বলি স্পন্দপতনের উদাহরণ? অক্ষরবৃত্তের বিন্যাসগুণে চিহ্নিত শব্দাবলিতে আভ্যন্তরীণ রুদ্ধদলগুলি টান পেয়ে মাত্রা বাড়িয়ে নিচ্ছে, তার ফলে এর উচ্চারণ যতোটা দীর্ঘ হ'য়ে যায়, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে তার অভাব। ফলে কবিতাপড়ায় আসে অল্প কৃত্রিমতা, গদ্যের ধ্বনিসঞ্চার কিছু-বা বাধা পায়, চল্‌তি চাল সত্ত্বেও রচনায় আসে খানিকটা এলায়িত ভঙ্গিমা।

একথা ঠিক যে এই দুর্বলতা পরিহার ক'রে উঠতে চান কবি। একদিকে স'রে যান স্পষ্ট গদ্যের দিকে, যেখানে ছন্দতান আর কথ্যতান কোনো সংঘর্ষ তৈরি করে না, 'বিদেশিনী'র পরেই লেখা হয় "মধ্যতিরিশ", "খণ্ড দৃষ্টি" বা "ব্যক্ত"র মতো কবিতাবলি; অন্যদিকে দেখা দিতে শুরু করে আঁটো-সাঁটো একটি-দুটি সনেট বা সনেটকল্প ছোটো লেখা। "প্রত্যহের ভার" বা "মায়াবী টেবিল"-এর মতো রচনা যেন 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর অতিদূর পূর্বাভাস, দৃঢ়বন্ধনের আয়োজন। কিন্তু কবির আজীবন সুরপ্রত্যাশী মন সেই বন্ধনের সময়েও শব্দের সংশ্লেষভঙ্গির চেয়ে বিশ্লেষ ধরনকে কাজে লাগায় বেশি, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে। 'বলে, এতো ফু র্তি র ঋতু' 'রা স্তা য় গণ্ডগোল রাত্তির বারোটা অব্দি' বা 'এমন কি কবিতার শব্দে নয়, শ ব্দে র ছন্দে সম্মোহনে নয়' — 'শীতের প্রার্থনা'র এই শব্দছড়ানো রীতি 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইতে যেন অতিচারী হ'য়ে উঠলো : 'হৃদয়ের রত্নগুলি — সহনীয় স ল জ্জ তা য়' 'বিচ্ছেদের পা রি শ্র মি ক' 'ব্যবসার অ ধ্য ব সা য়ে' 'লিখে গেলো স হ স্রা ধি ক' 'বরং কখনো যারা কাগজের নৌ কো য় চ'ড়ে' 'আমাকে দিয়ো না দৃষ্টি। বি চ্ছে দে ভ'রে আছে মন' 'পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত; গ ন্ধে র অন্ধকারে ঢুকে' 'বিরাট প রি শ্র ম শেষ হ'লে' 'যুদ্ধ করে, খুঁটে খায়; নিমন্ত্রণে অ ভ্য র্থ না র' বাক্‌ অর্থ সম্পর্কের হিং সু ক দাঙ্গা শেষ হ'লে': এই রকম আরো অনেক।[৮] আজকের দিনে অক্ষরবৃত্তের এই বিশ্লেষ কোনোক্রমেই আর অসংগত নয়, কিন্তু

সংশ্লেষণের তুলনায় এর প্রতি কবির অপার পক্ষপাত আমাদের আরেকবার ধরিয়ে দেয় তাঁর স্রোতস্বান্ মেজাজ, গীতল প্রবাহের প্রতি তাঁর অধীর আগ্রহ।

সেই আগ্রহের স্পষ্ট রূপ ধরা ছিলো 'কঙ্কাবতী'র কবিতায়। 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'কে দুই মহল ব'লে মনে হয়েছিলো কবির. হয়তো ছন্দের প্রকরণেও এরা দুই মহলের বাসিন্দা। প্রথম বইয়ের "কোনো বন্ধুর প্রতি" কবিতা দূরাগত আহ্বানের অংশে ছন্দকে একটু দুলিয়ে দিয়ে যায়, কিন্তু এর সামগ্রিক চেহারাই হ'লো অক্ষরবৃত্তের কাঠামোয় গাঁথা, কখনো সনেট কখনো-বা খোলা মুক্তকে। সন্দেহ নেই যে এইটেই তাঁর আদ্যন্ত কবিতাচর্চার প্রধান বাহন, বারবার ঘুরে আসেন এইখানেই, এবং 'কঙ্কাবতী'ও সে-অর্থে সম্পূর্ণ কোনো ব্যতিক্রম নয়। তবুও, ঐ ছন্দের অনেক ব্যবহার সত্ত্বেও 'কঙ্কাবতী' আমাদের মনে বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে মাত্রাবৃত্ত বা একটি-দুটি ছড়ার চালে, আর তা কেবল নাম-কবিতাটির গুণেই নয়। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহী তাপ স'রে গিয়ে প্রেম এখানে প্রায় গান হ'য়ে উঠেছে, খোলা হাওয়ার গান, কবিতা হ'য়ে উঠছে "সেরেনাদ"। কবিকে এখানে মনেই হ'তে পারে কিছু-বা ছন্দবিলাসী, শব্দ ও ছন্দের ধ্বনিতে মশগুল, শোনা যায় 'চোখে চোখ পড়েই যদি/ নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে'র ঠমক, অথবা 'একসার মেঘ সরু এলোমেলো আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো/ গাছের সবুজে জড়ায়ে শরীর রয়েছে প'ড়ে/আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে,/ আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা'র উতরোল বাজনা।

'নতুন পাতা'কে ছেড়ে দিলে অতঃপর বুদ্ধদেবের সব কবিতার বই দোলায়িত হচ্ছে এই দুই ভিন্ন বৃত্তে, বলা যাক 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র বৃত্তে। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'ও তার উদাহরণ। কিন্তু বিপদ এই যে মাত্রাছন্দে গদ্যের সঙ্গে বিরোধ আরো জোরালো হ'য়ে ওঠে, এই ছন্দের গহনে মুক্তির পথ আরোই দুর্লভ। বেরিয়ে আসবার একটা ছোটো ধরন হয়তো মেলে মুক্তক মাত্রাবৃত্তে, এবং প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে তর্কচ্ছলে বুদ্ধদেব বলেওছিলেন 'মুক্তক ঢঙের মাত্রাবৃত্ত একবারও যদি সম্ভব হ'য়ে থাকে তাহ'লে বারবার সম্ভব হবার পথে বাধা রইলো কোথায়।'[১] তবে তত্ত্বগতভাবে বাধা না-থাকা এক কথা আর তার অনায়াস বহুল প্রয়োগ হ'লো স্বতন্ত্র ব্যাপার। উত্তরকালের ইতিহাস থেকে বুদ্ধদেবকে অন্তত এর পরীক্ষায় ততোদূর উৎসাহী ব'লে মনে করা যায় না, ভাবা যায় না যে এই ছন্দের ভিতরকার সংঘর্ষে তিনি বেশি কোনো মন দিচ্ছেন।

তবে কি এর থেকে মুক্তি তৈরি হ'তে পারে মিশ্রছন্দে? যেখানে মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্তে অথবা স্বরবৃত্ত-অক্ষরবৃত্তে মেশামেশি হ'য়ে যাবে? ফ্রী ভার্স বা স্প্রাং রীদ্‌ম্ নিয়ে যখন ভাবছিলেন তিনি এবং সুধীন্দ্রনাথের কাছে বুঝতেও চাচ্ছিলেন এর জটিল রহস্য, সুধীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'হঠাৎ মনে হলো যে ছড়ার ছন্দ আর পাঁচ মাত্রার ছন্দ এবং মধ্যে-মধ্যে, খুব সাবধানে, স্বরাঘাতপ্রধান, হলন্তাক্ষরবহুল ছয় মাত্রার ছন্দ মিশিয়ে লিখলে হয়তো-বা স্প্রাং রীদ্‌ম্-এর অনুকরণ বাঙালীর পক্ষে সম্ভব। আপনি চেষ্টা ক'রে দেখুন না।' শুভার্থী এই পরামর্শ কতোটা তাঁকে সেই কারুকর্মে উত্তেজিত করেছিলো? এমন সম্ভাবনার উল্লেখ বুদ্ধদেবের নিজের আলোচনাতেও দেখতে পাই (দ্র. "বাংলা ছন্দ"), এমনকি 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে পাওয়া যায় "কালো চুল"-এর মতো কবিতা যেখানে আটমাত্রা সাতমাত্রা অনায়াস সফলতায় জায়গা বদল

করে : 'কঙ্কাবতী এসে দাঁড়ালো/খুলে দিলো কালো চুল, বিপুল ঢেউ তুলে লাল সূর্যাস্তের সন্ধ্যায়।/খুলে গেলো পশ্চিমে সূর্যের জাদুকর জানালা/রঙের রূপসীরা বাড়ালো মুখ ঐ শৌখিন প্রাসাদের জানালায়' তাহ'লেও এই মিশ্রভঙ্গিমা মূলত অমিয় চক্রবর্তীর পথ, বুদ্ধদেব বহুদূর এগোতে চাননি এই ধরন নিয়ে।

অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত, কোনো ছন্দেরই ভিতর থেকে খুলবার আয়োজন বুদ্ধদেবে বিশেষ দেখি না, উপরন্তু তাঁর চরিত্রে আছে সুরের প্রতি অরোধ্য আকর্ষণ। তাঁর কবিতা বানিয়ে তোলে আসক্তি, ছড়িয়ে দেয় 'তীব্র মত্ত আত্মহারা ভালোবাসা' — 'যে ভালোবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু — তীব্র মত্ত আমার হৃদয়! আত্মহারা আমার হৃদয়', আর তারই ফলে আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আচ্ছন্ন কবির স্বরে ভেসে ওঠে 'গান, তাই আজও গান!' এই গান তবে থেকেই যায় শিরায়-শিরায়, কিন্তু তবু তো 'মড়কের সংগ্রাম, হৃদয়ের মৃত্যু, নৈরাজ্যের অন্ধকার' দেখতে হয় তাঁকে, তবুও তো 'স্বপ্নের তীব্রতা'র সঙ্গে আসে 'দ্বন্দ্বের সংঘাত'। তাঁকে ভাবতেই হয় তবু মুক্তছন্দের কথা, মিশ্রছন্দ এবং স্প্রাং রীদ্‌মের ভাবনা, লক্ষ করতে হয় কীভাবে গদ্যের সঙ্গে অবিরতই সাযুজ্য তৈরি করতে চাচ্ছে আধুনিক পদ্য। 'সাহিত্যচর্চা'র "বাংলা ছন্দ" প্রবন্ধটি অথবা 'কালের পুতুল'-এর রচনাবলি ছন্দবিষয়ে তাঁর এই উন্মুখ কৌতূহলকে চিনিয়ে দিচ্ছে। তবে কি তিনি নিশ্বাস নেবার জন্যই মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসেন গদ্যছন্দের সমতলে, 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র পর 'নতুন পাতা'য় যেমন? হয়তো তাই। তবে লক্ষ করতে হবে যে 'নতুন পাতা' থেকে আজ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর গদ্যছন্দেরও মূল প্রবাহ রবীন্দ্রনাথেরই অনুষঙ্গ মনে ধরিয়ে দেয় বারংবার, তার শব্দে বা ছবিতে নয়, কিন্তু তার স্পন্দনে। এই পরীক্ষার সূচনাপর্বে এমনকি রবীন্দ্রনাথও দেখতে পাচ্ছিলেন তরুণতরদের গদ্যছন্দে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রে, মনে হয়েছিলো তাঁর, 'পাহাড়তলির বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ', সমর সেনের যেন 'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য' আর বুদ্ধদেবের কবিতায় 'গদ্যের কণ্ঠে তালমানছেঁড়া লিরিক'। তালমানছেঁড়া লিরিক? তাহ'লে এখানেও নয়, গদ্যছন্দের এই চেহারাতেও বুদ্ধদেব বসুর এমন কোনো মৌলিক স্পন্দসঞ্চার নয় যা হ'তে পারে একান্তই তাঁর আপন, তাঁর অথবা বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ।

কিন্তু 'নতুন পাতা'-রই মধ্যে যেন দেখা যায় আরেকটি কুঁড়ি, কবির আরেক রকম অস্বস্তির ইঙ্গিত। গদ্যের তালমানছেঁড়া চেহারাও যে তাঁকে বিব্রত করছে কোথাও, তার আভাস যেন দেখতে পাই এই বইতেই। পদ্য-ছন্দের যে-মৃদঙ্গওয়ালা বোল নেই ব'লে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর গদ্যকবিতায় স্বস্তি পাচ্ছিলেন, সেই মৃদঙ্গেরই ধ্বনি হঠাৎ বেজে উঠলো এর আর-কয়েকটি রচনায়। গদ্যের মধ্যে পদ্যের আমেজ ও মিলের চমক রবীন্দ্রনাথের মতো সুধীন্দ্রনাথেরও আপত্তির বিষয় ছিলো, তাহ'লেও এর প্রয়োগ ঘটছিলো অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দে, এবং বুদ্ধদেবের হাতেও উড়ে এলো তার স্ফুলিঙ্গ :

> তোমাকে বুকে ক'রে তোমাকে বুকে ভ'রে কাটে আমার রাত্রি।
> সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার-মথিত মুহূর্তে
> থমকে দাঁড়ায় — যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী—
> কোন উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়তে।

মনে রাখতে হবে যে অমিয় চক্রবর্তীর 'অন্তর্লীন ঝঙ্কৃত এবং সংহত 'verse libre' থেকে এর চরিত্র অনেকটাই ভিন্ন, এর আছে এক গড়িয়ে-যাওয়া ভারি মন্থর চলন, অমিয় চক্রবর্তীর রচনার মতো ছিপছিপে নয় এর চেহারা।

পশলা বৃষ্টিতে কালো সারালো মাটির গরম ভাপ
ধানপাকানো তাপ
টনটনে নেবুফুলে ঠাণ্ডা হাওয়া;
সোনালিকাঁটা কাঠাল, ভরাট আম,
ঝিকমিকে গ্রীষ্মে পাওয়া।

এ-সব লাইনের সঙ্গে প্রথমোক্তের সাদৃশ্য শুধু এই যে দুই লেখাতেই মিত্রাক্ষরের ব্যবহার।[১০] কিন্তু 'নতুন পাতা'র উদ্ধৃত ঐ-অংশে এ-টাই মস্ত কথা নয় যে লাইন শেষে মিল আছে। কয়েক তাল শব্দ গড়িয়ে এসে ঐ যে একটা যুক্তব্যঞ্জনময় ছোটো শব্দে আঘাত পেয়ে থেমে যাচ্ছে, গতি আর যতির এই বিশেষ চাঞ্চল্যটাই এখানে গণ্য করবার, তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে একটা অনতিনির্দেশ্য পরিমাপের বোধ। যদি না-ই দেয়া হ'তো মিল? তখন উঠে এলো আরেক পরীক্ষা; স্তবকবন্ধের পরিমিতিতে গদ্যেরই একটা শ্লোকসদৃশ ধ্বনিরচনার পরীক্ষা। 'চিল্কায় সকাল'-এ দেখা দিচ্ছে এরই একটা প্রাথমিক ধরন :

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ। — আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

পরম্পরায় এমনি স্তবকবন্ধ, যার শেষ চরণে হঠাৎ ছোটো-হ'য়ে আসা এক-একটি উচ্চারণ। ছন্দ আর অছন্দের মধ্যপথ খুঁজতে খুঁজতে একবার যেন এই শ্লোকবন্ধে এসে দাঁড়ালেন কবি। 'বন্দীর বন্দনা' আর 'কঙ্কাবতী'র 'যোগসাধনকারী সরু বারান্দাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'পৃথিবীর পথে'। 'নতুন পাতা'র উদ্ধৃত ঐ লাইনগুলিতে তেমনি একটি বারান্দা পাওয়া যাচ্ছে বাক্‌স্পন্দ আর সুরস্পন্দের মধ্যে। এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাবার পথে এই যে একবার চকিতে বারান্দাটিকে ছুঁয়ে যাচ্ছেন কবি, একে নিছক আকস্মিকও বলা চলে না, বলতে হয় এষণারই ফলাফল, মনে রাখতে হয় "বাংলা ছন্দ" প্রবন্ধে তাঁর এই সতর্ক বিচার : 'বস্তুত, বাংলা গদ্যকবিতার দু-টো আলাদা ধারাই যেন দেখা যাচ্ছে : একটা রাবীন্দ্রিক রীতি, সেটা বিশুদ্ধ গদ্যের চালে আর-একটাতে মাঝে-মাঝে পদ্যের আওয়াজ দেয়; — এই দ্বিতীয় রীতি থেকে বাংলায় ফ্রী ভার্সের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।'

অবশ্য সন্দেহ নেই যে 'নতুন পাতা'য় এই নবীন ব্যবহার ততখানি স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর পরেও অনুরূপ পরীক্ষা বুদ্ধদেবে অবিরল দেখা যায় না। কিন্তু দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও এই যে তিনি অল্প সময়ের জন্য ঐখানেই ফিরে-ফিরে যান, ঐ খোলা হাওয়ার বারান্দায়, এবং নতুন-নতুন পর্বে আরো-একটু সামর্থ্য সঞ্চার করেন তার মধ্যে — সে-টাও একটা বড়ো ইঙ্গিত। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' বইতে "মধ্যতিরিশ" বা "খণ্ড দৃষ্টি" কেবলই গদ্যকবিতা, ছন্দের কোনো মহিমায় তারা স্মরণীয় থাকে না :

শুধু এতেও চলে না,
ঘরে-ঘরে পরিচারক চাই।
এই তো আমাদের কালীচরণ।
বুদ্ধি তার যেটুকু দরকার, তার বেশি নেই।
সে বাজার করে, কয়লা ভাঙে, রাঁধে বাড়ে,
দুপুরবেলায় পুরো ঘুমটুকু না-হ'লেই তার চলে না।

এই প্রাত্যহিক গদ্য অতিক্রম ক'রে যখন পৌঁছই "কলকাতা" বা "শীতরাত্রির প্রার্থনা"র মতো কবিতায় তখন আবার কানে ভেসে আসে পুরোনো সেই শ্লোকগম্ভীর চলন, আরো সংবৃত, আরো প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে।

যখন জন্ম নেয় যৌবন, নৌকোয় পাল ফুলে ওঠে,
আর দূরে, সোনালি কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে, ঝিলিক দেয় মহাদেশ,
তেমনি তুমি ছিলে আমার কাছে — অস্পষ্ট, উজ্জ্বল, অচিন্তনীয়,
তুমি, কলকাতা।

অতিথি হ'য়ে এসেছিলাম তখন, কৌমার্যের লজ্জা নিয়ে,
কিন্তু তুমি, লক্ষ প্রণয়ের নায়িকা, আমার ভীরুতা ভাঙিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার উপর, যেমন চোখের সামনে হঠাৎ খুলে যায়
অফুরন্ত সমুদ্র।

মনে পড়ে সেই সব মুহূর্ত, যখন ঘুম-ভাঙা গম্ভীর প্ল্যাটফর্ম
স'রে যেতো ঘোমটার মতো, আর ঘন্টা বেজে উঠতো আমার বুকে।
— তুমি, আবার তুমি! তোমার তীক্ষ্ণ, প্রবল পরিশ্রমী ভোর,
ভিস্তির জলে সদ্যস্নাত।

আর, অবশেষে এই রীতি পুঞ্জীভূত স্তবের মতো হ'য়ে উঠলো 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এর কবিতাগুলিতে যা আসলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র সংলাপ।

এই যে গদ্যের ছন্দে শ্লোকের সুর আর সংহতি, ব্যাপ্তি আর সুমিতি একই সঙ্গে টান-টান ক'রে ধরা, তাঁর একেবারে এই নিজস্ব ছন্দোরীতি কতটা প্রশ্রয় পাচ্ছিলো সংস্কৃত ছন্দ থেকে? দুই বিপরীত প্রান্তের মাঝখানে এই পথ পেয়ে যাওয়া কিছু কি বহিরাগত সমর্থনও পাচ্ছিলো না? 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ-প্রসঙ্গ এই সূত্রে অনিবার্যতই মনে আসে। মন্দাক্রান্তার ধ্বনিকল্লোল বিষয়ে বুদ্ধদেব লিখছেন : 'কবিতা আর মন্ত্র যখন অভিন্ন ছিলো, যখন ডাইনিপুরুতের অর্থহীন ও ছন্দোবদ্ধ প্রলাপই ছিলো কবিতা — সেই অতি দূর অতীতের স্মৃতি অবচেতনায় হানা দেয় যেন।'[১১] এই 'ছন্দের গম্ভীর আন্দোলনে'রই অনুরূপ এক ঢেউ তুলছেন কবি তাঁর এ-সব কবিতায়। ঠিক কোন সময় থেকে সংস্কৃত এই কবিতাবলির সাহচর্যে তিনি ছিলেন তা আমরা জানি না, কিন্তু 'শীতের প্রার্থনা'র পরেই তাঁর অভিনিবেশ লক্ষ করি কালিদাস চর্চায়, আর 'মেঘদূত'-এর ছন্দ-দীক্ষা যেন সম্প্রসারিত হ'য়ে এলো 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পর্যন্ত। অনুবাদের কারণে বোদলেয়ার বা রিলকের নিরন্তর সামীপ্য তাঁর উত্তরকালীন অক্ষরবৃত্তকে যেমন অনেকটা ঘনতা দিচ্ছিলো ব'লে অনুমান হয়, মন্দাক্রান্তার ব্যবহারও তেমনি নিতান্ত নিষ্ফল থাকেনি তাঁর অভিজ্ঞতায়। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে গাঁয়ের মেয়েদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা 'আকাশে সূর্যের অটল

আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু' অথবা 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এ 'যে-তুমি বিশ্বের প্রথম শিহরন, আলোর জাগরণ-মন্ত্র' মনে রেখেই যে এ-কথা বলছি এমন নয়, যদিও সে-ও একটা কারণ বটে। 'অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীর্য তাঁর নিঃশেষ' কিংবা 'উজ্জ্বল হ'লো মঞ্চ, নটনটী চঞ্চল' এ-সব রচনাও থেকে-থেকে পশ্চাদ্বলয়ে 'মেঘদূত'-এর আভা আনে, আনে তার স্পন্দনগত স্মৃতি। এই ছন্দের প্রয়োগে 'নতুন পাতা' দ্বিধামুক্ত ছিলো না, 'শীতের প্রার্থনা' সে-তুলনায় আত্মনির্ভর, কিন্তু এই এখনো-পর্যন্ত-শেষ পর্যায়ে তারও পর আরেকটি নতুন মাত্রা লাগলো প্রকরণে। কেবল শ্লেষ কবন্ধ নয়, কবিতার সূচনায় নিয়মিত ছন্দের ধ্বনি ভ'রে উঠছে, যদিও অল্প পরেই আবার খুলে নেওয়া হচ্ছে তার জাল। কখনো-কখনো এতটাই এসে যায় নিয়ম :

মুক্ত হ'লো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,
পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হ'লো প্রতীক্ষা;
শান্তার প্রতি অংশুমান, যেমন সত্যবতীর শান্তনু :
— উৎসব করো জনগণ, ধ্বনিত হোক জয়কার।

এর তৃতীয় পংক্তি থেকে 'যেমন'টুকু সরিয়ে নিলে এর পুরোটাই পাওয়া যায় পরিমিতির মধ্যে, কিন্তু তার পরেই আবার নবীন স্তবকে স'রে যাচ্ছে বন্ধন। বাঁধন এবং খোলার মধ্যপথটুকু আরো কতদূর মসৃণ হ'তে পারে, হয়তো তারও পরীক্ষা এর পর তাঁর রচনায় দেখতে পাবো আমরা। ইতিমধ্যে কেবল এ-পর্যন্ত ধরতে পারছি যে ফ্রী ভার্স বা মুক্তছন্দকে তিনি খুঁজতে চান এই বিপরীত সাধনায়, গদ্যকেই থেকে-থেকে আপাত-পদ্যের দিকে টান দেবার পরীক্ষায়, 'গদ্যছন্দের সঙ্গে পদ্যছন্দকে মেশাবার' এই মিশ্রধরনে। যেমন শিল্পকে জীবনের দিকে নয়, জীবনকেই শিল্পের দিকে আকর্ষণ করতে চান এই কবি, যেমন তাঁকে বলতেই হয় 'তোমার জীবনে এখনো ফলিত ললিতকলার রূপরস/আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান' — তেমনি বাঁধা-ছন্দ থেকে গদ্যের দিকে নয়, গদ্যকেই তিনি তুলে নিতে চান স্পন্দনমহিমায়। বাংলা কবিতার ছন্দ-অভ্যাসে তিনিও শেষ অবধি মুক্তিই খোঁজেন, তবে ছন্দোমুক্তি নয়, ছন্দে মুক্তি।

১. এই অনুচ্ছেদে, এবং প্রবন্ধের অন্যান্য অংশেও, সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি গৃহীত হচ্ছে বুদ্ধদেবকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে। দ্র° 'কবিতা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-স্মৃতিসংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭।

২. প্রথম তিনটি লাইন "দময়ন্তী" এবং পরের পংক্তিগুলি "হে কাল!" এবং "ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা" থেকে।

৩. এ-অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত বুদ্ধদেবের মন্তব্যগুলি পাওয়া যাবে 'দময়ন্তী'র ঘোষণাপত্রে।

৪. লাইনগুলি পরম্পরায় "নির্বাসন" "মরুপথ" "প্রেমিকারা" এবং "মিল ও ছন্দ" কবিতা থেকে। দ্র° 'যে-আঁধার আলোর অধিক'।

৫. দ্র° 'সাহিত্যচর্চা' বইতে "বাংলা ছন্দ" প্রবন্ধ।

৬. দ্র° কালের পুতুল'-এর অন্তর্গত "বিষ্ণু দে : চোরাবালি"।

৭. সব-কটি প্রয়োগই 'বিদেশিনী'র।

৮. "কবিতার জন্য" "কবি : লোকের চোখে, আর হয়তো — তার নিজের", "কোনো কুকুরের প্রতি", "নির্বাসন", "রাত তিনটের সনেট ২", এবং "রবীন্দ্রনাথ" থেকে।

৯. দ্র° "বাংলা ছন্দ"।

১০. 'নতুন পাতা'র কবিতাটির নাম "জন্ম"। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা "বসুধা" : 'অভিজ্ঞানবসন্ত' থেকে।

১১. দ্র° 'মেঘদূত'-এর ভূমিকা।

শীতের কাছে প্রার্থনা

সন্তোষকুমার ঘোষ

(ক)

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নিয়ে একটি রচনার ফরমাশ — চুল ছিঁড়ছি আর শাপ দিচ্ছি সম্পাদক দু-জনকে, কী মুশকিলেই ওঁরা ফেলেছেন। কাবুলিদের হার-মানানো তাগাদায় বিপন্ন আমি যে সটকে পড়লুম শান্তিনিকেতনে, তার মানে এই নয় যে, লেখাটা আমি লিখতে চাইনে, ভীষণ তাই, কিন্তু কাজে-আওয়াজে ব্যতিব্যস্ত কলকাতায় কিছুতেই কলমটাকে কাগজে উপগত করতে পারছিলুম না, তাই কাটলুম, দূরে গিয়ে মন্দবহ একটি দিনে, যাকে বলে পারস্পেকটিভ সে-টা যদি ধার পাই। আর দেখুন, পেলামও, আমার চাল্‌শের চশমা দিব্যি ঝকঝকে দেখতে দেখতে; বস্তুত এর দরকার ছিল; বুদ্ধদেব বসুর বিষয়ে লিখতে আমার হঠাৎ-গজানো প্রৌঢ়োমি থেকে ক্লীন কয়েকটা বছর ক্ষৌরী না-করলে হ'তো না।

অতএব দেনা শোধ। (দেনা? বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন 'বিধাতার দেনা', সেই দেনা?) দূর, তা কেন হবে, আমি হীনযান মহাযান কোনো-প্রকারের বৌদ্ধই কোনোকালে নই, তবু অকৈশোর তাঁর লেখা পড়ছি, পাবলিক পাঠাগারে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর বই চেয়ে নিচ্ছি, ফেরত দিচ্ছি প'ড়েই কিংবা না-প'ড়েই, বুঝেই কিংবা মাথামুণ্ড না-বুঝেই; কেননা নিতেই হবে, কেননা বুদ্ধদেব বসু তখন বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে চমকানো নাম, অনেকের কাছে সবচেয়ে চটানো নামও। অন্তত আমাদের মফস্বলের সেই লাইব্রেরির কেরানির কাছে। তিনি মানা করতেন, 'এ-বই তোমরা পোড়ো না, বরং এইটে নাও — 'বিপ্রদাস'। শরৎবাবু এই বইয়ে রবিবাবুর 'গোরা'র জবাব দিয়েছেন।' (রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র উভয়েই তখন জীবিত।)

নামটা কবে প্রথম শুনি মনে নেই। প্রাণপণে প্রভাত মুখুজ্যের গল্পের উপর দাগা বুলোই তখন, হাতে-লেখা পত্রিকা হাত চালাচালি করি, বাংলা সাহিত্যে কবে 'কল্লোল' এল, গেল, যশঃপ্রার্থী, কিন্তু তখনও শুধু নিষ্ঠ পাঠক, মফস্বলের এই ছাত্র টের পায়নি। তার বন্ধু জগৎ দাশ পেয়েছিল। সেই তো এক দিন একটা গল্পের দিকে (কী নাম যেন? বোধহয় "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন") আঙুল দেখিয়ে বলল এইটে পড়। লেখকের নাম দেখলুম বুদ্ধদেব বসু। 'সেকেলে নাম যে!' বন্ধু হেসে বলল, 'সেকেলে সব নামই তো একালে আধুনিক হ'য়ে আসছে, জানিসনে? আজকালকার নায়কদের নাম দেখিসনি, অনিরুদ্ধ, জয়দ্রথ, কিংবা পরাশর। বুদ্ধদেব বসু লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ, আধুনিক।' আমার বন্ধুদের মধ্যে জগৎই ছিল প্রগাঢ়তম বৌদ্ধ, লিখে গেলে সে এত দিনে সারিপুত্ত কি মোগল্লন নির্ঘাত হ'তো, মৃত্যুর পর তার দন্ত

অত্যন্ত যত্নে হ'তো রক্ষিত। আমিই বরং তৎকালে অচিন্ত্যকুমারে, প্রেমেন্দ্রে কি প্রবোধকুমারে ছিলাম অধিকতর আসক্ত।

'হে বিজয়ী বীর', 'যবনিকা-পতন', 'যেদিন ফুটলো কমল', 'লালমেঘ', 'বাসর ঘর' ইত্যাদি গোগ্রাসে গেলা সেকালের সেই বইয়ের পর বই! যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাবুডুবু খেয়ে এই উঠলাম, সারা চোখে মুখে ফেনা, লবণাক্ত স্বাদ তখনই নেই, খানিক পরে, আরে, ফেনাও নেই! অথচ ছিলও, বাক্য-বিন্যাসে, কথ্য-রীতির তীব্র কিন্তু প্রবহমান ব্যবহারে, তা-ছাড়া স্মৃতিতে। 'কালো হাওয়া', 'তিথিডোর' — এই সবের পা'ান্ত-আনন্দ লেগেই রইল। আর এই যে আমি সবে তৃতীয়বার শেষ করলুম 'পাতাল থেকে আলাপ', খানিকটা শুয়ে-শুয়ে, কিন্তু নায়কের মৃত্যু-মুহূর্তে উঠে বসতেই হ'লো, কয়েক মাস আগে পড়েছি 'রাত ভ'রে বৃষ্টি', 'গোলাপ কেন কালো' — কৃতজ্ঞ এই পাঠকের কাছে লেখকের প্রাপ্য কিছু কি নেই? সেই জন্যেই বলেছিলুম 'দেনা'। সেই দেনা শোধ করতে বসেছি।

(খ)

সেই নায়কেরও বয়স তবে ষাট হ'লো? ভাবাই যেত না, যদি-না সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ত, এই লেখকও প্রায় পঞ্চাশ ধরো-ধরো। সময় কাউকে রেয়াত করে না জানি, কিন্তু জব্দই বা করতে পারে কতটা! ষাট বছরটা কিসের হিশেব, কিসের প্রমাণ? সময় জব্দ করতে পারে বড়ো জোর শরীরকে, কারণ শরীর ডালপালার মতো, মাথা পেতে ঝড় ঝাপটা সয়, কিন্তু শিল্পীর অস্তিত্বের সঞ্চয় তার শিকড়ে; অথবা শরীর শুধু সিন্দুকের ডালা, তারই পিঠে তেল-কালি ঝুল-ধুলো পড়ে; পড়ুক না, কী এসে যায়, ভিতরের সম্পদ যদি অব্যয়িত থাকে! ভয় হতো, যদি দর্পিত একটি অস্বীকৃতি হঠাৎ অথর্ব হ'য়ে যেত, জরা জীর্ণ করত একটি গারুড় অস্থিরতাকে, ন্যুব্জ হ'তো কঠিন ঋজু একটি ভঙ্গি। এমন তো নয়, বুদ্ধদেব উনষাট বছর অবধি যা-লিখছিলেন, ষাটে-একষট্টিতে তা লিখবেন না, তা হ'লে তাঁর ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষে না-হয় জোরদার শোকোৎসব করা যেত। কিন্তু আমার ধ্রুব ধারণা, এঁর ক্ষেত্রে মাইল-ফলক গতির যতিচিহ্ন হবে না। আর, বয়সটা তো শুধুই সংস্কার, কিংবা একটা হিশাবের সুবিধা, মাঝে-মাঝে পাশ বই দেখার মতো; জমা কত, কত খরচ : কোন্ ইনসুরেন্স কবে মেচিওর করল।

'কলকাতা' কাগজ যতই ঢাক পিটিয়ে তাঁর বয়সটাকে রটাক, বুদ্ধদেব নিজেকে বলতে পারেন — তাঁর জমার ঘরে যথেষ্ট। যদি মনে পড়িয়ে দিই, এটা পূরবী'-র বয়স, যে-বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বিজয়া"র দেখা পেয়েছিলেন তবে সে-টা খেলো ফক্কুড়ির মতো শোনাবে। বরং বলা যাক, "ষাট ষাট!"—এই ষাটেই বুদ্ধদেবের 'বিজয়া'—দূর! এখনও তো তাঁর বৈজয়ন্তীর পালা চলছে। বলতে বাধা নেই, সমকালীন লেখকদের মধ্যে তিনি বিরাট একটি ব্যতিক্রম, আঙুলে পুরনো ঘি-য়ের গন্ধ নন; নন টাটকা ফুলে ঢাকা পূজ্য একটি পট। তিনি অত্যন্ত জীবন্ত, সর্ব অর্থেই, কবিতায়, প্রবন্ধে, তাঁর নতুন-ভালবাসা নাটকে, প্রাচীন-শিখা কথাসাহিত্যের কাছে পুনরাগমনে, সর্বোপরি তাঁর সর্বত-লেখকসত্তায় ও ব্যক্তিত্বে, একটি সজীব-নবীন সাহিত্য-গোষ্ঠীর কুলপতিত্বেও। ভার্সাটিলিটিরূপী বহু-বিবাহ বহু লেখকের পক্ষেই অবক্ষয়ী প্রাণপাত শ্রম, বুদ্ধদেব সৌভাগ্যক্রমে এই দায়ভারে ক্লান্ত নন। এই রচনার বিষয় তাঁর উপন্যাস।

'সাড়া'য় যিনি নিষ্কলঙ্ক শূন্যে সঞ্চারী, অধুনা যদি তিনি পাতালে আলাপ-রত, মনে রাখা ভালো, এই অবরোহণ আসলে ক্রমিক, এবং অলীক স্বর্গ থেকে বিদায় স্বেচ্ছা-নির্বাচিত।

(গ)

এইমাত্র 'সাড়া' উপন্যাসটির পাতার পর পাতা তাড়াতাড়ি উলটে গেলাম, কখনও একটু-বা থেমে; কখনও শুধুই চোখ বুলিয়ে। সেই শেষ-কুড়ি বা শুরু-তিরিশ দশকের গন্ধ! আগেই বলেছি, তরুণ বুদ্ধদেব সম্পর্কে লিখতে গেলে আমার কিশোর হ'য়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল। শুরুতেই এই বই যদি বেছে নিয়ে থাকি, তবে তার হেতু বইটি "তাঁর উপযুক্ত বলে নয়, প্রথম বলে" [উৎসর্গ দ্রষ্টব্য]।

বেশ মজা লাগল নতুন সংস্করণের ভূমিকা-প্রসাদে যখন জানলাম, এই রক্তাল্প, পীত, অতিমাত্রায় পরিমিত গ্রন্থটিও নাকি কোনও কালে অশ্লীল ব'লে কথিত হ'তো! বিস্ময়ের কিছু নেই, সূতিকায় কোন্ শিশুই বা শ্লীল, অপিচ মনে রাখবেন, সে-কালে বাংলা কথা-সাহিত্যের সেই মধ্যযুগে পাঠক-রুচিও ছিল মধ্যযুগীয়। ইতিহাসে কি পড়িনি যে, মধ্যযুগের রীতিই ছিল ওই, লঘু পাপে গুরু দণ্ড, দোষীদের হাত-পা কেটে সেকালে সাজা দেওয়া হ'তো।

বেশ মজা লাগল, হঠাৎ এই অনুচ্ছেদটি প'ড়ে :

> ভদ্রলোকের মুখখানা দিব্যি গৌরবর্ণ, বড়ো-বড়ো চুল ঘাড়ের কাছে কোঁকড়ানো, গায়ে নীল খদ্দরের পাঞ্জাবি, পায়ে সবুজ নাগরা, চোখে একটা প্যাঁশনেও আছে। প্রতিটি অঙ্গ লীলায়িত করিয়া দিয়া নিতান্ত অলসভাবে সে একটি সোফায় গা এলাইয়া দিয়াছে।

উদ্ধৃতি যে 'সাড়া' উপন্যাস থেকে, সেটা ব'লে দেবার দরকার ছিল না। বাংলা গল্পাদি পড়া-টড়ার অভ্যাস যাঁদের আছে, তাঁরা এমনিতেই ধ'রে ফেলবেন, লাইনগুলোর বয়স প্রায় চল্লিশ হ'য়ে এল। ওই 'প্যাঁশনে' শব্দটিই ধরিয়ে দেবে। তখন বাবুয়ানার বর্ণনায় ওই উপচারটি ছিল অবশ্যম্ভাবী। আর ঘাড়ের কাছে ওই কোঁকড়ানো চুল! 'ভারতী'-যুগের সম্ভ্রান্ত-শৌখীন কোনো-কোনো লেখকের আলেখ্য আপনা থেকেই আবার আঁকা হ'য়ে যাবে। আর মনে পড়বে, বঙ্গজ ভদ্রতনয়দের মধ্যে এক কালে নাগরা (সুবজ, অবুঝ যাই হোক) লপেটা এই সব পরার খুব চল হয়েছিল বটে। আর ওই খদ্দরের (তা-ও নীল!) পাঞ্জাবি — এক কথায় অ্যাট্রোশাস্! বিশেষ একটি প্রভাবশালী দল বা গ্রামোদ্যোগী মহলের বাইরে একালে ক'জন স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীরে খদ্দর পরেন জানিনে।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে এই রকম, যাকে বলে, আভ্যন্তর সাক্ষ্য, যে-সাক্ষীরা সত্য বই মিথ্যা বলে না। হুঁশ করিয়ে দেয়, তখন জীবন, মন, এইসব কত জটিলতা-মুক্ত ছিল। সেটাও যখন একটা যুগ, তখন যন্ত্রণাও ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু 'যুগ-যন্ত্রণা' জাতীয় কদাকার কোনও বাক্যবন্ধ রচিত হয়নি। যার যার যন্ত্রণা, তার-তার, কোনও যুবক কিংবা যুবতীর, ক্রুশের মতো একক স্কন্ধে বাহিত, তীক্ষ্ণ তীর হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ, অথবা কোনও করুণ সোলো গান, যন্ত্রণা মানে সাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া কোরাস না। প্রেমে পতন, মূর্ছা, উত্থান বা মৃত্যু, সবই নির্ধারিত সরল পথে বাঁধা ছিল।

এগিয়ে যাই। যে "দীপোজ্জ্বল দোতলা বাড়ির ড্রইং রুমের" মেঝেয় লাল ফুল-আঁকা কার্পেট; যে-বাড়ির মেয়ে ফুরফুর ইংরাজীতে কোনো কবির লেখাকে বলে 'ডেইন্‌টি ভর্স', যখন দেখি সে-বাড়িটি ভবানীপুরে, তখন চমক লাগে।

মনে পড়ে তখনও ভবানীপুরের দক্ষিণে মহানাগরিক ভূনির্মাণ শুরু হয়নি, পলিস্রোত রমেশ মিত্র রোড বা হাজরা রোড পর্যন্ত এগিয়ে ঠেকে আছে; নিউ আলিপুর যদি থাকে তো শুধু নলিনী সরকার মশাইয়ের মগজে। পুরনো আলিপুর আর পুরনো বালিগঞ্জ মধ্যবিত্ত কল্পনায় অনধিগম্য, চৌরঙ্গির পূর্বাঞ্চলও ফিরিঙ্গি কবলিত, সুতরাং আউট অব বাউণ্ডস্‌।

সেই হেতু ভবানীপুর, ভবানীপুরই সই। লিভিং রুম কথাটা তখনও এ-দেশে আসেইনি, অপ্রতিহত প্রভাবে চলছে ড্রইং রুম, সেখানে আপ্যায়নে সততই চা, অন্য পানীয় দূরে থাক, কফিও না।

কিংবা ধরা যাক, নোয়াখালিতে ভাদ্র-অমাবস্যায় "শর" আসার সেই বর্ণনা :

> বঙ্গোপসাগর তাহার কন্যাটির এই দৈন্য সহিতে পারে না. প্রবল যৌবনের মতো সে জোয়ারের ঢেউ পাঠাইয়া দেয়. বজ্রের শব্দ ও বিদ্যুতের বেগ লইয়া তাহা উন্মত্ত আগ্রহে ছুটিয়া আসে. নিমেষে মরা নদী কূলে কূলে কালো হইয়া দুলিয়া ওঠে. দূরের তটরেখার সমস্ত চিহ্ন প্রবল ঢেউগুলির ক্ষুধিত জিহ্বা চাটিয়া মুছিয়া নেয়। নদী তখন গর্জ্জিয়া কুঁদিয়া. মাথা খুঁড়িয়া আছড়াইয়া পড়িয়া কী যে করিবে এবং না করিবে তাহা যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না।

এই পংক্তি কয়টি অনায়াসে হ'তে পারত পিতামহ রবীন্দ্রনাথের। অথবা

> ব্যোমকেশ গরম চায়ে গলা ভিজাইয়া লইয়া একটা আরাম-সূচক গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, হ্যাঁ ছোটই তো!

— পিতৃব্য শরৎচন্দ্রেরও হ'তে পারত। পরবর্তীকালে একমাত্র কথ্যরীতির সেবক বুদ্ধদেবও যে প্রথমে অ-কথ্য রীতিরও সাধক ছিলেন, সেটাও কম মজার নয়। মনে রাখবেন, কাঁচা বয়সে প্রমথ চৌধুরীরও পাকা সাধুবেশ ছিল।

অতএব গুজবে কান দেবেন না। যাই রটুক, বিদ্রোহী নবীন-বীর অভ্যুত্থিত হ'য়েই স্থবিরের শাসন-নাশনের হুঙ্কার দেননি, অন্তত গদ্যে। (রবীন্দ্রনাথেরও গোড়াকার গদ্যরীতি, কী আশ্চর্য, বঙ্কিমের সঙ্গে হুবহু মেলে।) বুদ্ধদেবের বয়স তখন কত আর, কুড়ি-বাইশের বেশি না, টীন-এজার নাম খণ্ডিয়েছেন সবে, কিন্তু ডাকসাঁইটে ভালো ছাত্র, তার প্রমাণ 'সাড়া' বইয়ের নানা ছত্রে, নায়কের মুখে প্রলাপের মতো শেক্সপীয়র (কিন্তু সে কপোত-বুক। নিমচাঁদ আদৌ নয়), সাহিত্য-সাম্রাজ্যের অধীত অধীশ্বরেরা তার ধ্যানে অনুভবে সর্বক্ষণ উপস্থিত, তার সর্বস্বত্বের দখলদার।

সেই যুবকেরা কোথায় গেল যারা রাতভোর পায়চারি করে ছাতে, যাদের "শরীরে রাত্রির স্পর্শ", "চেতনায় বিশ্বের চুম্বন"? চিন্তা রুদ্ধ, সত্তা লুপ্ত, অন্তহীন মুহূর্ত, চিরন্তন জীবন, — শব্দের পর শব্দ, একটি নির্বস্তুক, মরমী, মনোময় জগৎ, যে-জগতে হতাশ প্রেমিক গ্যাসের আলোয় প্রণয়িণীর অপার্থিব শাদা শাড়িটিকে ফেনার মতো ফুলে উঠতে দ্যাখে, আর অব্যর্থ ঝাঁপ দেয়? তাদের আর দেখি না, তারা কোনো কালে ছিল কিনা জানি না, কিন্তু থাকলে বেশ হ'তো; নতুন ক'রে পড়ার পরও যদিও মনে হয়েছে অবিশ্বাস্য, তবু অলীক আতরে ঘ্রাণশক্তি ছেয়ে গেছে, মনে হয়েছে ওই নায়কের মতো অসম্ভব আত্মহননের মধ্য দিয়ে আত্মাকে মুক্ত করা গেলে অস্তিত্ব আরও শুদ্ধ হ'তো।

শিথিলভাবে গ্রথিত ঘটনা-পরম্পরা, কখনও সন্দেহ হয়, হয়ত-বা পরিকল্পনাহীন, সেই কারণেই খাপছাড়া, মাঝে মাঝে টপ্‌কে-চলা। চরিত্রগুলিও প্রায় অ-প্রকৃত, রক্ত আছে তো মাংস নেই, রগ যদি থাকে তবে হাড় নেই — এই 'সাড়া'।

বউ মণিমালার কাছে যত ওস্তাদিই সে ফলাক, সাগর বস্তুত সুবোধ; সরলমতি না-হ'লেও সরলগতি, পরিণামে নিহত।

নিহত? সে-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হ'তেই বা পারছি কোথায়? 'সাড়া'র সাগরের মধ্যে বুদ্দেবের উত্তরকালীন প্রায় সকল নায়কই ভ্রূণরূপে প্রত্যক্ষ। তারা বহির্বিমুখ, ভয়ংকর শৈত্যে জর্জরিত, আপাতদৃষ্টিতে কূর্মবৎ আবৃত। দৃষ্টি স্পর্শ ঘ্রাণময় ধরিত্রীতে তারা শ্বাস-প্রশ্বাস অবশ্যই নিচ্ছে, কিন্তু যেটুকু ন্যূনতম প্রয়োজন তার বেশি না। গল্প সাজাতে ন্যূনতম যেটুকু ঘটনা চাই তার বেশি না। একটি আঘাত চাই, ধরা যাক কোনো শব্দতরঙ্গ, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ইথরের পর ইথরের বলয় মহাকাশ ব্যেপে বিস্তৃত হ'তে থাকল। একটি কেন্দ্রবিন্দুর চার পাশ ঘিরে অসংখ্য উর্ণাতন্তু, সে-ও এক চমৎকার পরমাশ্চর্য শিল্প, স্পর্শকাতর, কখনও কখনও ক্লান্তিকর, তবু পরিশ্রমী পাঠক এক মায়াবী জগতের মোহে জড়িয়ে যান, পুরস্কৃতও হন পরিণামে, সেই পুরস্কার ফিরিয়েও দেন লেখককে, স্নায়ুতন্ত্রী তখন নিঃশব্দে ঝনঝন বাজে। বস্তুত এই জাতীয় সব কাহিনীই নির্বস্তুক, 'বস্তু' বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি সেই অর্থে। অথবা বস্তু যদি-বা আছে তা অনিরীক্ষ্য তলের শীতল, কঠিন শৈলে, উপরে পুঞ্জপুঞ্জ ফেনা, আর ভাবনার ঘূর্ণি।

বুদ্ধদেব নিজে বলেছেন এ-টা তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস-চরিত্রের সামান্য লক্ষণ। এই চরিত্রেরা যদি-চ মাঝে বাইরের দিকে চায়, তথাপি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। হয়ত পিতার স্বভাব উত্তরাধিকার-সূত্রে পুত্রে বর্তেছে। বুদ্ধদেব কদাচিৎ রাজসিকতার ভঙ্গী করেন বটে, কখনও ইঙ্গিতে কখনও দিব্যি জমিয়ে যৌনসঙ্গমাদির ছবিও আঁকেন, (একটা গল্পে তো সাহস ক'রে 'পেশাপ' করাও লিখেছিলেন মনে পড়ছে) তবু আসলে তিনি জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন দীর্ঘকাল, আমরা যাকে বলি তাকে, ফলে বাইরের রূঢ়, রুক্ষ, কাঁকরে-ধূলিতে কর্কশ বিশ্বের ছায়াপাত তাঁর শিল্পে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর রচনার স্থায়ী, সম্বাদী সুরটি, যিনি যাই বলুন, রমণ নয়, মনন। যে ছুটতে পারেনি সে ডুব দিয়েছে।

বুদ্ধদেব বিচলিত হবেন না, এখানে তাঁর সঙ্গী অন্য এক পূর্বসূরী, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি তো ব'লেই দিয়েছিলেন, যা ঘটে তা সব সত্য নহে। সূক্ষ্ম বস্তু বা বক্তব্য নিয়ে আস্ত আস্ত নাটকই লিখে ফেলেছিলেন কয়েকটি, বাঙালী পাঠক সেদিন সে-সব চেয়েও দেখেনি, আজ সবে চেখে দেখছে। বিষয়-আশয় যা-ই থাক, রবীন্দ্রনাথ কথাশিল্পে 'বিষয়ী' ছিলেন না আদৌ, আমরা জানি, তাই কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি, সমবায়-আন্দোলন, শ্রীনিকেতনে হাতে-কলমের বিদ্যায় হাতে-খড়ির আয়োজন সত্ত্বেও বলব, রবীন্দ্রনাথ বাইরের জগৎকে তাঁর নিভৃত সাধনায় প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন, তাঁর রচনার শ্রী-নিকেতনে অন্তত ঘটনার ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, ঘাত-প্রতিঘাতে রুদ্ধশ্বাস কাহিনী-বিন্যাসের কোনও স্থান ছিল না। অন্যান্যদের প্লট ধার দিতেন বলে শোনা যায়, কিন্তু নিজে সে-সব জমি ব্যবহার করেছেন কদাচিৎ, ডুবতে রাজী আছে তার ও-সবের দরকারও হয় না, সে তাকেই মূল্যবান জ্ঞান করে যে-অভিজ্ঞতা আন্তর; অন্য উপাদানের প্রতি একটা বিমুখতা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাকাতেন বাইরের দিকে, তাই তাঁর লেখায় খালি তারা, ফুল, পাখিরাই ভিড় ক'রে এসেছে বারে-বারে, চোখ ভ'রে দেখেছেন তাদেরই, নয়ত

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ভিতরে, সে-ও একটা অলৌকিক জগৎ, রোমাঞ্চিত, উল্লসিত, আহত, বেদনার্ত, কিংবা নিঃসঙ্গ, সেখানেও ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, জলোচ্ছ্বাস অহরহ ঘটে। বাইরের জগতের বেধ-বিস্তার-পরিধি প্রভৃতির পরিমাপ আছে; মনের থৈ নেই।

জানালা থেকে দেখা জগৎ আর দুয়ার থেকে বেরিয়ে পড়লে যে-জগৎ, এ-দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। দুনিয়ার দুই জাতের কথাসাহিত্য এই বিভাজন রেখায় চিহ্নিত হ'য়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্তর্লীন মিল সম্পর্কে অবচেতনায় অবহিত ব'লেই বুদ্ধদেব বারবার চ'লে যেতে চেয়েও ফিরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, শান্তিনিকেতন কখনও তাঁর চোখে হ'য়ে ওঠে 'সব পেয়েছির দেশ', কখনও-বা বাইশে শ্রাবণের বিষণ্ণ সন্ধ্যাটিকে হাহাকারে ভ'রে তোলেন, যেমন 'তিথিডোর'-এ। যেখানে কবির মৃত্যুদিনে "সত্যেন চোখ তোলে স্বাতীর মুখে, চোখ নামায় মেঝেতে। বলে, 'রবীন্দ্রনাথ' — আর বলতে পারে না।"

সত্যেন পারল না ব'লেই আমরা বলতে পারছি, উভয়ে এক নন, কিন্তু সগোত্র। অন্তর্মুখী যাঁরা তাঁরা সবাই যে ঋষিমশায় হ'য়ে বসবেন পূজায় রবীন্দ্রনাথের মতো, এমন কথা নেই, কেউ কেউ হয়ত '৯'কারের মতো ডিগবাজি খাবেন, কিন্তু ভঙ্গি থেকে মিলটা ধরা যাবে। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' এই স্রোত মূল-গঙ্গা নয়, অন্তঃসলিলা মাত্র, তবু বুদ্ধদেব বসলেন তারই ভাটিতে, যখন ধূর্জটিপ্রসাদও এ-পথে আসেননি। মোহনায় বুদ্ধদেব পৌঁছাতে পারলেন কি না-পারলেন, সে-সব তল্লাশ পরে নেব, আগে এই সাহসের তারিফ করি।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, বুদ্ধদেব একটু আগে এই পথ ধরেছিলেন, ইংরাজিতে Too-দিয়ে যা বোঝানো হয়, সেই এক-টু। তখন তিনি একা, দীর্ঘকালই ওখানে একা, একালের চালু ভাষায় যাকে বলে বিচ্ছিন্ন, অ্যালিয়েনেটেড। 'কল্লোল'-এর সঙ্গে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়, সে-টা নেহাতই একটা সমসাময়িকতা, অ্যাকসিডেন্ট, এই আবহাওয়ায় তাঁর লেখক-সত্তা জাত, কিন্তু ওই মেজাজে লালিত নন, স্বেচ্ছায় অথবা অগত্যা স'রে এসেছিলেন নিজেই, তৈরি ক'রে নিলেন নিজস্ব একটি তারামণ্ডল, যেখানে তিনি সমান-হৃদয়পরিবৃত, স্বচ্ছন্দ, সহজ। এই পর্বে গল্প-উপন্যাসের চেয়ে প্রবন্ধ আর কবিতাই যেন অধিক দেখি। আধুনিক বাংলা কাব্যসৃষ্টির মাতৃসদনে যিনি অক্লান্ত প্রসূতি, তিনিই আবার অন্যের অপত্যদের বেলায় কর্তব্যপরায়ণ ধাত্রী — এই অনলস অবেতন সেবার ক-টি উদাহরণ আছে জানি না। অধ্যাপনার ছোটো বড়ো ইন্টারল্যুড বাদ দিলে তিনি আমাদের সাহিত্যে বলা যায়, অনন্য হোলটাইমার। একটি ব্যক্তি কখনও-কখনও সংস্থা হ'য়ে ওঠেন, বুদ্ধদেব তার দৃষ্টান্ত।

(ঘ)

নামে খ্যাতি আছে অথচ রচনার খাতির তেমন নয়, এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব আবার তাঁর পাশে, অথবা তাঁর আগের সারিতে পাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথকে। কথাবস্তুতে নিরাকারের উপাসক আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম। প্রথম, কিন্তু একই সঙ্গে উৎসাহী ও উদাসীন পাঠককুলের পক্ষপাতিত্বে প্রভাত মুখুজ্যে শরৎ চাটুজ্যেদের কাছে পরাস্ত। এখন প্রবীণকুলে আছেন বুদ্ধদেব। তিনিও, বলেছি, একটু তাড়াতাড়ি শুরু করেছিলেন। তাড়াতাড়ি কেন? না, তখনও উপযুক্ত আসর তৈরি হয়নি। তৈরি হয়তো হয়নি আজও, এখনও তুকতাকেই তালি বাজে বেশি, তবু অনুসারী পূজারী জন-কয়েক তো এসেছেন। আগে, বুদ্ধদেব যখন আসেন

তখন, কেউ ছিলেন না। ইতিহাসের পরিহাস, নতুনেরা যখন এলেন, আসছেন, তখন পূর্বগামী বুদ্ধদেবের সেকালের বহু গ্রন্থই বিস্মৃত, এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তালিকায়। এ কি কালধর্ম, এ কি শুধুই অহংকৃত উত্তর পুরুষের পিছন-ফিরে তাকানোয় অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, উপেক্ষা? একটি বা দু-টি জেনারেশন-গ্যাপ, প্রজন্মের পার্থক্য ইতিমধ্যে কি ঘ'টে গেল?

অনেকটাই তাই, তবে সবটা নয়। খতিয়ে দেখি, অন্য হেতু ছিল কি না। বুদ্ধদেবের লেখায় মাটির গন্ধ নেই এ-টা এককালে ছিল একটা মামুলি ফরিয়াদ, আসলে বুজরুকি। মটির গন্ধই সেরা গন্ধ একথা কোন্ শিল্পতত্ত্ব কোন্ নন্দনশাস্ত্র কবে বলেছে! ফুলেব গন্ধও গন্ধই, আর রৌদ্রের যে-গন্ধ ডানা থেকে চিল নিরন্তর মুছে ফেলে তার কথা নাই তুললাম।

বুদ্ধদেবের গল্প-উপন্যাসের চরিত্র — 'এদের তো চিনি না, বা কখনও দেখিনি', এই নালিশও খারিজ করছি। আমাদের সংকীর্ণ শম্বুক জীবনে ক'জনকেই-বা আমরা চিনি। লেখকেরা তাই প্রায়শ এমন নানা চরিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন যারা নেই, কিন্তু থাকতে পারত, যাদের মতো ক'রে কেউ হয়তো ভাবে না, কিন্তু ভাবতে পারত। তবে কি গল্পে চাই গ্যাসবুনানি? সেদিকেও বহুদূর অবধি বহুকাল এগিয়ে সৎসাহিত্য জেনে গেছে ও-রাস্তায় হাঁটার মানে হয় না। ঘটনাই যদি আসল সাব্যস্ত হয় তবে উচ্চাভিলাষী লেখায় ইস্তফা দেওয়াই ভালো, কারণ অঘটন-ঘটনপটীয়ান গোয়েন্দা-গাল্পিকদের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারব কেন? আর, সাহিত্যের মূল শর্ত কদাচ বহিরঙ্গজীবনের যথাযথ বর্ণনাও হ'তে পারে না, কারণ চাষের জমি, খনি কি কলকারখানার আগমার্কা বৃত্তান্ত আমাদের চেয়ে ভালো দিতে পারবেন কোনো সম্পন্ন খামারের মালিক, লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রভৃতি। সে-সব রচনা বড়ো জোর সাংবাদিকতার টঙ অবধি উঠতে পারবে, তার উপরে না। তার চেয়ে উচ্চস্তরের সত্যে পৌঁছে দিতে পারে ব'লেই সাহিত্যকে বলি সাহিত্য। খনি জমি ইত্যাদি পটভূমি মাত্র, বসবার ঘরে আবিষ্ট নট নড়ন-চড়ন কোনো চরিত্রের ভাবনাও হ'তে পারে মহৎ শিল্পমূল্যে অন্বিত।

বুদ্ধদেবের গোড়াকার কিছু-কিছু গল্পে উপন্যাসে বিদেশী বইয়ের গন্ধ, স্বীকরণের শ্রমটুকুও সর্বদা স্বীকৃত হয়নি, এই আপত্তিও অনর্থক। জিজ্ঞাস্য, এ-গন্ধ আমাদের প্রধান কোন্ লেখকের রচনায় নেই? অতএব এই হেতুই বুদ্ধদেব প্রাপ্য সমাদর থেকে বঞ্চিত হননি। অন্য হেতুও নিশ্চয় আছে। তাই হাতড়ে খুঁজছি, যে-বুদ্ধদেব বহতা কালের জলে নৌকো বেয়ে এদিকে এতদূর এসেছেন, অতীত থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বর্তমানের দিকে, বর্তমান থেকে আবার সেই হাত প্রসারিত ভবিষ্যতে, সেই, সময়ের সঙ্গে সন্ধিকামী, বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নির্বস্তুকতা ছাড়া আর কোনো ঘাট ছিল কিনা। চলতি কথায় যাকে বলি মনন, তার মানে তো এই যে গভীর থেকে গভীর স্তরে খুঁড়ে-যাওয়া, যদি খনিতল থেকে কোনো প্রতীতির, কোনো অপরূপ উপলব্ধির উজ্জ্বলন্ত ধাতুপিণ্ড উঠে আসে! তা কি উঠে এসেছে, না কি আসেনি, তুলে আনা ইষ্টও ছিল না ব'লে অত কথা, কথার পর কথা, উপরিতলে বুদ্বুদের মতো বুড়বুড়ি কেটে মিলিয়ে গেল! ঘটনা উপলক্ষ হোক ক্ষতি নেই, প্রয়াসী লেখকের পার্থিব বা আলৌকিক কোনো-না-কোনো লক্ষ্য থাকে। ভূলোক থেকে বুদ্ধদেব উড্ডীন হয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, অথচ দ্যুলোকে উত্তীর্ণ হননি, সেই কারণেই হয়তো দ্যুলোক ভূলোক এই দুই ভুবনের মাঝখানে দুলছেন, ঝাপটাচ্ছেন অস্থির অনিশ্চিত, অশান্ত ডানা। সন্দেহ হয়, একটি স্থিতি তিনি কোথাও পান না — আমরা কে-ই বা পাই — আজও রমনা তাঁকে পিছন থেকে টানে, পাশ্চাত্য সামনা থেকে

দেয় হাতছানি, মাঝখানে আছে কলকাতা, একদা তাঁর চোখ-ধাঁধানো কলকাতা — বলা শক্ত রক্ষিত কে কার। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা অনেকেই দিতে পারিনে, গর্ভফুল পড়েনি অথচ বিভূমিতে উৎক্ষিপ্ত আমাদের গলায় আর্ত বাচ্চার চিৎকার।

কিন্তু বুদ্ধদেবও ফিরে আসছেন, নেমে আসছেন নীচের নির্ভরযোগ্য মাটিতে, অথবা সন্তরণ-ক্লান্ত, ধীরে-ধীরে চাইছেন ডাঙার দিকে। এই অবরোহণ আগেই আভাসিত ছিল, ধরা যাক 'কালো হাওয়া'য়, অথবা 'তিথিডোর'-এ। বৃহৎ উপন্যাস কখনও-কখনও আপনকালের দলিল হয়, তবেই সে বৃহত্ব ছাড়িয়ে মহত্ত্বের মর্যাদা পায়, 'তিথিডোর' তিরিশের শেষ আর চল্লিশের শুরুর কলকাতার পরিশীলিত একটি বিশেষ সমাজ-মানসের দলিল, যে-দলিল উঁই আর ইঁদুরের ব্যবহারে আজও জীর্ণ হয়নি। ইতিমধ্যে আমরা চ'লে এসেছি 'পাতাল থেকে আলাপ', 'রাত ভ'রে বৃষ্টি', 'গোলাপ কেন কালো' এই নবতম পর্বে, যা নবতর উন্মোচনের অপেক্ষা রাখে। আরে কী আশ্চর্য, কাহিনীর আঁটো-সাঁটো বাঁধুনিও এগুলোতে পাচ্ছি, 'গোলাপ কেন কালো' তো ঘটনার বিন্যাসেও অতি পরিপাটি, আর 'পাতাল থেকে আলাপ'-এ নায়ককে তো প্রায় সনাক্তই করা যায়। একই সঙ্গে আশা আর স্বস্তির কথা এই পর্বের উপন্যাসেও সেই আশ্চর্য কারুকৃতি, সেই প্রবাহ আর ভাষা এবং ভঙ্গি, যা তাঁরই নির্মাণ।

অতএব পালাবদল ঘটছে, সমকালের ছোপে তা কতটা রঙীন সেটা আদৌ বিচার্য নয়, বিচার্য অতিরিক্ত কী পেলাম। আঙ্গিকের চাতুর্য? ঠিক। সময়কে এই চাতুরী অলৌকিক সোনার জলে গুলিয়ে মিশিয়ে দেয়, টেরও পাই না কোন্ অনুচ্ছেদে কোন্‌কালে আছি। তবু সব ছাপিয়ে একটি অপেক্ষা থাকে, যেহেতু বুদ্ধদেব এখনও অনিঃশেষ। কথাকে শিল্প করেছেন যিনি, তিনি কথার মতো কথাকে শিল্পে আনুন না, এই প্রার্থনা। যদিও অনুমান করি, সাহিত্যকে কিছু বলতেই হবে এ-তত্ত্বে বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন না, লেখা তাঁর মতে হয়তো অনুকম্পিত অনুভূতি, তবু প্রতীক্ষা করছি। কবে সব পরীক্ষার শেষে বুদ্ধদেবও তাঁর জানা কিছু-না-কিছু জানিয়ে দেবেন, বলবেন — 'আমার কিছু কথা আছে।' সে-কথা পাঁচসালা যোজনা মার্কা ভীম-ঘোষণা নাই-বা হ'লো, হোক-না তা আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কিন্তু একটি তাৎপর্যে যেন হয় বিধৃত। এই চল্লিশ বছর ধ'রে — তাঁর লেখালেখির বয়স মোটামুটি তা-ই — কোনো-না-কোনো বিশ্বাসকে তো তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন! বুদ্ধদেব যদি অবশেষে মাত্র এই আপাততুচ্ছ কথাটাও উচ্চারণ করেন 'সে আমার প্রেম', আমরা সম্মত আছি।

....

তোমার গল্পের বিশেষত্ব এই যে, যেখানে শেষ হোলো বই, গল্প রয়ে গেছে তার পরের দিকে। তুমি দেখালে বান ডেকে আসছে, তারপর বললে, বাস্ আর দরকার নেই, ভাঙচুর সুরু হবে সে তো ধরা কথা, অলমতিবিস্তরেন। তুমি দেখালে বানটা সর্বনেশে, তার সৌন্দর্য আছে, তার মহিমা আছে, সে নির্মল তবু সে ভীষণ, দেখালে প্রবল ভালোবাসার আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের মধ্যেই অনিবার্য হিংস্রতা। যুগ্মজ্যোতিষ্কের পরস্পর আকর্ষণের মধ্যে যে দূরত্ব থাকলে তাদের যুগলযাত্রা নিরাপদ হতো, আবেগের দুর্দমতায় সেইটে কমে গিয়ে আসন্ন প্রলয় সংঘাতের আশঙ্কা উগ্র হয়ে উঠল। এই তোমার গল্প-না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছ সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে। ...

'বিচিত্রা' অগ্রহায়ণ ১৩৪২ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ অক্টোবর, ১৯৩৫

শ্লীলতা অশ্লীলতার অবান্তর প্রসঙ্গে

'সাড়া' থেকে 'যমুনাবতী'

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

ছোটোগল্প উপন্যাসে মিলিয়ে বুদ্ধদেব বসুর তিরিশটি বই সম্প্রতি আবার প'ড়ে উঠলাম। আমার এই রচনার বিষয়বস্তুই ছিল গ্রন্থগুলিতে আমার অন্বিষ্ট। হাতে পেন্সিল এবং টেবিলে মাপ ক'রে কাটা কাযকাগজের ফিতে জড়ো ক'রে পড়া শুরু করেছিলাম; কিন্তু পেন্সিলের অগ্রভাগ এখনো যথাপূর্ব তীক্ষ্ণ, এবং কাটাকাগজের অব্যবহৃত স্তূপ কাল ঝুড়িতে ফেলে দিতে হয়েছে। ভগ্নমনোরথ আমি প্রতীক্ষা করছি, হায় কোথায় সেই কুখ্যাত অশ্লীলতা, যার গল্পই কেবল লোকমুখে শুনলাম, কোথায় সেই বঙ্গযুবকের বীর্য এবং বঙ্গসতীর পবিত্রতা পাত ও নাশকারী বিষ যা মোচন করার উপায় ছিল নবজাত লেখকের আঁতুড়ঘরেই, যদি কেউ সেই দানবশিশুকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারত। ভারতভূমিতে এখনো অনাগত ফ্যানি হিল, তোমার কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে; এই তিরিশটি বই মনোযোগ সহকারে পাঠ ক'রে কী অপিরিসীম হতাশাই তুমি বোধ করতে!

আমার অন্বিষ্টের সন্ধান না-পেয়ে আমি কিন্তু তৎক্ষণাৎ উদ্যোগী হ'য়ে এই রচনায় হাত দিইনি। মনে পড়ল আমার বয়েস হয়েছে, হচ্ছে; কৈশোরে বীর্যরক্ষাকারী ধর্মপুস্তক পাঠে যে-সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত ছিল, তা হেলায় নষ্ট ক'রে পঞ্জিকায় নানাবিধ সালসা এবং বাদশাহি হালুয়ার মনোরম বিজ্ঞাপন প'ড়ে নিজেকে বখিয়েছি; কলেজে উঠে ঘোরতর অশ্লীল চসর-শেক্সপীয়র-পোপের প্রভাবে নীতি ও সুরুচিবোধ বিসর্জন দিয়েছি। হয়তো প্রবল রকমের এবং স্থূল রকমের উপচার না-হ'লে এখন আর কিছুতে আগ্রহ জাগবে না। বিমর্ষ হলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হ'ল এই অধঃপতন নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠক- (এবং পাঠিকা-) কুলের ঘটেনি। বুদ্ধদেব বসুর বাল্যকালে সপ্তম শ্রেণীর বালকেরা যদি ইংরিজি পাঠ্যপুস্তকে 'শী' দেখামাত্র আহ্লাদিত হ'য়ে পেন্সিলের দাগ মেরে থাকে, এখনো নিশ্চয়ই পরিণতবয়ঃপ্রাপ্ত সেই বালককুলের কামরোমাঞ্চের উৎফুল্ল প্রকাশ সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থরাজির মধ্যে বিরাজ করবে। এ-কথা মনে করা কঠিন যে সেইসব দুগ্ধপুষ্ট বালকেরা যেদিন পাঠ্যপুস্তক থেকে উপন্যাসে উত্তীর্ণ হ'ল, সেদিনই তাদের মধ্যে জন্ম নিল শীলিত সুসভ্য ভদ্রলোক, কলম-পেন্সিলের একটা বড়ো সার্থকতা যে পাঠাগারের উপন্যাসে দাগ মারায় তা যারা ভুলে গেছে।

ভাবলাম, যদি বনেদিগোছের কোনো পাঠাগার খুঁজে বার করা যায় যার প্রতিষ্ঠা অন্তত বুদ্ধদেব বসুর প্রথম রচনার সমসাময়িক, এবং আধুনিক-সাহিত্যে যার রুচি প্রেক্ষাগৃহের দ্রুপদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পাঠাগারে গিয়ে যদি খোঁজা যায়, এবং তার আলমারিতে যদি লেখকের প্রথম

সংস্করণের কিছু উপন্যাস এবং ছোটোগল্প থাকে, তাহ'লে নিশ্চয়ই জানা যাবে এই আটত্রিশ বছর ধ'রে পাঠকদের মনোরঞ্জন কিসে হয়েছে। এই পাঠাগারই তাহ'লে আমার অন্বিষ্টের চিচিংফাঁক; সেখানে পৌঁছতে পারলেই অশ্লীলতার নিদর্শন লাল-কালো-সবুজ-বেগনি কালিতে এবং পেন্সিলে অলংকৃত দেখব, এক ছ'নম্বর খাতা ভ'রে নিয়ে আসতে পারব অশ্লীলতার সারাৎসার।

প্রথম চেষ্টাতেই তেমন একটি পাঠাগার পাওয়া গেল, যাতে আছে বুদ্ধদেব বসুর পঞ্চাশাধিক উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ, অনেকগুলিই প্রথম প্রকাশের সময় সংগৃহীত। সেখানকার গ্রন্থাগারিকের সৌজন্যে বইগুলি উল্টেপাল্টে দেখার সুযোগও ঘটল। কিন্তু প্রাপ্তির স্বল্পতায় হতাশ হলাম। বহুপঠিত, প্রায় ছিন্নপত্র, উপন্যাসের পর উপন্যাস তন্নতন্ন ক'রে উল্টেপাল্টেও যা পাওয়া গেল তাকে পাশের নম্বর দেয়া কঠিন। 'বনশ্রী' উপন্যাসের ঊনত্রিশ পৃষ্ঠায় 'খুব হালকা ক'রে বনশ্রীর মুখের উপর একবার চুম্বন করলে' নিচে দাগানো, চুম্বন কথাটির চারদিকে লালকালির একটি চতুষ্কোণ। বেচারা! এককালে মহাতপা মুনিঋষিদের যেমন স্ত্রীদর্শনমাত্রেই স্খলন এবং পাতন ঘটত, চুম্বনের সঙ্গে শীতল সাক্ষাৎকারেই এ-ব্যক্তির যেরূপ চিত্তবিকার হয়তো ঘটেছিল। 'এরা আর ওরা' সম্পর্কে আশা করেছিলাম পাঠকদের বলার কথা অনেক থাকবে, কিন্তু কেবল লেখা আছে : বইটা 'গতানুগতিক'। 'নতুন নেশা'র রেবা 'প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমে দুঃসহ সুন্দর চোখ তুলে একবার নীরেনের দিকে তাকালো; তারপর হঠাৎ নীরেনের এক হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে মুহূর্তের জন্য তার বুকের উপর রাখলো।' বুকের ওপর পেন্সিলের খোঁচা পড়েনি; পড়েছে পরের বাক্যটিতে : 'মুহূর্তের জন্য নীরেন এক অজানিত, অকম্পিত, উষ্ণ কোমলতা অনুভব করলে, মুহূর্তের জন্য তার সমস্ত শরীর দিয়ে লক্ষ বিদ্যুৎ খেলে গেলো; তার মাথা ঝিম ঝিম করছে, তার চোখের সামনে আবছায়া, তার সমস্ত চেতনা নেশায় আচ্ছন্ন, অবসন্ন, মনে হলো সে এখনই মরে যাবে।' এ-রকম দাগ প্রশংসার চিহ্ন হ'লেও সংখ্যায় খুব কম।

দাগানোর হিশেব দাখিল করা গেল। মন্তব্য? 'কিছুই বোজা গেল না।' ('শোণপাংশু' উপন্যাস সম্পর্কে? আমি কখনো লিখেছিলাম? কিন্তু আমি তো ইতিপূর্বে ঐ পাঠাগারে যাইনি!) আরেকটি আবিষ্কার করা গেল 'মিসেস গুপ্ত' গল্পগ্রন্থে :

> বুদ্ধদেব —!
> তুমি গৌতমবুদ্ধ হ'লে না কেন?
> হ'লে অতিসহজে অশথবৃক্ষের নীচে ব'সে গভীর প্রেমে যুবতীপ্রর্থনা ক'রে নিতম্বলাভ ক'রে দেহ ও মনকে আনন্দ দান করতে পারতে। হায় কপাল —!

শেষ মন্তব্য যে-টি উপস্থিত করছি তাতে স্পষ্টতই বুদ্ধদেবের প্রভাব; 'হিপ্পোপটেমাস, লিপ্ত পটে মসি'র অনুকরণে : 'বুদ্ধ বোস, বুদ্ধি বেশি'। নেহাৎ অন্যায় নয় মন্তব্য, সেই সময়কার ছোটোগল্প সম্পর্কে যখন কলকাতা শহরে অমিতা চন্দ নামে এক অনূঢ়া যুবতীর একাধিক যুবাবন্ধু 'উইট' এবং হৃদয়চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন।

প্রায় অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যি। আপনাদের সামনে আমার গবেষণার লব্ধ ফল সম্পূর্ণ উপস্থিত করেছি। এতে আমার সমস্যা মিটল না, প্রশ্ন থেকেই গেল! তাহ'লে কী? কেন ত্রিশের দশকের সেই দুর্নাম, পাঠকদের বিচলিত করেছিল কী? সত্যিসত্যি কি তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন,

নাকি একদা যে-শৃগালদের ঐকতান উঠেছিল, আসলে সেই সব শৃগালেরা তখন জরাগ্রস্ত, যা আমরা ক্রুদ্ধ চিৎকার মনে করেছিলাম তা আসলে আসন্ন মৃত্যু আর অবলুপ্তির আক্ষেপ। হয়তো এই সিদ্ধান্তই ঠিক; কেননা সেই সময়কার কিছু নোংরা সাময়িকপত্র ঘেঁটে দেখা গেল, যে-সব নামের উচ্চারণমাত্রেই পত্রিকাগুলির প্রলাপ আরম্ভ হ'ত রবীন্দ্রনাথের পর একমাত্র তাঁদেরই নাম আজকাল উচ্চারিত হয়। হায়, এদের উচ্ছ্বাসের পাত্ররা আজ কোথায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, কৃষ্ণধন দে? আমি এ-কথা মেনে নিতে রাজি নই যে আমি অসাধারণ এক গ্রন্থাগারে হাজির হয়েছিলাম, যা'র পাঠকমণ্ডলী অনিন্দ্য রুচির অধিকারী। সাধারণ পাঠাগারের পাঠক সর্বদা পাঁচমিশেলি হবেন, তাতে শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিতের অবাধ আনাগোনা। যেখানে তিরিশ পঁয়তিরিশ বছর ধ'রে কোনো-কোনো বই বহুব্যবহারের চিহ্ন নিয়ে আলমারিতে শোভা পাচ্ছে, সময়ের ছোটোখাটো পরীক্ষা তারা তো অনায়াসেই পাশ ক'রে গেছে, পাশ করেছে সেই নীতিবাগীশ সময়েরও পরীক্ষা, যখন ইশকুলের পাঠ্যপুস্তকে মায়েদের বুক, বুদ্ধদেব বসুর জবানিতে, 'সমতল করে আঁকা হ'তো'। একথা অবশ্য কেউ বলতে পারেন যে কলকাতার পাঠকরা ভিন্ন জাতের, শ্লীলতা তাঁদের এত সহজে হন্য নয়। মফস্বলের পাঠাগারে নিশ্চয়ই সেই সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যেত, যার বৃথা অনুসন্ধান আমি কলকাতায় করেছি। হ'তে পারে। কিন্তু এটা মেনে নিতে হবে যে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র যে-কলকাতা শহর তার পাঠকবর্গ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এবং ষাট দশক মোটামুটি প্রশান্তভাবেই কাটিয়ে এসেছেন। শ্লীল-অশ্লীলের অবান্তর দুশ্চিন্তা তাঁদের ঘুম কেড়ে নেয়নি। যদিও সে-সময়কার কিছু সাময়িকপত্রের ছিছিক্কারে মনে হ'তে পারে বাংলাদেশে বুঝি-বা একটা তোলপাড় শুরু হয়েছিল, এখন বোঝা সহজ কেন সেই গায়ে-পড়া উত্তেজনা : উৎকৃষ্টের প্রতি নিকৃষ্টের সহজাত আক্রোশই তার হেতু। "রজনী হল উতলা" নামে বুদ্ধদেব বসুর অল্পবয়সের একটি গল্প যখন 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয় তখন নাকি বাংলাদেশে উত্তেজনা উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল। আশ্চর্য নয়, আমাদের বাপ-জ্যাঠাদের আমলে কী না সম্ভব ছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই কাঁচা গল্প, কোথায়-বা তার সমালোচক-লোচিকাগণ! সময় যেমন কাঁচা লেখাকে অবজ্ঞা করে, তেমনি অবজ্ঞা করে নিন্দুককে। কিন্তু তিরিশের দশকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ কবিতা গল্প উপন্যাস আজও যে অসাধারণ সুখপাঠ্য লাগে, এতেই প্রমাণ হয় যে সময় কাঁচা লেখাকে অবজ্ঞা ক'রে থাকতে পারে, লেখককে করেনি।

বুদ্ধদেব বসুর রচনা যিনি একাদিক্রমে কয়েকদিন প'ড়ে উঠেছেন সহজেই একটি কথা তাঁর মনে হবে; 'সাড়া' থেকে 'যমুনাবতী'[১] উপন্যাসে একাধিক কাহিনীর নায়ক হলেন উত্তমপুরুষ; দু-টি গল্পে নায়িকার আত্মকথনও শুনতে পাই। কিন্তু বাকি উপন্যাসগুলিতে নায়কের একটা সাধারণ চেহারা দাঁড়ায় এইরকম : ভালো ছাত্র, প্রায়ই দস্তুরমতো ভালো ছাত্র, ইংরিজির ছাত্র, কবি অথবা কবিতাপ্রিয় মাস্টার (শেষোক্ত চরিত্রটি এ-দেশে এতই বিরল যে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে একে লক্ষ না-ক'রে পারা যায় না), পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত,[২] বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি বিগতকাম, কিন্তু সুরাপানে আসক্তি প্রবল, (এবং এই আসক্তি নিয়ে এমন একটা ছেলেমানুষি

---

১. এখনো পুস্তকাকারে বেরোয়নি

২ জলে ইস্টিমার আর ডাঙ্গায় রেল নারায়ণগঞ্জে দুই-ই চলত; উত্তম কথা। কিন্তু কলকাতা শহরে পৌঁছবার সুরম্য পথটিকে চিনে নেবার পরও বাঙলাভাষার পিছু টান যেন বুদ্ধদেব বসুর রচনায় একটু

আত্মপ্রসাদ সর্বদা আছে, যা নাকি এ-বিষয়ে লোভ-ভয়-ভণ্ডামি মেশানো বেন্মপনারই উল্টোপিঠ)। নিজের জবানিতে এ-রকম গল্প লেখার বিপদ আছে। গল্পের 'আমি' যে লেখক নন, পাঠকের তা সর্বদা মনে রাখা সম্ভব নয়, আত্মস্মৃতির রেশ কাহিনীতে এত প্রবল যে প্রায়শই তাকে আত্মকথা ব'লে ভুল হ'তে পারে। আর যেখানে প্রথম পুরুষে লেখা গল্প, সেখানেও উত্তমপুরুষে কথিত কাহিনীর নায়কের সঙ্গে মিলের বাহুল্যে (মৌলিনাথ স্মরণ করুন) পাঠকের পক্ষে উত্তম-প্রথমের ভেদ কঠিন। কাঁসারি পাড়ার হেমাঙ্গ মিত্তিরের ছোটো মেয়েকে বিয়ে করার পর, অর্থাৎ ছাড়পত্র সংগ্রহ ক'রে রাজীবলোচন মদ আর মেয়েমানুষে ডুবুডুবু. 'পাতাল থেকে আলাপ' তাঁর অতীতে সঞ্চরণ; 'শেষ পাণ্ডুলিপি'র বীরেশ্বর বসু তাঁর মকারে-আসক্তি যেন একটু ফলাও ক'রে লিখছেন; আবার এঁদের উভয়কেই সম্মুখসমরে কুপোকাৎ করতে পারেন 'গোলাপ কেন কালো'র রণজিৎ। প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' থেকে শুরু ক'রে হাল আমলের 'গোলাপ কেন কালো' পর্যন্ত এই যে সুরা এবং অসুর সুন্দরীদের বৃত্ত তাতে লেখক যে শেষপর্যন্ত আটকা পড়বেন, পাঠকের কাছে সেটা স্বাভাবিক মনে হ'তে পারে। আরো-একটা কথা বলা যায়; অতীতকালের লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন না-জেনেও তাঁদের রচনার রসাস্বাদ করা সম্ভব; বরং জীবন-কাহিনী না-জানাই সম্ভবত ভালো; কিন্তু আমরা সমকালীন লেখকদের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু অনেকেই জানি। আজকাল কোন লেখক নিজের বাগানকে ছাতিমতলা ভেবে অন্যমনস্ক পাইচারি করতে-করতে পুত্রকে 'রথী' ব'লে ডেকে ফেলেছেন, সে-খবরও আমাদের কানে যথারীতি পৌঁছয়; এবং সত্য গুজব আর জল্পনার ভিত্তিতে আমরা লেখকদের রক্তমাংসের মানুষ বানিয়ে নিতে চেষ্টা করি। যদি এঁদের কারো রচনায় আত্মজীবন অবিরত ছায়াপাত করে, আর সেই ছায়া যদি মোটামুটি কতকগুলি জানা ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়, একাধিকবার হয়, তাহ'লে, যে-অংশে আত্মজীবনী নেই, লেখকের সঙ্গে সেখানেও সাদৃশ্য কল্পনা পাঠকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। দিলদার নওরোজকে চেনা গেল, মিতু বর্ধনকেও চেনা সহজ; আর রণজিৎ — সে তো আমাদের পুরাণা পল্টনের মৌলিনাথ; বুলবুল হ'ল 'যমুনাবতী'র চামেলি, কিন্তু সে কে? আর নয়নাংশু-মালতী-জয়ন্তর ব্যাপারটাও এই ছকে বসিয়ে দিতে পারলে মন্দ হ'ত না ...। এইসব গবেষণার প্ররোচনা দিয়েছেন লেখক স্বয়ং, পাঠকের সঙ্গে উনিশশো তিরিশ সাল থেকে কানামাছি খেলে। বুদ্ধদেব বসুর রচনায় জীবনস্মৃতি আর বানানো গল্প এমন পাশাপাশি রয়েছে যে তাদের গণ্ডিনির্দেশ সম্ভব নয়। কেউ যদি এতে পাঠক-স্বভাবের মন্দ

বেশি। চার নম্বর বাসে ড্রাইভারকে যখন যাত্রীরা পাইলট বলেন, সহ্য ক'রে নিতে হয়, উপায় কি; সৌভাগ্যের কথা বাসের কণ্ডাকটাররা আজকাল আর যাত্রীদের দাদু বলেন না; কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর রচনায় কয়েকটি বাঙাল শব্দ পুনঃপুন ব্যবহৃত হ'তে দেখে দুঃখিত হই। দুঃখিত হই এই কারণেও যে শব্দগুলি ভাষায় চলল না : কবুতর বুক, চুপে চুপে, পিট্টি খাবার শখ, সারাইটারাই, সবুর ক'রে থাক, মাথায় বাড়ি, অর্ধপয়সা, চিকরিকাটা চিকনপাতা (চ-এর এই অনুপ্রাস কলম দিয়ে বেরুল?), চুপ থাক, চিড়িয়াখানা, ঘোরকপট, বালু, ডন করে (আর বেহালা বাজায়), চোখা নাক, বদমাশ, মা মরলে বাপ তো তালুই, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। — কখনো-কখনো এমন আস্ত নতুন কথা চোখে পড়ে যার অর্থ আমার অভিধানে নেই। বহু দাম্পত্য কলহেও যে আমার বাঙাল স্ত্রী কোনোদিন আমাকে ফুঙ্গির পো বলেননি তাতে আমি একটু আশ্বস্ত বোধ করছি, কেননা এই শব্দের অর্থ কেউ বাতলে দিতে পারেননি।

দেখেন, প্রশ্ন করেন লেখকের অতীত-বর্তমান নিয়ে কেন তিনি অ-সাহিত্যিক পরচর্চায় মগ্ন হবেন, তাহ'লে নালিশটা ন্যায্য হয় না। আত্মবিলাস থেকে মুক্তিই শিল্পীর কাম্য; 'আমি নিজেকেই ভালো জানি' এই যুক্তিতে ঘুরে-ফিরে নিজের ছাঁচে নায়ক বানানো কোনো কাজের কথা নয়। বস্তুত বুদ্ধদেব বসু যখন জীবনস্মৃতির বল্মীকস্তূপ থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছেন তখনই তিনি অসামান্য ভালো গল্প লিখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে আমি নিঃসন্দেহে গণ্য করি, "একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা" নয় বরং "একটি লাল গোলাপ"; "আদর্শ" অথবা "নাটুর জীবনের শেষ কয়েকটি ঘন্টা" নয়, কিন্তু "প্রথম"; "মা, ভাই, বোন"; "হতাশা"; "অপমান বা অভিমান"; "তুলসীগন্ধ"।

যদি বলা যায় বুদ্ধদেব বসুর ছোটোগল্প এবং উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল প্রেম, তাহ'লে বোধহয় ভুল হবে না। প্রেমের জাগরণ, উপভোগ, বিকার, অভাব, স্মৃতি, বহুদিক থেকে প্রেমকে উপলব্ধির প্রয়াস 'সাড়া' থেকে 'যমুনাবতী' পর্যন্ত রচনাগুলিতে বিস্তৃত। পুরুষ যেমন এইসব কাহিনীগুলিতে বিচিত্ররূপে দেখা দিয়েছে, — প্রেমে আচ্ছন্ন, প্রেমে উন্মীলিত, উদ্ভাসিত, প্রেমের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত, প্রেমের অপরিপূর্ণতায় বিষণ্ণ, প্রেমের পরীক্ষায় অসমর্থ, প্রেমের ব্যর্থ ব্যভিচারে শৃঙ্খলিত; কপিল, পার্থপ্রতিম, নীলাঞ্জন, সোমনাথ, রাজীবলোচন, রণজিৎ; — পুরুষের এই যেমন বিচিত্র রূপ, নারীর বৈচিত্র্যও তেমনই অপরিসীম : সে কখনো প্রেমের উদ্দিষ্টমাত্র, কখনো সহচরী, কখনো জীবনসঙ্গিনী, কারো জীবনে প্রেমের কখনো ঘটেনি, কেউ প্রেমে উৎসর্গিত, আবার কেউ প্রেমের হলাহলে জর্জরিত; স্মরণীয় এক নামাবলি : মালতী, কুন্তলা, সুমিতা, মীরা, শোভনা, বরুণা, সন্ধ্যামণি, অপর্ণা, রমলা, স্বাতী, আবার মালতী। বুদ্ধদেব বসুর রচনার আদি মধ্য এবং অন্তে প্রেমের এই অজস্র রূপের নব-নব আবিষ্কার অন্তহীন এক দ্রৌপদীর শাড়ির অপসারণ। প্রেমের অন্বেষণই তাঁর রচনার স্বাদুরস, আর তাঁর অশ্লীলতার খ্যাতিও এই কারণেই।

আমি হেঁয়ালি করছি না; পর্যবেক্ষণ প্রবণতা এবং সততা যাঁর আছে তিনি স্বীকার করবেন যে পুরুষ ও স্ত্রীর প্রেম এখনো আমাদের দেশে অশ্লীল ব'লে গণ্য। ভালোবাসার একমাত্র স্থান বিবাহিত দম্পতির সম্পর্কে, পরিবার গোষ্ঠীর শীতল বিটপছায়ায়। মূর্খ ব্রাহ্মণের মন্ত্রাদির দ্বারা পূত হবার পূর্বে তার কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং পরেও তার গ্রাহ্য প্রকাশ প্রাত্যহিকতার সিকি দোআনিতে। এক নিম্নমধ্যবিত্ত মানসিকতা এবং শুচিবাইয়ের দ্বারা আমরা পরিচালিত; আমাদের শ্লীলতাজ্ঞান অতিসূক্ষ্ম। প্রসাধনে প্রলেপে লজ্জায় অলংকারে ভারাক্রান্তা অনূঢ়া একটি যুবতী একপাল বিগতযৌবনযৌবনা পর্যবেক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে রূপগুণের পরীক্ষা দেবে, তাকে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে চেটে-চেটে খাবার পর (বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যে এই ক্ষমতাটির অসাধারণ উন্নতি হয় তা সম্প্রতি আমিও উপলব্ধি করতে শুরু করেছি) গাণ্ডেপিণ্ডে জলযোগ পর্ব সমাধান ক'রে উক্ত বি-যৌ-যৌরা বিদায় নেবেন। আবার একদল আসবেন, আবার একদল, এই ক'রেই কোনো-একদিন ছিপে একটি পোনামাছ উঠে যাবে; খালি গায়ে রোমশ অথবা রোমহীন বক্ষ-সৌন্দর্য প্রদর্শন ক'রে বিবাহাচারের জলধি পেরিয়ে বাবাজীবন ফুলশয্যার রাতে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত স্ত্রীলোকের বস্ত্র এবং সতীচ্ছদ যুগপৎ হরণকার্য সাঙ্গ ক'রে পৌরুষের উপযুক্ত পরিচয় দেবেন, নবোঢ়া বধূটির জীবনে সম্ভবত এই প্রথম ও শেষ রোমাঞ্চের আস্বাদন; বছর

ঘুরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বধূটির অঙ্কে কোলজোড়া মানিকের আবির্ভাব হবে, এবং একটির ওপর যেহেতু শনিঠাকুরের কালদৃষ্টি, তাঁকে কলা দেখাতে ষষ্ঠীকরুণ আশীর্বাদবৃষ্টিতে তৎপর হবেন; বাবাজি ষষ্ঠীর দিনে শাদা লপেটা পায়ে, আতর মাখানো সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে শ্বশুরালয়ে ভূরিভোজন ক'রে শাশুড়ির আনন্দবর্ধন করবেন, শুয়ে ব'সে কলম পিষে কম দামে কিনে বেশি দামে বেচে পরচর্চা ক'রে শনিবার রাতে সহবাস আর রোববার দুপুরে মাংসের ঝোলভাত খেয়ে বিকেলে বাংলা সিনেমা দেখে তাঁর দিন কেটে যাবে : এই হ'ল আদর্শ সুস্থ শ্লীল জীবন। এর মানসিকতা বিত্তবান বিত্তহীন নির্বিশেষে সমগ্র দেশকে গ্রাস করেছে; ছোটোখাটো হেরফের বড়ো জোর দেখা যাবে, ষষ্ঠীর আশীর্বাদের বদলে স্ফীতোদর গণেশের আশীর্বাদ, রোববার মাংসের ঝোলের বদলে পার্কস্ট্রীটে চা-পর্ব, বাংলা ছবির বদলে ০০৭।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর 'মিসেস ড্যালোয়ে' উপন্যাসের স্মারক বুদ্ধদেব বসুর 'পরিক্রমা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। আজ তিরিশ বছর পরেও কাহিনীটি অমলিন আছে। প্রেম যাদের সঞ্জীবিত করেছে এমন দুই দম্পতি, প্রেম যাকে দংশন করেছিল মাত্র এমন এক ভদ্রলোক, প্রেমকে অবজ্ঞা করতে পারে মেদস্ফীত মূঢ়তায় বর্বর এমন এক স্বামী-স্ত্রী — এদের নিয়ে গল্প। এই গল্পে বিজন ঘোষ আর তার স্ত্রী সুমিতা ঘোষ বাঙালিয়ানার সম্পাদকীয় স্তম্ভ; প্রশান্ত-বরুণার প্রেমোজ্জ্বল জীবন তাদের বিচারে বেলেল্লাপনা, কুঙ্কুম-মল্লিকার সুখী গৃহস্থালি তাদের চোখে ঘৃণ্য, নির্লজ্জতার চূড়ান্ত; সোমনাথ একটি পরাশ্রয়ী মাতাল। বিরানব্বুইখানা কাপড়ের ধোপার হিশেব লেখার পর সুমিতা ঘোষ স্বামী-স্বজন-পরিচিতের সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করতে বসে, আর আপিশ-ফেরতা বিজন ঘোষ হাতকাটা পিঠকাটা বিলিতি গেঞ্জি আর হাঁটুর কাছে উঠে-আসা ঢাকাই ধুতি লুঙ্গির মতো ক'রে প'রে বিশ্রাম করে; পাতলা ধুতির অন্তরাল থেকে উঁকি মারে তার সুগোল বাচ্চা ভুঁড়িটি। স্ত্রীর পরচর্চায় স্বামী দোসর। সাবাস বিজন ঘোষ, তুমি জজ, তুমি অ্যাসেসর, তুমি জুরি। তলব কর প্রশান্তকে, বরুণাকে, সোমনাথকে, কুঙ্কুম-মল্লিকাকে; তোমার বাচ্চা ভুঁড়ি থেকে উদ্‌গিরণ কর শানিত নিন্দার বাণ; স্ত্রীর বুদ্ধির তারিফ কর, তাকে সন্তুষ্ট রাখো কাপড়ের স্তূপ উপহার দিয়ে, বিলেতে তোমার বুনো যব ছড়িয়ে আসার গুজবে তাহ'লে সে কান দেবে না; মেয়েকে ধমকে 'চৈত্রপবনে মম চিত্ত বনে' নাচাও গাওয়াও। আমাদের সমাজের তুমিই পয়লা মাস্তান, জীবনের সত্য শ্লীল সুন্দর তোমার কাছেই আমরা শিক্ষা করব।

প্রেমের কল্পনাই যখন অশ্লীল প্রমাণিত হয়েছে, তার কাহিনী যদি কেউ ফলাও ক'রে বলেন তাঁর বিকৃতরুচি সম্পর্কে কার সন্দেহ থাকতে পারে? প্রেম কেন অশ্লীল? অশ্লীল এই জন্য যে স্ত্রীজাতিকে পুত্রকরণের একটি যন্ত্রমাত্র না-ভেবে প্রেমিক তার দেহমনের শোভায় মগ্ন হ'তে চায়, মনে করে প্রেয়সী তার একার, বিগত যৌবনযৌবনাদের চাকরি গিয়ে কী দশা হবে সে-চিন্তা তার মনে আদৌ প্রবেশ করে না, নারীকে বিদেহী আত্মা অথবা সতীধর্মে জাজ্বল্যা পবিত্রতার প্রতিমা কল্পনা না-ক'রে তার পার্থিব শরীরে সে অবগাহন করতে চায় (এবম্বিধ আচরণ দূষ্য, কেননা নারীর দেহসৌন্দর্যে সে যদি সমর্পিত হয় তাহ'লে ষষ্ঠীদেবীকে যথেষ্ট পুজো দিতে সে অবহেলা করবে); প্রেম সর্বোপরি অশ্লীল এই কারণে যে আমরা নিরানব্বুই জন যা ক'রে আসছি আসতে থাকব তাতেই সন্তুষ্ট থাকব এবং পুত্রকন্যাদের সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করাব

(কেননা আমরা ম্যাট্রিকের বাংলা বইয়ে অক্ষয়কুমার বড়াল, কৃষ্ণধন দে প্রমুখ প্রখ্যাত কবিদের রচনার সঙ্গে আরেকটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম, তার সবচেয়ে সাঁচ্চা বাক্যটি ছিল : 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে!')। আমরা জানি, যা করছি তাতে সমাজের মঙ্গল, তুমি এর মধ্যে হঠাৎ অন্যরকম ক'রে-বসার কে বট হে? যা সকলে মিলে করবে তা-ই শ্লীল, আমরা যদি দেশশুদ্ধ বুড়োবুড়ি খাটো গামছা প'রে গঙ্গা নাইতে যাই তোমাকেও যেতে হবে, আমরা যদি এক এক-জনে এক অক্ষৌহিণী ক'রে সন্তান প্রজননে রত হই, বাপু হে একটু পরিশ্রম করলে তুমিও পারবে। আমরা (তোমাকে বাদ দিচ্ছি না) ট্রামেবাসে 'আমাদের বাড়িতেও মা'বোন আছে' ব'লে এবং স্ত্রীজাতির মহিমা জন-সমক্ষে ঘোষণা ক'রে এবং মেয়েদের পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ ক'রে বাড়ি ফিরব, তারপর স্ত্রীর সঙ্গে কাংস্যকণ্ঠকলহে পরাস্ত হ'য়ে যুবতী কন্যাকে বেচালের জন্যে প্রহার করব; আমরা সকলেই তা-ই তো ক'রে থাকি, সুতরাং প্রেম ফ্রেম বালিগঞ্জের ব্যাপার, আলবৎ অশ্লীল।

*

সাহিত্যে শ্লীলতার সীমা কিসে লঙ্ঘন করে তা-নিয়ে আলোচনা শুরু করার ইচ্ছে আমার নেই, এর বিচার সরকারি নীতিসংরক্ষণী বিভাগগুলি করবেন; যদিও এ-কথাটা মনে রাখাই ভালো যে একদা অশ্লীল পুনঃপুন বাজেয়াপ্ত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই পৃথিবীর অন্যত্র এখন বৈধরূপে প্রকাশিত ও বিক্রীত। চার অক্ষরের খারাপ কথা আজকাল আর তারকাচিহ্নে লিখতে হয় না। আমাদের দেশে অবশ্য সুবুদ্ধির সেই হাওয়া এখনো বয়নি, কিন্তু প্রাণপণে দরজা বন্ধ রেখে সময়কে বেশিদিন প্রতিরোধ করা যায় না। আমরা যা-নিয়ে এখনো উত্তেজিত বোধ করি তা হ'ল কাহিনীতে চুম্বন আশ্লেষ এবং নারীদেহের রূপ বর্ণনা। এ-ছাড়া অসামাজিক যৌন-সম্পর্ক-বিষয়েও আমাদের ঘোরতর আপত্তি। এই উত্তেজনা এবং আপত্তি যে কতখানি হাস্যকর তা বোঝাবার জন্যে আমি চসর-শেক্সপীয়রের নজির দেব না, কেননা চসর-শেক্সপীয়র আর ক-টা লোকে পড়ে। বুদ্ধদেব বসুর কিছু রচনা থেকে তথাকথিত অশ্লীল অংশের আলোচনা ক'রে আমি নিজেকে এই প্রশ্নই করতে চাই যে তার মধ্যে কি এমন-কিছু আছে যা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে?

আমি আরেকবার 'সাড়া' প'ড়ে নির্দ্বিধ হলাম যে এই উপন্যাসটি আদ্যন্ত পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। এমন-কি যেখানে নির্মলা-সত্যবান প্রসঙ্গ আছে, সেখানেও বুদ্ধদেব বসু শরৎচন্দ্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। 'রূপালি পাখি', 'যেদিন ফুটলো কমল', 'বাড়ি বদল', 'আমার বন্ধু', উনিশশো তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে লেখা এই উপন্যাসগুলিতে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একটি চুম্বন নেই; সারা 'বাসর ঘর' উপন্যাসে যতদূর মনে পড়ে একটিবার মাত্র আছে। 'লালমেঘ', যার কাহিনী ব্যভিচারে অথবা তার সহজ সমর্থনে শেষ হ'তে পারত, যেমন অনায়াসে এড়িয়ে গেছে লালসার পিচ্ছিল পথ, তেমনি পরিহার করছে যৌন-সতীনের ঘর-করার উজ্জ্বল সম্ভাবনাটিকে। 'লালমেঘ' উপন্যাসে 'দুই বোন'-এর অসহ্য ভণ্ডামি নেই; অবিনাশ জানে, সন্ধ্যামণি জানে, শোভনা জানে; মায়ের জাত আর প্রিয়ার জাত নিয়ে কোনো ন্যাকাপনা নেই; শোভনা আর সন্ধ্যামণি দু-জনেই রক্তমাংসের স্ত্রীলোক। শশাঙ্কর মতো একটি নির্বোধ নাগর অবিনাশ নয়, সে দস্তুরমতো শিক্ষিত ব্যক্তি।

অবশেষে একদিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কিরকম ফুটেছে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ উর্মির হাত চেপে ধরে বললে, 'তুমি নিশ্চয়ই জান, তোমাকে আমি ভালোবাসি! আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর-কাউকে তেমন করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।

'দুই বোন' উপন্যাসে এ-রকম ন্যক্কারজনক ঘটনা অথবা চরিত্রসমাবেশ 'লালমেঘ'-এ অকল্পনীয়; যে-কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ছুঁয়ে মাটি করেছিলেন সেই কাহিনীর পুনরুদ্ধার হয়েছে 'লালমেঘ' উপন্যাসে।

বুদ্ধদেব বসু যদিও শৈশব-কৈশোরের স্মরণীয় চিত্র অঙ্কন করেছেন 'সাড়া', 'বাড়ি বদল', ধূসর গোধূলি' (নীলকণ্ঠ-মায়া উপাখ্যানে), 'শেষ পাণ্ডুলিপি' (বীরেশ্বর-গৌরী উপাখ্যানে) উপন্যাসে, এবং যদিও আমি 'সাড়া'-র মতো শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিরোমন্থিত কাহিনী আর পড়িনি, এইসব উপন্যাস যে-সৌরভে বিশিষ্ট, নারীর সন্নিধানে, মাতারূপে, লীলা-সহচরীরূপে, প্রেমের অস্ফুটিত কোরকরূপে, সেই নারীর যেহেতু যৌবন সবচেয়ে সমৃদ্ধ কাল, সেই যৌবনের কাহিনী তাঁর রচনার প্রধান একটি অংশ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্ধক্য — জীবনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সময়ের ভিন্ন-ভিন্ন পর্বে আমরা কোনো-না-কোনো নারীর সান্নিধ্যে কালযাপন করি; কিন্তু আমরা কে কেমন নারীর উপযুক্ত তার পরীক্ষা যৌবনে যেমন হয় তেমন সম্ভবত অন্য-কোনো পর্বে হয় না। নীলকণ্ঠের মনে অভিলাষ ছিল, কিন্তু সংকল্প ছিল না; কপিলের মনে সংশয় ছিল, তাই তার প্রতীক্ষা দীর্ঘিত হ'ল; শ্রীলতাকে অপেক্ষা করতে হ'ল প্রেমের দ্বারা তার গর্বকে খর্ব করার জন্য; কুন্তলা-পরাশরের বোঝাপড়া সাঙ্গ হ'তে পারল যখন স্বাতন্ত্র্যের জ্বর ছাড়ল পরাশরের। আর অরুণা-অশোক, কুঙ্কুম-মল্লিকা, প্রশান্ত-বরুণা, এদের মনে কোনো সংশয় ছিল না, মগজে ছিল না কোনো অসুখী ভূত; তাই তারা অনায়াসে বরণ ক'রে নিতে পেরেছিল প্রেমকে।

প্রথম যৌবনের এইসব কাহিনীকে অতিক্রম ক'রে বুদ্ধদেব বসুর অন্য কতকগুলি উপন্যাস মধ্যজীবনের আলেখ্য হ'য়ে উঠেছে। অপ্রেমের পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ দম্পতির কোনো-একজনের জীবনে আবির্ভাব হয় প্রেমের, কিংবা প্রতিহিংসার, কিংবা ব্যর্থ যৌবনের স্মৃতির, যেমন 'নির্জন স্বাক্ষর', 'শেষ পাণ্ডুলিপি', 'পাতাল থেকে আলাপ', 'রাত ভ'রে বৃষ্টি', 'গোলাপ কেন কালো' — এই পাঁচটি উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের, তাহ'লে নিজেদের স্বর্গ-নরকের পথ নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে মৃত্যুতে, যন্ত্রণায়, অপচয়ে, অভিনয়ে। অপ্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ কোনো জায়া বা পতির জীবনে প্রেমাদি উপসর্গ দেখা দেয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়, যেমন সুরুচিকর নয় তাদের অসুখী বোধ করাটা; দুঃখের বিষয় জীবন আমাদের নিয়ে প্রায়শই ডাণ্ডাগুলি খেলে। বেশ হ'ত যদি এইসব সমস্যার এ-ধরনের কোনো রবীন্দ্র-সমাধান পাওয়া যেত : মেয়েরা হয় মায়ের জাত নয় প্রিয়ার জাত, সুতরাং মাতৃদুগ্ধপানের পর যদি কোনো খোকার তামাকের স্পৃহা জাগে, মা বলবেন তাতে আর বাধা কি, বোন-সতীনের ঘর এর আগে কি কেউ করেনি; তবে এতদ্‌সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হবে, দেশাইজি তামাকের ট্যাক্সো বাড়িয়ে দেবেন, মায়ের খোকন হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে মায়ের কাছে ফিরে যাবে।

বুদ্ধদেব বসু যদি দেশের সব বয়সের খোকাদের জন্যে উপন্যাস রচনার মহৎ ব্রত গ্রহণ

করতেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই মধ্যবয়সের সমস্যাগুলি তিনি সযত্নে পরিহার ক'রে চলতেন। কিন্তু সৎ লেখকমাত্রেরই সমস্ত জীবন এক অন্বেষণ; এক অভিজ্ঞতার অনুভবের পর অন্য-এক অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের নিরীক্ষণ। তা যদি না-হ'ত, তাহ'লে কাহিনীকার শিশুদের রূপকথার অথবা হিন্দি চলচ্চিত্রের সমাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকতেন; সাধ ক'রে যন্ত্রণার অনুবীক্ষণ করতেন না, জীবনের পাতাললোকে আমাদের হাত ধ'রে নিয়ে যেতেন না।

মধ্যবয়সে পৌঁছে কোনো-কোনো অসুখী ব্যক্তি উপলব্ধি করেন জীবনের এই পর্বে লাভের চাইতে ক্ষতির অঙ্কটাই বেশি। যৌবনের দুর্মর আশা নেই; নিঃসংকোচ আত্মপ্রকাশ, আত্মঘোষণার আনন্দ নেই; শরীরের তেজ নেই; আদর্শ, বিবেক, প্রসন্নতা, ক্ষমাশীলতা গত হয়েছে; পরিবর্তে এসেছে ক্ষোভ আর সামর্থ্যহীন লিপ্সা; আর স্মৃতি, কিন্তু সেই স্মৃতি দংশন করে; আর গ্লানি। বলা বাহুল্য এইসব বিষয়ে কোনো কাহিনী রচনা না-করতে পারলেই সুখের হ'ত, যদি আমরা এই সব রাজীব নয়নাংশু মালতী বীরেশ্বর আর রণজিৎদেরও আঁতুড়ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু এরা আছে, এরা আসলে আমরা, এদের বাদ দিলে আমাদের জীবন একটা জোচ্চুরি। এদের মধ্যেই আমরা নিজেদের আবিষ্কার করব, আমরা যারা মাস্টার কেরানি শিক্ষিত-বেকার ব্যবসায়ী চতুর সমালোচক উকিল হাতুড়ে প্রতিষ্ঠিত পরিবারকর্তা। আমাদের পরিমিত জীবনের চেতনা সীমাবদ্ধ, আমাদের কাছে জীবন অভ্যাসের সহিষ্ণু পুনরাবৃত্তি। শিল্পীর চেতনায় আমরা অপরিচিতের নিশানা লাভ করব, উপলব্ধি করব তাকে যার বিষয়ে আমরা প্রতিভা অথবা সততার অভাবে অচেতন ছিলাম। আমরা পুণ্যের চেতনায় সন্তুষ্ট হই, পাপের চেতনা জৈব সংস্কারের প্রেরণায় অস্বীকার করি। অথচ চতুর্দিকে মড়ক, সম্মুখে মহাশূন্যের মুখব্যাদান প্রত্যক্ষ ক'রেও আমরা ভয় পাই আমাদের চেতনার পাতালে প্রবেশ করতে, মনে করি আমাদের দৃশ্যপটে আপাতসান্ত্বনাকর চিত্রকল্পগুলি ধ'রে রাখতে পারলেই যে-যার নিজের মোক্ষের পথ খুঁজে পাব।

বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক রচনা এইজন্যই আমাদের পক্ষে মূল্যবান, হিতকর। আত্মপ্রবঞ্চনার সুখকর জগৎ থেকে এরা সবলে উৎপাটিত ক'রে এমন এক সাবালক পরিবেশে আমাদের নিক্ষিপ্ত করে যেখানে আমরা কাম লোভ মোহ এবং মদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। যৌবনের কামলীলা অবসিত হয় দুর্গন্ধময় রোগশয্যায়, আত্মার অবহেলিত ক্ষত কালক্রমে রূপান্তরিত হয় কর্কটরোগের বীভৎসতায়। রাজীবলোচনের পাতাল তার স্বখাত; ভোগের লালসায় আত্মসমাহিত রাজীব প্রেমের অমরাবতীতে উপনীত হ'য়েও নোংরা জিনিশের মতো তাকে তাচ্ছিল্য করেছিল; আর যাতে সে মজেছিল তার আজ মাজায় বাত। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে রাজীবের কাছে একদা-রম্য সব অভিজ্ঞতার স্বাদ কটু। এই কটু স্বাদ লেগেছে রাজীবের সমস্ত স্মৃতিচারণে, এমন-কি সে যখন ভাবছে কেমন ক'রে তার স্ত্রী, কাঁসারিপাড়ার হেমাঙ্গ মিস্তিরের ছোটো মেয়ে উর্মিলার সঙ্গে তপ্ত শরীরের কামনার সূত্রে তার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল তখনও :

> মশাইরা ভেবে দেখুন আমার অবস্থাটা তখন। আদালতে উকিলের জেরা, বাড়িতে স্ত্রীর। কাঁসারিপাড়ার মিস্তিরদের মেয়ের মুখে সে কী অশ্রাব্য গালিগালাজ! চোখ দুটো গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে যেন হিংসা ছিটোতে লাগলো। উর্মির ও-রকম চেহারা আমি আগে দেখিনি, ও-রকম চেহারা ওর হ'তে পারে তাও আমার ধারণায় ছিলো না। তাই ব'লে স্ত্রীলোকের অন্যান্য অস্ত্রগুলিকেও বাদ দিলে না সে

— কান্নাকাটি, গোমড়া মুখ, কথা বন্ধ, আলাদা বিছানায় শোওয়া — ন্যাকামির চূড়ান্ত। — এমনি চললো একমাস ধ'রে — সারাদিন একটা মোষের মতো খাটছি আমি, টালিগঞ্জ থেকে ব্যারাকপুর অবধি ছুটোছুটি, হাজার-হাজার পাওয়ারের আর্কল্যাম্পের গরম, মেক-আপ বারবার গলে যাচ্ছে — তারপর সর্বাঙ্গে কুৎসিত ঘাম নিয়ে বাড়ি ফিরে সব থমথমে — হসি নেই, কথা নেই, কিছু নেই, কোনোরকমে খাবারটা গিলে নিয়ে একলা বিছানায় ধড়াম ক'রে ঘুম। তারপর একদিন বাথরুমে পুনর্মিলন হ'লো।

তখন আমি তেতোলায় এই ঘরটা তুলেছি, একটি মস্ত বড়ো ঘর, হাল ফ্যাশনের ঝকঝকে বাথরুম, আর প্রকাণ্ড ছাদ — ছাদে টবের বাগান করেছিলো উমি। সেদিন একটু সকাল-সকাল ফিরেছিলুম — সবে সন্ধে পেরিয়েছে, বড়ো ক্লান্ত আর নোংরা লাগছিলো আমার, ভাবছিলাম স্নানটা সেরেই আবার বেরিয়ে পড়বো, আড্ডা জমাবো লোকেশের মদের বৈঠকে। সিঁড়ি দিয়ে তেতোলায় উঠে প্রথমেই বাথরুমে ঢুকেছি, ঢুকে দেখি উমি দাঁড়িয়ে আছে, বিবসনা বিশুদ্ধ উমি, তার শায়া শাড়ি কাঁচুলি ঝুলছে আলনায়, বাথটব-ভর্তি টলটলে নীলচে জল, সে একটি পা তুলে দিয়েছে টবে নামবে ব'লে — তার নাভির তলায় তিনটে ভাঁজ পড়েছে। আমাকে দেখে সে নড়লো না, শুধু ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'ও, দরজাটা বন্ধ করিনি বুঝি? তুমি বেরোও, আমি স্নান করবো।' আমি বললুম, 'আমি এক্ষুণি স্নান না-করলে বাঁচবো না।' 'তাহ'লে আমি যাই'। উমি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো শাড়ির দিকে, আমি দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে সেই হাতটা চেপে ধরলুম — সেদিন একসঙ্গে স্নান করলুম দুজনে, প্রায় একঘণ্টা ধ'রে স্নান, দুটো তপ্ত শরীরের কামনার সূত্রে অবশেষে সন্ধি স্থাপিত হ'লো। সেদিন খুব ভালো লেগেছিলো আমার, মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিলো জীবনে সত্যি ভালোবাসাকে হাতের মুঠোয় ধরা যায়।

দীর্ঘ উদ্ধৃতি ইচ্ছে ক'রেই দিলাম। বিবসনা বিশুদ্ধ উমির বর্ণনা এবং জৈব মিলনের কাহিনীতে কোনো গোঁজামিল নেই; কিন্তু সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি এবং সম্পূর্ণ উপন্যাস থেকে যদি কেউ পৃথক ক'রে নিয়ে এই বর্ণনায় আদিরস আস্বাদন করতে পারেন, তাঁর আর জীবনে ভাবনা কি, তিনি তো পরমহংস।[৩]

রোগশয্যায় অসহায়তায় রাজীবের একমাত্র সক্ষম, ইচ্ছাবিহারী অঙ্গ তার মন, কিন্তু এই মন মৃত্যুর চেহারা দেখতে পেয়েছে; যখন সে রাজীবের অতীতেবিহার করে তখন সে প্রবোধহীন; সহজ মিথ্যা দিয়ে বস্তু এবং ব্যবহারমাত্রেই সুন্দর চেহারা আরোপ করে না। রাজীবের জীবনে প্রেম এসেছিল, কিন্তু লালসার দাস রাজীব তাকে না-চেনার ভান করেছিল, প্রেম তার জন্যে অপেক্ষা করেছিল, বিরল সৌভাগ্য তার, কিন্তু রাজীবলোচনের সময় হয়নি। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে একটি ক্ষমাহীন চেতনা তার যৌবনের লালসাকে প্রত্যক্ষ করছে : কাঁসারিপাড়ার হেমাঙ্গ

---

৩ এই একই বিচার আমাদের সতর্ক করবে 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' উপন্যাসে কামনার সূত্রে গ্রথিত নয়নাংশু-মালতীর ইতস্তত সন্ধিস্থাপনার ইতিবৃত্ত এবং মালতীর ব্যভিচারের বর্ণনাকে উপন্যাস থেকে আলাদা ক'রে দেখতে, 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর সোমেন আর মীরার প্রেমহীন আসঙ্গকে, 'শেষ পাণ্ডুলিপি'তে বীরেশ্বর-গৌরীর ব্যভিচারকে, এবং 'গোলাপ কেন কালো'র রণজিৎ এবং কাজলের অতর্কিত আশ্লেষকে নির্বোধ স্বাতন্ত্র্যে অশ্লীল ক'রে তুলতে। যদিও প্রতিটি আশ্লেষ মূলত জৈব, আশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীদের বিচরণ ঘটনাকালে অন্য-এক লোকে, আশ্লেষের মুহূর্তের তাদের মনন এবং অনুভব প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট। মননের এই বিশিষ্টতা, অবস্থার এই প্রকারভেদেই, কখনো নিরুপায়ের আত্মসমর্পণ, কখনো অভ্যাসের সহিষ্ণু দাসত্ব, কখনো লালসা, কখনো এক নৈর্ব্যক্তিক প্রতিশোধস্পৃহা, কচিৎ প্রেম — এই কি বারংবার সোমেন, বীরেশ্বর, রাজীবলোচন, নয়নাংশু, মালতী, রণজিৎ, যমুনাবতী, এবং আসঙ্গের ষড়যন্ত্রে ধৃত

মিস্তিরের ফ্যাশনেবল হ'য়ে-ওঠা কন্যা উর্মিলা, রায়বাঘিনী যূথিকা, 'ঠাকুর তোমার নৈবিদ্যি সাজাও' ব'লে যে নিজেকে এক অলীক পুজোয় সমর্পিত করেছিল সেই সরমা, এদের সকলের সঙ্গেই রাজীবের দেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু যে-দেহে ছিল তার জিৎ, সেই দেহ আজ কুৎসিত ব্যাধিতে একটা কঙ্কালসার ঘেয়ো জানোয়ার হ'য়ে গেছে। রাজীবের চেতনায় যার প্রতিফলন হচ্ছে তা শ্লীল-অশ্লীলের বহু উর্ধ্বে সত্যের এক প্রতীতি।

আরো উদ্ধৃতি এবং তার অপটু ব্যাখ্যা দিয়ে এই রচনা দীর্ঘ করব না, রাবিশ ছাপতেও ছাপাখানা একই দাম নেয়। বস্তুত মনে হ'তে পারে, যে-জিনিস বুদ্ধদেব বসুর রচনায় নেই তা নিয়ে প্রবন্ধ ফেঁদে পাঠকের সময় নষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু সমসাময়িককালের রচনা পর্যালোচনাকালে আমরা অনেক সময় গৌণ কোনো সূত্র অবলম্বন ক'রে দু-একটি মূল্যবান ধারণায় উপনীত হ'তে পারি। আবার পড়তে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর অনেকগুলি উপন্যাস আমার কাছে নতুন ক'রে প্রতিভাত হ'ল, আগে যেগুলির বাণী ছিল অস্পষ্ট। একটা পুরনো কথা নতুন ক'রে বুঝলাম : সৎ শিল্পকর্মমাত্রই অন্বেষণ, সমগ্র জীবনই তার অন্বিষ্ট, জীবনের পাপ-পুণ্য, সুন্দর কুৎসিত, শুভ অশুভ, অমৃত হলাহল সব-কিছুকে আত্মসাৎ ক'রে শিল্পীর চেতনা সত্যাভিমুখী। এই সন্ধানে যে-শিল্পীর মনপ্রাণ উৎসর্গিত, নীতি-দুর্নীতি শ্লীল-অশ্লীল ইত্যাকার তুচ্ছ খণ্ডবিচার তাঁর রচনার প্রসঙ্গে অবান্তর। বস্তুত আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিরা শ্লীল-অশ্লীলের আলোচনা আর করেন না; আমি যে করলাম তার কারণ আমার কৈশোর-যৌবন মফস্বল শহরে কেটেছিল ব'লে তার মানসিকতা আমাকে মাঝে-মাঝে তাড়া করে।

অন্যান্য আসামীদের আকর্ষণ নয়? বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে আসঙ্গের বর্ণনায় আমাদের রিরংসা তো উদ্রিক্ত হয়ই না (আদালতের বিচারে যা অশ্লীলতার কষ্টিপাথর), বরং বিস্বাদ লাগে কাম, মনে ভয় জাগে, বেদনার সঞ্চার হয়। প্রেমের সহজ স্বাভাবিক পরিণতি যে-আসঙ্গ এবং পরিতৃপ্তি তার পরিবর্তে আমরা দেখি জাঁতিকলে বন্দী অসহায় জীবের কাতরতা। প্রেমে যেখানে বিকার জন্মেছে, আসঙ্গও সেখানে অসুস্থ। এক্ষেত্রে হয়তো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে প্রেম যে-ক্ষেত্রে সহজ এবং অনাবিল, তার কাহিনীতে আসঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটোদের লেখা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমেই উল্লেখ করা ভালো বাংলা শিশুসাহিত্য নিয়ে এ-যাবৎ যত আলোচনা হয়েছে, বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচর্চা' (ও 'প্রবন্ধ-সংকলন') গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধটি তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট — কিন্তু রচনাটির একটি অসম্পূর্ণতা এইখানে যে প্রবন্ধ রচনার প্রচলিত সৌজন্য ও রীতি অনুসারে বুদ্ধদেব বসু সেখানে নিজের শিশুপাঠ্য রচনাবলি সম্বন্ধে নীরব থেকে গেছেন — অথচ এটা না-মেনে উপায় নেই যে 'মৌচাক', 'রামধনু' ও পরবর্তীকালে 'রংমশাল' — এই তিনটি ছোটোদের মাসিক পত্রিকাকে জড়িয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের যে-ধারাটি তিরিশের যুগে গ'ড়ে উঠেছিলো বুদ্ধদেব বসু নিজেই সেখানে অন্যতম প্রধান লেখক ব'লে গণ্য হবেন। কবিতা, ছোটো-বড়ো নাটক (না কি নাটিকা), ছোট্ট হালকা কিন্তু স্পর্শাতুর প্রবন্ধ (এমন-কি প্রেমেন্দ্র মিত্রর সঙ্গে মিলে এক-সময়ে তিনি জীব-জগৎ সম্বন্ধে একাধিক বইও প্রণয়ন করেছিলেন : 'আজগুবি জানোয়ার' ও 'সাগর-রহস্য') উপন্যাস, অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্যকাহিনী, খেয়ালি লেখা, হাসির গল্প, ভূতের গল্প, রূপকথা, এমন-কি অনুবাদ। এখনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন বহু রচনা যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে, তা নিশ্চয়ই উৎসুক পাঠক লক্ষ করেছেন। তাঁর গ্রন্থপঞ্জি দেখলেই সন্দেহাতীতভাবে এই তথ্যটি চোখে প'ড়ে যায় ছোটোদের জন্য লেখার প্রচলিত সবগুলো ধরনেই তিনি কিছু-না-কিছু লিখেছেন। এখানে বলা উচিত যে আরো কতকগুলো ধরন — বা রচনাকর্মের বিশিষ্ট পদ্ধতি — তিনি নিজেই প্রবর্তনা করেছিলেন, যেগুলো একান্তভাবেই তাঁর স্বকীয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা শীলমোহর-করা। অধিকন্তু ন দোষায় ব'লেই এই বাহুল্য কথাটি এখানে বলতে চাই যে বুদ্ধদেব বসুর যে-কোনো রচনাই সুখপাঠ্য — তাঁর ভাষায় ল্যবণ্য আর ফুর্তি, চটপটে ছিমছাম ভঙ্গি ও প্রবাহ — সবই তাঁর ছোটোদের লেখাতেও উপস্থিত; শিক্ষিত, সপ্রতিভ, চিন্তায়-ভরা বাক্যবন্ধ ও অনুচ্ছেদ — কোথাও ভুরু কুঁচকোনো নেই, কপালে ভাঁজ নেই — মসৃণ, সতেজ ও উদ্দীপক; কেবল ভাষাশিল্পের এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে অন্য লেখকদের চেয়ে পৃথক ক'রে চিনিয়ে দেয়। আর এটাও বলা বাহুল্য যে কোনো লেখক তাঁর মূল সুরটি খুঁজে বার করবামাত্র তাঁর সব লেখাতেই তার গুঞ্জন শোনা যায় — সেটাই তাঁর পাঞ্জা হ'য়ে ওঠে। সেদিক থেকে হয়তো বড়োদের ছোটোদের এ-রকম ক'রে ভাগও করা যায় না। বুদ্ধদেব বসুর ছোটোদের লেখার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে তা বয়স্ক পাঠকদেরও নানাভাবে আকৃষ্ট করতে পারে — সব পাঠকেরই জন্য তাতে কিছু-না-কিছু থেকে যায়। আর তাছাড়া একটা স্তরে গিয়ে হয়তো দেখা যায় যে 'একেবারে শিশুসেব্য' সাহিত্য ব'লে আসলে কিছু নেই — কিছু লেখা ছোটোদের অভিজ্ঞতা বা চৌহদ্দির বাইরে পড়ে, তাদের বুঝতে অসুবিধে হয়, অস্বস্তি জাগায়, তাদের অভিনিবেশ বা অনুধাবনক্ষমতাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু শেষ অবধি — আমি অনেক দিন লক্ষ ক'রে দেখেছি—ছোটোদের জন্য

উদ্দিষ্ট যে-সব লেখা বড়োদেরও কিছু দেয়, তা-ই শেষ অবধি টেকসই হয়, পরের যুগেরও ছোটোদের ভালো লাগে, চিরায়ত হ'য়ে যায়। সেদিক থেকে বলতেই হয় যে বুদ্ধদেব বসুর ছোটোদের লেখা দীর্ঘস্থায়ী হবার ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে।

২

প্রবন্ধ রচনার 'শর্ত' ও 'ভদ্রতা' অনুযায়ী "বাংলা শিশুসাহিত্য" আলোচনাটিতে বুদ্ধদেব বসু নিজের রচনাবলি সম্বন্ধে নীরব থাকলেও সাধারণভাবে আমাদের চিন্তার কতগুলো প্রধান সূত্র পাওয়া যাবে। যেমন তিনি দেখিয়েছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকাটিকে কেন্দ্র ক'রে শিশুসাহিত্যের যে-ধারণা ও ধারাটি গ'ড়ে উঠেছিলো, 'মৌচাক' পরবর্তী শিশুসাহিত্যের সঙ্গে তার একটি চরিত্রগত বড়ো পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের ধারণার মধ্যেই তাঁর নিজের গল্প রচনার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিহিত আছে। এখানে একটা দিকে লক্ষ করা যেতে পারে। বহু পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন বুদ্ধদেব বসুর অনেক গল্প প্রথমে বেরিয়েছিলো ছোটোদের বার্ষিকীগুলোয়, কিন্তু পরে স্থান পেয়েছে তাঁর বড়োদের বইতে : "মা, বোন, ভাই", "দুই মা" ('চার দৃশ্য' ও 'ভাসো আমার ভেলা'), "হৃদয়রঞ্জনের সর্বনাশ" (একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু') প্রভৃতি গল্পের নাম এ-প্রসঙ্গে চট ক'রে মনে প'ড়ে যায়। সত্যি বলতে, লেখকের মতো আমরাও ঠিক কখনোই মনস্থির ক'রে উঠতে পারি না যে এগুলোকে কেবলমাত্র ছোটোদের জন্য রচিত গল্প বলবো, না কি বয়স্ক ও অভিজ্ঞ পাঠকদেরও দৃষ্টি এগুলোর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবো। কেননা গল্পগুলোর মধ্যে এমন-একটি চাপ ও স্তর আছে যা স্কুলের ছোটো ছেলেদের চোখ এড়িয়ে যাবে, অথচ সেই সঙ্গে অস্বস্তি জাগাবে। আসলে এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর গল্পের স্বভাবগত।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম ছোটোদের গল্প (দ্র° : 'জয়ন্তী মৌচাক'-এর নিবন্ধ, 'ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প'র ভূমিকা) "প্রাইজ" ('রঙিন কাচ' ও 'ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প')-এর সঙ্গে সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' বা 'বহুরূপী'র গল্পগুলোর একটা ছোট্ট তুলনা করলেই স্বভাবের এই পার্থক্যটা স্পষ্ট হবে। "চালিয়াৎগুলোর জব্দ হওয়ার গল্প" বা স্কুলের ছেলেদের জীবনের নানা হাসি ও দুঃখের অন্তরঙ্গ বিবরণ ও কাব্যকীর্তি — এর পাশে রাখলেই "প্রাইজ" গল্পটির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে, এই স্বাতন্ত্র্য বা স্বভাবগত পার্থক্যটি যে লেখকের অভীষ্ট ছিলো, সচেতনভাবে তৈরি হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহই থাকে না — কেননা এই গল্পটিও হ'তে যাচ্ছিলো স্কুলের ছেলেদের ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প, দু-এক জায়গায় এমন-কি চালিয়াতির গল্প হ'য়ে-পড়ারও সম্ভাবনা ছিলো — কিন্তু শেষ অবধি গল্পটি একেবারে বদলে যায় যখন শিবু তার রাশি-রাশি প্রাইজের বই নিয়ে হস্টেলে তার ফাঁকা ঘরে ফেরে, সুপারিনটেনডেনটের বাচ্চা ছেলেটি এলে জিগেশ করে বাড়ি থেকে তার কোনো চিঠি এসেছে কিনা, তারপর তার ঘ্যানঘেনে আবদারে বিরক্ত হ'য়ে তাকে চড় কষিয়ে দেয়া, সে কেঁদে ফেললে পর তাকে প্রাইজ-পাওয়া সব বই দেয়া, তারপর চিৎপাত হ'য়ে বিমর্ষ শুয়ে-পড়া — এই ছোটো অনুপুঙ্খগুলোই গল্পটিকে একেবারে অন্যরকম ক'রে দিয়ে যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই গল্প পূর্ববর্তী যুগে প্রযোজিত হ'তে পারতো না — তখন যাকে ছোটোদের গল্প বলতো, এটা তার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে গেছে, নয় সে-রকম সামাজিক কি বহুমুখী, বরং হ'য়ে উঠেছে, অনেক চাপা, অন্তর্মুখ — বহুমুখিনতার বিবরণমাত্র না-হ'য়ে থেকে তা একেবারে প্রথমেই তাঁর রচনাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে যায়।

৩

প্রথম গল্পটিই অন্যরকম। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বুদ্ধদেব বসু কখনোই প্রচলিত ধরনের গল্প লেখেননি। ভ্যান্টা, মংটু, কান্তিকুমার প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে প্রয়োজিত গল্পগুলো, বা তার ব্যঙ্গরচনা ইত্যাদিকে মনে হয় প্রতিভার অপব্যয় : এ-সব চরিত্র বা ঠাট্টা তাঁর রচনাভঙ্গির মৌল স্বভাবের সঙ্গে বেমানান। তুচ্ছ স্নবারির প্রতি টিটকিরি ("রবীন্দ্র-রচনাবলী"), বা ততোধিক তুচ্ছ সাহিত্যের ক্ষণিক হুজুগ নিয়ে ঠাট্টা ("কবি হওয়া সোজা") — ও-সব অনেক দুর্বল লেখকের তূণীরের শর হ'তে পারতো, কিন্তু তাঁর মতো কবিস্বভাবের পক্ষে এ-সব নিয়ে কয়েক পাতা লেখাই মানে সময় ও শক্তির অহেতুক বাজে খরচ — এগুলো কেবল এটাই বোঝায় যে সাময়িক অনেক তুচ্ছ বিষয় নিয়েও তাঁর রাগ হ'তো বা হাসি পেতো। কিন্তু আমরা আগেই বলবার চেষ্টা করেছি যে তথাকথিত সামাজিক বা বহির্মুখী বিষয়ের গল্পের চেয়ে তাঁর নিজস্বতা অনেক বেশি পরিস্ফুট হয় যে-সব গল্প একটা স্তরে গিয়ে অনেক চাপা দিককে স্পর্শ ক'রে আসে।

অর্থাৎ, বাইরের জীবনের চেয়ে কারু অন্তর্জীবনের কাহিনীই তাঁর ছোটোদের গল্পে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়ভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন, কোনো বাচ্চাকে সামলাতে গিয়ে মুখে-মুখে বানানো গল্পগুলো ("ঘুমের আগের গল্প", "খাবার আগের গল্প", "জলে থাকে মাছ" প্রভৃতি) কেবলমাত্র তাঁর হাতেই প্রয়োজিত হ'তে পারতো। স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাসিঠাট্টা দুঃখদুর্দশার গল্পের চেয়ে, ভ্যান্টা, মংটু ইত্যাদির কাহিনীর চেয়ে এ-গল্পগুলোর স্বাতন্ত্র্য সর্বাগ্রে এই তথ্যটিতে যে এ-গল্পগুলো বাইরে থেকে খুবই বাস্তব, পারিবারিক চেনা গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ (এটা আরেক দিক থেকে এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে কারু জগৎ কী ভাবে ক্ষুদ্র হ'য়ে আসছে, এদের তারই একটি পর্যায় ব'লে গণ্য করা যায়), কিন্তু সেইসঙ্গে এ-গল্পগুলো পাঠককে কল্পনায় দীক্ষা দেয়, মনোজগতের সন্ধান দেয়। এই গল্পগুলো ক্রমে আমাদের প্রস্তুত ক'রে তোলে পুরোনো নোংরা, শ্যাওলা-পড়া দেয়ালসর্বস্ব হৃদয়রঞ্জনের সর্বনাশের জন্য। তাছাড়া এই ধরনের গল্পগুলো আমাদের দেখায় যে কারু আশ্রয় হিশেবে সামাজিক না-হোক পারিবারিক জীবন আছে এখনো, আছে ব্যক্তিগত ও নিবিড় সম্পর্ক — ছোট্ট ভাই বা বোনটি কিংবা ছেলে-মেয়ে। কিন্তু আস্তে-আস্তে সেই জগৎটিও যে বেশির ভাগ সময় ভেঙে পড়ে, আরো যে একটি নিদারুণ জগৎ আছে, ভয়ংকর স্বার্থপর পরস্পর সম্বন্ধহীন নিঃসঙ্গ জগৎ, মমতাহীন নিষ্ঠুর জগৎ — তার ইঙ্গিত নিয়ে আসে "মা, বোন, ভাই", "দুই মা" ইত্যাদি গল্প। আর তখন একাকিত্ব ছাড়া আর কিছু থাকে না — থাকে নিঃসঙ্গতা, আর তারই মধ্যে সান্ত্বনা হিশেবে দেয়াল বা কল্পনার জগৎ — মনে-মনে কিছু রচনা করবার ক্ষমতা — যেমন ছিলো হৃদয়রঞ্জনের।

ছোটোদের জন্য লেখা একটি উপন্যাস (বড়োদেরও উপন্যাসটি আকৃষ্ট করবে) 'অন্য কোনোখানে'র মধ্যে একটি নিঃসঙ্গ ও স্পর্শাতুর ছেলের গ'ড়ে-ওঠার কাহিনী সেই জন্যই অনেকগুলো স্তর স্পর্শ ক'রে যায়। গড়নটি 'বিলডুঙসরোমান'-এর অন্তর্ময় ও চাপা কাহিনী (সত্যি, প্রচলিত অর্থে কাহিনী বলতে তেমন-কিছু তাতে নেইও) — তন্ময় কলকাতার উদ্দেশে রওনা হ'তেই ট্রেনের চাকায় বাঙ্ময়, স্বপ্নময় ও ছন্দোময় আওয়াজে কাহিনীর যবনিকা প'ড়ে যায়। যাকে বলি মন, মনের জগৎ, তার উন্মীলন, উন্মোচন, উদ্ঘাটন — বুদ্ধদেব বসুর বহু ছোটোদের লেখার এটাই অভীষ্ট। এই বিষয়টি তাঁর বহু বয়স্কপাঠ্য লেখারও বিষয় ব'লেই আমরা গোড়াতেই বলতে চাচ্ছিলুম যে একটা স্তরে তাঁর বড়োদের ও ছোটোদের লেখা পরস্পরের

পরিপূরক, সম্পূরক। বা আরো স্পষ্ট ক'রে বলা যায়, তাঁর ছোটোদের লেখার সঙ্গে যাঁরা অভ্যস্ত ও পরিচিত, তাঁরা অনেকগুলো চাবি পেয়ে যান যা-দিয়ে তাঁর সামগ্রিক রচনাকর্মের রহস্যভেদ করা যায়।

৪

চাপে প'ড়ে. তাগাদায়, ফরমায়েশে — বহুভাবেই হয়তো তাঁর অনেক শিশুসেব্য রচনার সূত্রপাত হয়েছিলো। কিন্তু লেখা — বা রচনা — যেহেতু তাঁর আত্মপ্রকাশেরই উপায়, মাছের কাছে জল বা পাখির কাছে পাখার মতো, এবং তিনি যেহেতু নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার লেখক নন, উৎসুক সচেতন ও প্রস্তুত লেখক — যেহেতু তাঁর বলবার কথা আছে, সেইজন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছোটোদের লেখা একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি ক'রে নিয়েছিলো। এমন-কি তিনি যাঁদের তরজমা করেছেন, সে-ক্ষেত্রেও লেখক নির্বাচনের মধ্যেই মনের একটি ধরন চোখে পড়ে : তিনি অনুবাদ করেছেন হান্স আণ্ডেরসেন ('অপরূপ রূপকথা') ও অস্কার ওয়াইল্ড-এর রূপকথা ('হাউই'); নাট্যরূপ দিয়েছেন নিকোলাই গোগোল-এর "ওভারকোট" — যাঁদের রচনা যুগপৎ হিংস্র-নিষ্ঠুর ও স্নিগ্ধ-সুকুমার, যুগপৎ অভিজ্ঞ ও অপাপবিদ্ধ, যুগপৎ সারল্য ও জটিলতার অভিজ্ঞান — যাঁদের রচনা বড়োদেরও সবসময় কিছু-না-কিছু দেয় — যাঁদের ভাবনা সংক্রামক ও তন্ময়, যাঁদের ঘনিষ্ঠতা ও সহমর্মিতা অনেক বেশি বরং কবিতার সঙ্গে। অস্কার ওয়াইল্ড-এর অন্য রচনা যে-রকমই হোক না কেন, তাঁর রূপকথাগুলির আবেদন হান্স আণ্ডেরসেন-এর প্রভাব সত্ত্বেও অফুরন্ত। এখানে উল্লেখ করা দরকার বুদ্ধদেব বসুর শিশুসাহিত্যের একটা মস্ত অংশ এই রূপকথার জগৎকে স্পর্শ ক'রে যায়। "যা চাও তাই", "মিনুর নতুন জুতো", "মিস টোম্যাটো", "কমলাদেবী" — এ-সব লেখায় উপদেশ আছে, ঠাট্টা আছে, সাময়িক বিষয়েরও ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সব সত্ত্বেও গল্পগুলোর আপাত সারল্যের আড়ালে, রূপকের খোলশের মধ্যে, সেই মনকেই কাজ করতে দেখা যায় হান্স আণ্ডেরসেন বা অস্কার ওয়াইল্ড-এর রূপকথাকে যা স্মরণীয় ক'রে রেখেছে। যুগপৎ শিশু ও বয়স্ক সেই মন, জ্যান্ত ও স্পর্শাতুর — গল্পগুলোকে জ্বলজ্বলে ক'রে রেখেছে সারল্যের উল্লাস, কিন্তু ভিতরে পৃথিবীর জটিল আঁধারগুলিও অস্বীকৃত হয়নি। এই রূপের ও রূপকের জগৎ যে বাংলা শিশুসাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এমন-সব বিষয় নিয়ে এ-সব গল্পে আলোচনা আছে, যা পাঠককে জীবনে ও সাহিত্যে দীক্ষিত করে, ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে আশপাশকে, চায় শনাক্ত করতে, হদিশ পেতে, অন্তরাখ্যান দিতে। "প্রাইজ", "প্রথম দুঃখ" ইত্যাদি গল্পের মধ্যে জীবনের ভিতরকার অনেক কষ্টের ও মন-খারাপ-করার সঙ্গে আমাদের চেনা হ'তে থাকে — "বাবা", "জলে থাকে মাছ", "খাবার আগের গল্প", "ঘুমের আগের গল্প" ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জগতের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে কল্পনার সন্ধান দেয় ('বারো মাসের ছড়া'র বাবা, রুমি ও পরিমা-র পত্রগুলো এক্ষেত্রে স্মরণীয়), "মা, বোন, ভাই", প্রভৃতি গল্প তার পরে দেখিয়ে দেয় পারিবারিক স্নেহসম্বন্ধ ও নিষ্ঠুর স্বার্থপর ভয়ংকর ও ভাঙনোম্মুখ — তারপরে স্বভাবতই থাকে রূপক, প্রতীক ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কোনো-একটি চাপা, লুকোনো ও অবিনশ্বর জগতের অনুসন্ধান।

একটি অত্যন্ত চেনা গল্প কীভাবে তাঁর হাতে রূপান্তরিত ও পুনর্জাত হ'লো, এখানে সেই

দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'হামেলিনের বাঁশিওলা' (বার্ষিকীতে নাম ছিলো : "একটি আইনঘটিত ব্যাপার") গল্পটি তাঁর হাতে যেভাবে আদ্যোপান্ত বদলে গিয়েছে, তা আমাদের অভিনিবেশ চায়। পাইড পাইপার-এর এই চেনা ও পুরোনো গল্পটির এই রূপান্তর নানারকম চাপা ও গোপন অর্থে ভ'রে ওঠে — হ'য়ে ওঠে ইঙ্গিতময়, প্রতীকী, বহুস্তর — আর "হৃদয়রঞ্জনের সর্বনাশ" ইত্যাদি গল্পের সঙ্গে তার অন্তর্লীন সম্বন্ধটা চোখে প'ড়ে যায়। বাইরের জগতের হুলুস্থূলু চ্যাঁচামেচি ঘটনা ও দুর্ঘটনা নয় — মানুষের মনের মধ্যকার অন্য একটি লুকোনো জগতের দিকে তিনি ছোট্ট পাঠকদের সচেতন ক'রে যান — কখনো রূপায়ণের অভিনবত্ব কখনো-বা বিষয়-নির্বাচন আমাদের বুঝিয়ে দেয় এই গল্পগুলো অন্যবিধ, এরা চায় আমাদের মনোযোগ অভিনিবেশ ও স্পর্শাতুরতা। চির চেনা পাইড পাইপার-এর গল্পের আড়ালে যে অন্য-কোনো জটিল কষ্টকর ও ভীষণ জগৎ থাকতে পারে, সব চেনা জিনিশের ছদ্মবেশ বা ভাঁজ খুলে ফেললে যে অন্য বেশ অন্য স্বর দেখা যায় — তাঁর গল্প এই অভিজ্ঞতাই দেয়। এবং বলাই বাহুল্য, বুদ্ধদেব বসু কথিত বাংলা শিশুসাহিত্যের 'সোনালি যুগে' তা অভাবিত ছিলো।

নিশ্চয়ই এটাও সবাই লক্ষ করেছেন যে বুদ্ধদেব বসুর স্বকীয়তার ছাপমারা গল্পগুলিতে তথাকথিত ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ খুবই কম। সেই অর্থে যাকে বলে গল্প বলা — বর্ণনা, ভাষাশিল্প ইত্যাদি আলাদা ক'রে নিয়ে কেবল কাহিনী শোনানো — সেইজন্যেই তাঁর লেখায় নেই। প্রায় কিছুই নেই, বলতে গেলে, কোনো-কোনো গল্পে — নেই কোনো জট বা গ্রন্থি, যে-টা ছাড়িয়ে ফেললেই গল্প তৈরি হ'য়ে যায়।

অর্থাৎ, পুরো রচনাটিকেই গ্রহণ করতে হবে আমাদের; এই-যে সংক্ষিপ্ত ক'রে সারমর্ম শোনানো যাবে, তাঁর বেশিরভাগ লেখাই সে-রকম নয়। তাঁর লেখা থেকে চেষ্টা করলেও কোনো সিণ্ডিকেট কোনো 'সচিত্র কমিকস' তৈরি করতে পারবে না — সেই অশিক্ষিত ও অশালীনদের জন্য তাঁর রচনায় কোনো সুযোগ নেই।

৫

"বাংলা শিশুসাহিত্য" প্রবন্ধে তিনি তাঁর সমকালীন শিশুসাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বহু স্পর্শাতুর ও উন্মীলক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি নিজে যেহেতু বাংলা শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব, যেহেতু তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যে অনেক নতুন অনুভূতি, চিন্তা, রূপায়ণের অভিনবত্ব, রচনার বহুবিধ কৌশল ও ভঙ্গির প্রবর্তনা করেছিলেন, সেইজন্যে নিজের সম্বন্ধে কিছু না-বলাই ছিলো সেই রচনাটির একমাত্র অসম্পূর্ণতা — এবং প্রবন্ধ রচনার ভদ্রতায় নিজের কথা সাত কাহন ক'রে বলতে বাধে ব'লেই সে অসম্পূর্ণতা কখনোই — হায়! — অপনোদন করা যাবে না। অথচ 'মৌচাক'-'রামধনু'-'রংমশাল'-এর পর শিশুসাহিত্যের চরিত্র যেভাবে বদলেছে, তার জন্য অনেকখানি দায়িত্ব তাঁর। অন্তত তাঁর নিজের রচনা নয় 'বিশুদ্ধরূপে নাবালকসেব্য'; তাঁর নিজের লেখায় 'বুদ্ধির পরিণতিক্রমে ইঙ্গিতের গভীরতা বাড়ে'; তাঁর রচনা 'বিশেষ অর্থে শিশুপাঠ্য থেকেও ... বড়ো অর্থে সাহিত্য, শিল্পকর্ম'; কেননা 'ছোটোদের বই লিখতে গিয়ে' তিনি লিখেছেন 'সকলের বই', কেননা 'সাবালক পাঠকও তাঁর' লক্ষ্যের বহির্ভূত 'ছিলো না।'

'ছিলো না', কারণ — হায়! — বুদ্ধদেব বসু আজকাল 'বিশেষ অর্থে শিশুপাঠ্য' রচনা আর লেখেনই না।

দর্পণে দুই মুখ

অমিয় দেব

প্রায় ভাবতে বসেছিলাম রবীন্দ্রনাথের পরে আর নাটক লেখা হ'লো না বাংলাভাষায়। কবিতা লেখা হ'লো; উপন্যাস, ছোটগল্প, এমনকি প্রবন্ধও — কিন্তু নাটক? এই সেদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আমাদের শেষ এবং আধুনিকতম নাট্যকার; অথচ 'শ্যামা' প্রকাশের পর পঁচিশ বছর কেটে গেছে ততদিনে। নাট্যরচনায় আমাদের এই অনীহা লক্ষ ক'রে কেউ-কেউ এমন সন্দেহও পোষণ করতে আরম্ভ করেছিলেন যে নাটক দেখতে ও নাটক করতে ভালোবাসলেও নাটক রচনাপ্রতিভা থেকে আমরা চরিত্রগতভাবেই বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, এবং তেমন উজ্জ্বল না-হ'লেও মধুসূদন-দীনবন্ধুরাও তা-ই। কিন্তু গত তিন বছরে বুদ্ধদেব বসু প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে নাট্যপ্রতিভা আমাদেরও আছে; এবং যে-বিবর্তন কবিতায় উপন্যাসে ছোটগল্পে প্রবন্ধে সম্ভব, তা সম্ভব নাটকেও। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' থেকে 'কালসন্ধ্যা' পর্যন্ত প'ড়ে আর আমরা বলতে পারি না যে বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথেই থেমে আছে; রবীন্দ্রনাথের এক যথার্থ উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব ঘটেছে আকস্মিক।

আকস্মিকই বলবো, কেননা আমরা তো সত্যি ভাবিনি যে বুদ্ধদেব কখনো নাটক লিখবেন। অথচ ভাবতে হয়তো পারতাম, লুপ্ত 'রাবণ' এবং 'মায়া-মালঞ্চ' ও 'দালিয়া'র ভিত্তিতে নয়, গভীরতর অন্য-এক ভিত্তিতে। সুধীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে বুদ্ধদেবের পরিণতি ঘটেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যে। বাইশ বছর আগে যা সত্য ছিলো দশ বছর আগে তা-ই সত্যতর হ'লো 'যে-আঁধার আলোর অধিক' প্রকাশে। 'বন্দীর বন্দনা' কিংবা 'কঙ্কাবতী'র সেই অমিত আত্মকথন এখানে নেই, পরিবর্তে লক্ষ করলাম আমরা এক তদাত্মতা, যেমন দেখা গিয়েছিলো রিলকের কবিতায়, তাঁর রদ্যাঁর সংস্পর্শে আসবার পর। এলো এক ঘনতা যার ফলে বস্তু আর ব্যক্তির দ্বিমাত্রিক দর্পণমাত্র রইলো না, হ'য়ে উঠলো এক স্বয়ংভর অস্তিত্ব ব্যক্তির সঙ্গে যার সম্পর্ক আত্মীয়তার, বন্ধুতার, সমবেদনার। যেন খেয়াল ছেড়ে ধ্রুপদ আরম্ভ করলেন বুদ্ধদেব। এই তদাত্মতাই কিন্তু নাটকেরও জনক, এরই অন্যতর পরিণতি সেই ত্রিমাত্রিক জগৎ যেখানে বিবিধের সহ-অবস্থান শুধু সম্ভবপর নয়, স্বাভাবিকও; যেখানে ব্যক্তি বস্তুকে আড়াল ক'রে থাকে না, ব্যক্তি থাকে বস্তুরই অন্তরালে এক আদর্শ দ্রষ্টার মতো। এবং বুদ্ধদেব, স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রায় অদ্বিতীয় হ'য়েও যিনি নিরন্তর গতিশীলতায়ও প্রায় অদ্বিতীয় — তিনি যে এই তদাত্মতার পরিণতি অর্জন ক'রে নাটকেও পৌঁছোবেন, তাতে বোধহয় খুব অবাক হবার কিছু নেই।

কোনো-কোনো কবি নাটক লিখতে আরম্ভ করেন গোড়া থেকেই; তাঁদের নাটকের পরিণতি

ঘটে তাই ধীরে-ধীরে, কবিতার পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে। আবার কেউ-কেউ আছেন যাঁরা নাটকে হাত দেন তাঁদের পরিণতির চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছে। বুদ্ধদেব দ্বিতীয় দলের, তাঁর 'রাবণ', 'মায়া-মালঞ্চ', 'দালিয়া' সত্ত্বেও (আন্তরিক তাগিদ যদি থাকতো তাহ'লে কি লুপ্ত পাণ্ডুলিপির স্মৃতি ও প্রতিষ্ঠিত কাহিনীর নাট্যরূপায়ণেই তিনি তৃপ্ত থাকতে পারতেন?) দ্বিতীয় দলের। ফলত, প্রথম প্রকাশেই তাঁর নাটক ষোলো-আনা শিল্পিত, তাতে এমন দুর্বলতার ছাপ নেই যা, অসামান্য প্রতিভার যাদুস্পর্শ পেয়েও, কোনো 'রাজা ও রাণী' বা কোনো 'কাতিলিন'-এ যাকে। যাকে বলা যায় নাটকের আভ্যন্তরীণ গণিত, যার প্রয়োগগুণে একজন কালিদাস বা রাসীন বা ইবসেন নাট্যকারমাত্রেরই আদর্শস্থানীয় এবং যার একান্ত অভাব বা গুরুতর বিপর্যয় ঘটলে এমনকি একজন শেক্সপিয়রও সত্যি-সত্যি 'বর্বর' হ'য়ে উঠতে পারেন, তা বুদ্ধদেব যেন ভিতরে-ভিতরেই রপ্ত ক'রে ফেলেছেন। কাগজ টেনে সে-গণিত তাঁকে শিখতে হ'লো না, আকৈশোর কবিতা লিখে যে-বিপুল ছন্দের তিনি অধিকারী হয়েছেন এই কুশলতা তারই অন্যতম এক স্ফূর্তি।

কিন্তু কেবল কলাকৌশল, কেবল গণিতজ্ঞান নয়; তাকে আশ্রয় ক'রে আছে উপলব্ধির সেই গভীরতা যা না-থাকলে এমনকি একজন কালিদাসও 'শকুন্তলা' লিখে উঠতে পারেন না, নেহাতই 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এর রচয়িতা হ'য়ে থাকেন। বুদ্ধদেবের নাটকের উপজীব্য অস্তিত্ববিষয়ক কয়েকটি উদ্ভাস, জীবনের কোনো কোনো রহস্য। প্রেম কী, বেঁচে থাকবার আদৌ কোনো অর্থ আছে কি না, প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর কী সম্পর্ক, আদর্শবাদ আর উন্মাদনার যোগ কোথায়, সত্যের স্বরূপ কী, কাল কী — যেন কোনো ধর্মবকের এই প্রশ্নপরম্পরার উত্তর দেবার চেষ্টা করছেন বুদ্ধদেব, এবং করছেন, যুধিষ্ঠিরের মতোই, আবেগের তাড়নায় নয়, প্রজ্ঞার প্রেরণায়। চিরকালীন এই প্রশ্নাবলি, এবং সম্ভবত সেই কারণেই এখন পর্যন্ত লেখা বুদ্ধদেবের নাটকগুলির প্রধান তিনটির কাহিনীই পুরাণ থেকে আহৃত। পুরাণের পুনর্ব্যবহার প্রতিযুগই করে, রবীন্দ্রনাথও করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে একমাত্র বুদ্ধদেবই বোধহয় তা সার্থকভাবে করেছেন। ক'রে তিনি যে কেবল রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার অর্জন করেছেন তা-ই নয়, এই শতকের অনেক প্রতীচ্য অগ্রজ ও সমবয়সীরও তুল্য হ'য়ে উঠেছেন। হোফমানষ্টাল কিংবা এলিয়ট, আনুঈ কিংবা সার্ত্র-এর কথা, বুদ্ধদেবের নাটক পড়তে-পড়তে মনে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ঐতিহ্য ও আধুনিকতা প্রসঙ্গে এলিয়ট যা-বলেছিলেন, বুদ্ধদেবে তা যেন আরেকবার প্রমাণিত হ'লো। প্রয়োজন ছিলো এই প্রমাণের, কারণ আমরা যেন প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম যে সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন তাৎক্ষণিক অনুভূতিমালা। এই প্রমাণের তাৎপর্য আমরা আরো বুঝতে পারি যখন দেখি প্রমাণ করলেন এমন একজন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে যাঁর খ্যাতি প্রধানত তাঁর নিরন্তর আধুনিকতার জন্যে।

বলা বাহুল্য, পুরাণই শাশ্বতের একমাত্র দর্পণ নয়; যেমন পুরাণে তেমনি বর্তমানেও বুদ্ধদেব জীবনের শাশ্বত রহস্যের প্রতিবিম্ব খুঁজেছেন। তাঁর তিনটি নাটকের আশ্রয় বর্তমান — আসলে চারটির, যদিও চতুর্থ নাটকটির মূল ভিত্তি পৌরাণিক। কিন্তু প্রতীচ্য অর্থে যাকে 'বাস্তববাদী' (পেশাদারী বাংলা মঞ্চে তাকেই কি অনেক সময় 'সামাজিক' বলা হ'য়ে থাকে?) নাটক বলা যায় বুদ্ধদেব তা লেখেননি — অন্তত এখন পর্যন্ত না। বাস্তবের ভূমিকা তাঁর নাটকে গৌণ,

খুবই গৌণ, শুধু বর্তমানকে মূর্ত ক'রে তুলবার জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তা-ই, বর্তমানের কোনো 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা তিনি একেবারেই করেননি। অর্থাৎ, তিনি 'পুতুলখেলা' কিংবা 'প্রেত'-প্রণেতা ইবসেনের সগোত্র নন, সগোত্র নন 'তাঁতিরা'র হাউপ্ট মানের, এমনকি 'চেরিকুঞ্জ'-'তিনবোন'-এর চেকভেরও না; গোত্রে তাঁর ঈষৎ মিল আছে হয়তো মধ্য-বিশ শতকের কোনো-কোনো প্রতীচ্য নাট্যকারের সঙ্গে, যদিও তাঁদের কারো-কারোর সুচিন্তিত শৃঙ্খলাহীনতা তাঁর নাটকে নেই। জানি না বুদ্ধদেব আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা, কিন্তু তাঁর অন্তত একটি নাটক প'ড়ে আমার সামুয়েল বেকেটের কথা মনে পড়েছিলো — শুধু বিষয়ের সামান্যতার জন্যে নয়, ভঙ্গির সাদৃশ্যের জন্যেও। আমার ধারণা বুদ্ধদেব 'বাস্তববাদী' নাটক কদাচ লিখবেন না, লিখতে পারেন না; যে-বস্তুস্বাতন্ত্র্য থেকে তাঁর নাটকের উদ্ভব হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তববাদের কোনোই যোগ নেই। বাস্তববাদ ভালো না মন্দ এ-প্রশ্ন এখানে উঠছে না, এবং বাংলাভাষায় 'বাস্তববাদী' নাটক আর কখনো লেখা হবে কি না সেই প্রশ্নও এ-প্রসঙ্গে অবান্তর; আমি আলোচনা করছি বুদ্ধদেবের নাট্যরীতি নিয়ে এবং আমার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী — যদি একে ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যিই বলা যায় — নেহাতই সেই বিষয়ে।

২

এই নিয়ে পাঁচবার পড়লাম 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। পাঁচবারই সেই পরম তৃপ্তি পেয়েছি যা কেবল মহৎ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এক অতি-প্রাচীন পুরাণের এমন আধুনিক রূপায়ণ খুব বেশি দেখিনি। আধুনিক, কিন্তু এ-আধুনিকতা পুরাণে বিধৃত উল্লাসের বিকার ঘটিয়ে নয়, তারই সম্প্রসারণ ক'রে, তাতেই বিশ শতকের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ভাবনার সঞ্চার ক'রে। পুরাণের উল্লাস কামবিষয়ক — কাম কী ক'রে উজ্জীবন আনে, কতটা প্রয়োজনীয় তা জীবনের পক্ষে, সে-ই তার প্রতিপাদ্য। বুদ্ধদেব এর সঙ্গে যোগ করেছেন প্রেম, উদ্‌ঘাটন করেছেন তার স্বরূপ, দেখিয়েছেন কামের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। সার্থক এই সংযোজন, কেননা এর ফলে একদিকে যেমন কাম তার পরিপূরক পেলো, তেমনি অন্যদিকে প্রেম পেলো তার বাস্তব ভিত্তি — যেমন একদিকে পুরাণ হ'য়ে উঠলো পূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি রোমান্টিকতার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমাদের প্রায়-বায়বীয় প্রেমাদর্শ ইন্দ্রিয়ের শক্ত মাটি পেলো। পুরাণ দেখেছিলো কেবল দেহকেই, বুদ্ধদেব তাতে প্রতিষ্ঠা করলেন মন; রোমান্টিকতা মনকেই সর্বস্ব জেনেছিলো, বুদ্ধদেব তাকে দিলেন দেহের আশ্রয়। ছত্রিশ বছর আগে 'বন্দীর বন্দনা'য় যে-দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিলো, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে যেন তার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটলো; অবশেষে খুলে গেলো সেই আযৌবন-নন্দিত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দরজা। অন্তর্লোকে যা-দেখলেন তিনি তা অনেকটা উত্তর-পঞ্চাশে ইয়েট্‌স যা দেখতে পেয়েছিলেন তার মতো, কিংবা মধ্যবয়সেই গ্যেটের কাছে যা প্রতিভাত হয়েছিলো তার সঙ্গে তুলনীয়।

সম্প্রতি এক সমালোচক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পাঠের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে 'চিত্রাঙ্গদা'র উল্লেখ করেছেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র কথা স্বভাবতই মনে পড়ে, তবে নেহাতই অভিঘাতের সমতার জন্যে নয়, বিষয়বস্তুর বহুলাংশ সাদৃশ্যের জন্যেও। 'চিত্রাঙ্গদা'ও কাম এবং প্রেমের সংঘাত নিয়ে রচিত, যদিও সে সংঘাতের রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত নির্বহণ বুদ্ধদেবের নির্বহণ থেকে

ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসপন্থী, কাম থেকে যে-প্রেমে উত্তরণ ঘটে তাঁর মতে তা বিবাহনির্ভর, সামাজিক অনুমোদনসাপেক্ষ। সন্তান সে-প্রেমের আশ্রয়। বুদ্ধদেব যে-প্রেমের কথা বলেছেন তা মূলত এর বিপরীত; বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সমাজ নয়, এক নিঃসঙ্গ জাগরণ। 'চিত্রাঙ্গদা'য় যবনিকা নামছে অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদার দ্বিতীয় ও দৃঢ়তর মিলনের মুহূর্তে, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' শেষ হচ্ছে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর একক নিষ্ক্রমণে। কিন্তু তাই ব'লে বুদ্ধদেব বিবাহ, সন্তান, সমাজকে অস্বীকার করছেন না — অস্বীকার তো করছেনই না, বরং সেই চক্রের অবিরাম ঘূর্ণনও তার উদ্ভাসে ধরা পড়েছে। কিন্তু সে-না'টকের নটনটী অঙ্গরাজ্য, শান্তা ও অংশুমান, চন্দ্রকেতু, ও লোলাপাঙ্গী — 'তপস্বী-যুবরাজ' ঋষ্যশৃঙ্গ ও 'বারঙ্গনা-প্রেমিকা' তরঙ্গিণী তার বাইরে : 'তাদের ভূমিকা আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর'। এই দ্বিতল নির্বহণে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' হ'য়ে উঠেছে জীবনরহস্যের এক জটিল, এক উদার, এক পূর্ণ প্রতিভাস। তুলনায় 'চিত্রঙ্গদা' কিঞ্চিৎ সরল, ঈষৎ একদেশদর্শী।

এই জটিলতা, এই ঔদার্য, এই পূর্ণতা কেবল নাটকের নির্বহণেই পরিস্ফুট নয়, নাটক যেখানে প্রথম আবর্তিত হচ্ছে সেই সন্ধিস্থলেও প্রতিভাত হয়েছে। সেই সন্ধিস্থলে, 'দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে', বুদ্ধদেবের নিজের উক্তিতেই বলছি, 'নায়কনায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা।' তরঙ্গিণী বারাঙ্গনা, কাম তার জীবিকা, তার চর্চালব্ধ চারিত্র, সেই কাম থেকে সে যাত্রা করলো প্রেমের পথে। প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেও কামের প্রভাবে তপস্বীকে জয় করতে এসে বারাঙ্গনার তা-ই ঘটেছিলো। কিন্তু বুদ্ধদেব ঘটনাটাকে দ্বিগুণ অর্থবহ ক'রে তুললেন ঋষ্যশৃঙ্গের বিপরীত পরিবর্তন দেখিয়ে। তরঙ্গিণী যেমন বারাঙ্গনা, ঋষ্যশৃঙ্গ তেমনি ব্রহ্মচারী (অর্জুনের মতো সাময়িক তাপস নন, আজন্মতপস্বী'); তিনি কামকলায় অনভিজ্ঞই মাত্র নন, নারী কী তা সুদ্ধ জানেন না। তাঁর দেহে জাগলো কাম, হ'লো 'পতন'। আর কামের এই জাগরণ যে জীবনেরই এক শাশ্বত রহস্য ('পতন' কথাটা নিছক আমাদেরই সংস্কার) তা বুঝিয়ে দিলেন বুদ্ধদেব সংশ্লিষ্ট পুরাণের সাহায্যে। আমি বিভাণ্ডকের কামাবেশের সেই অতীত থেকে উদ্ধৃত ছায়াদৃশ্যের কথা বলছি। পুরাণের ভিতর পুরাণের এই ব্যবহার, প্রতিবিম্বের মধ্যে প্রতিবিম্ব স্থাপনের এই কৌশল, যে কতটা অন্তর্দৃষ্টি-জাত তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যখন দেখি বিভাণ্ডকের এই নিষেধাত্মক স্মৃতিচারণ সত্ত্বেও ঋষ্যশৃঙ্গ সেই পথেই পা বাড়িয়ে দেন। একই ঘটনার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর এই বিপরীত যাত্রা — একজনের সরলতা থেকে কামে, অন্যজনের কাম থেকে প্রেমে — যেন এক বিন্দুতে দুই বিপরীত শক্তির সংগম, যার আঘাতে নাটকে এলো এক দুর্লভ ঘনতা। পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই বিপরীত জেট প্লেনের মতো কম্পমান তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গ : 'এসো প্রেমিক, এসো দেবতা — আমাকে উদ্ধার করো', 'এসো দেহিনী, এসো মোহিনী — আমাকে তৃপ্ত করো'। মুহূর্তে আলিঙ্গ ন। তারপরেই সেই পুরাণোক্ত বৃষ্টি।

নাটকের দ্বিতীয় সন্ধিস্থলেও, অর্থাৎ নাটকের নির্বহণের পূর্বমুহূর্তে, এমনি দুই বিপরীতের সমাবেশ ঘটেছে, যদিও তার সিদ্ধি — তার মানে নায়ক-নায়িকার পরিণতি — আর বিপরীত হচ্ছে না, হচ্ছে সমান্তর। চতুর্থ অঙ্কের তরঙ্গিণী এক উদ্‌ভ্রান্ত রোমান্টিক প্রেমিকা, তার অম্বিষ্ট

সেই তপস্বী যে তাকে সরলতায় দীক্ষিত করেছে। অন্যপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গ এখন এক অভিজ্ঞ প্রণয়ী। প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরের যে-ভূমিকা ছিলো তা এখানে উল্টে গিয়েছে — তরঙ্গিণীই যেন খানিকটা 'তপস্বী', আর তপস্বী 'তরঙ্গিণী'। এবার ঋষ্যশৃঙ্গই যেন — বুদ্ধদেব নিজেই ব'লে দিয়েছেন আমাদের — তরঙ্গিণীকে ভ্রষ্ট করতে চাইলেন, কিন্তু তপস্বীর হৃদয় জাগিয়ে দিলো তরঙ্গিণী। যে-তৃষ্ণা তাঁকে, অঙ্গদেশের যুবরাজ ও শান্তার পুত্রের জনক ঋষ্যশৃঙ্গকে, তলায়-তলায় অস্থির ক'রে তুলেছিলো, যার শান্তি তিনি ভেবেছিলেন সেই নারীর সঙ্গে পুনর্মিলনে যে প্রথম তাঁর দেহে কাম জাগিয়েছিলো, সেই তৃষ্ণাই তরঙ্গিণীর প্রভাবে রূপ বদলে হ'য়ে উঠলো এক আত্ম-অন্বেষা। তরঙ্গিণীকে দেখে দৃষ্টি খুলে গেলো তাঁর, বুঝতে পারলেন তাঁর কাঙ্ক্ষণীয় মুক্তির পথ আত্মনিগ্রহ নয়, কাম নয়, সন্ন্যাস — নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব, নিরন্তর তপস্যা। তরঙ্গিণীকে দেখে, কেননা তরঙ্গিণীর চোখে, তপস্বীর দৃষ্টিতে তার এক বছর আগের আত্মদর্শনের স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল—সেই স্মৃতি যা তাকে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকার মতো উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে রেখেছে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের গৃহত্যাগে তরঙ্গিণীও পেলো তার পথ : গৃহত্যাগ, সেই আরেক আমি-র জন্যে অপেক্ষা — একা, তপস্বিনী।

দু-জনেরই পরিণতি ঘটলো এক সত্যিকার তপস্যায়, 'পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো' তারা। এই নিষ্ক্রান্তি, এই তপস্যা বুদ্ধদেবের ভাবনায় নতুন নয় — বুদ্ধদেবের অনুরাগ বোধহয় বরাবরই সম্ভাব্য-তপস্বী কিংবা তপস্বীপ্রতিম সংসারত্যাগীদের প্রতি বেশি — তবে এতটা স্পষ্ট ও অর্থবহ হ'য়ে ব্যক্ত হয়নি এর আগে। কিন্তু যা ঈষৎ নতুন ঠেকলো তা হ'লো তপস্বী ও সংসারীর সহ-অবস্থান। লোলাপাঙ্গীদের প্রতি এতটা সমবেদনা এর আগে বুদ্ধদেবে চোখে পড়েনি, বিশেষত লোলাপাঙ্গীরা আর তরঙ্গিণীরা যখন একসঙ্গে উপস্থিত। যারা অসাধারণ নয়, জীবনে প্রেয়কেই চূড়ান্ত ব'লে জানে, তারাও যে জীবন-রহস্যের দ্যোতনায় অংশ নিতে পারে, এই উপলব্ধি সম্ভবত বেশি দিনের পুরোনো নয়। এবং নেহাত প্রেয়োকামীদের প্রতি এই সহানুভূতি, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র মতো 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'তেও, আমার মতে, চোখে পড়ে। মনোরমার সঙ্গেও আমরা খানিকটা একাত্মতা অনুভব করি; সে নেহাতই পাপী নয়, তারও একটা বলবার কথা আছে। আর সেই সুশ্রী তরুণী কনকলতা, যে তার দিদিকে ভালোবাসে কিন্তু সেই সঙ্গে চায় সুখ চায় গৃহ, তাকে কি আমরা কেবল করুণাই করি? যে-গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে এই নাটক রচিত সেখানে নয়িকার পাপীয়সী মা বা ভীরু বোনের এই সংসারী মনস্তত্ত্ব অতটা প্রতিভাত হয়নি। এমনকি পুরাণটির যে-সব আধুনিক পুনর্লিখন হয়েছে তাদের সর্বত্রও তা স্পষ্ট নয়।

অবশ্য 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'র প্রধান আকর্ষণ তার নায়িকা। নিছক আগামেম্‌নন-কন্যা ও আগামেম্‌ননের করুণ স্মৃতিরক্ষিণী নয় সে, বুদ্ধদেব তাকে ক'রে তুলেছেন এক বিশেষ মানসতার প্রতীক। সে-ও আসলে তপস্বিনী, কিন্তু তার তপস্যার নির্বহণ পুণ্যের পথে নয়, ধ্বংসে। তাকে যেমন আমরা শ্রদ্ধা করি, তেমনি ভয়ও করি — শ্রদ্ধা এইজন্য যে সে একনিষ্ঠ আদর্শবাদী, নিঃসঙ্গ, নিষ্কম্প, সেই অন্য গ্রীক-কন্যা আন্তিগোনের মতো; আর ভয়ের কারণ তার প্রায়-উন্মাদনা। আর এই প্রায়-উন্মাদনার উৎস তার সেই আদর্শবাদই। আদর্শবাদমাত্রেরই প্রান্তে আছে এক উন্মাদনা, যে-আদর্শবাদই হোক না তা — ব্যক্তিগত, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনীতিক। ইতিহাসে বারবার আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি; একজন সাভোনারোলা আর একজন রবস্পিয়েরের

মধ্যে বোধহয় কোনো মৌল প্রভেদ নেই। টোমাস মান তাঁর 'ফিওরেন্ৎসা'য় এই উন্মাদনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। প্রাচীন গ্রীকরা এই উন্মাদনার কথা জানতো, সেইজন্যেই সম্ভবত তারা পরিমিতিধর্ম প্রচার করেছিলো। উপরন্তু, আদর্শবাদমাত্রেই একদেশদর্শী। আদর্শবাদীর কাছে সত্য শুধু তার নিজের, ফলত অন্যকে দ'লে-পিষে এগিয়ে যেতে তার বিবেকে বাধে না। কিন্তু আদর্শবাদে উন্মাদনা ও একদেশদর্শিতা যেমন আছে, তেমনি তো আছে মহত্ত্বও। শত হ'লেও তার প্রাথমিক ভিত্তি তো শ্লা'ঘনীয়, তার যাত্রারম্ভ অনিন্দ্য। সুন্দর ও ভয়ংকরের এই অনিবার্য একাত্মতায় নিহিত রয়েছে জীবনের এক বিষাদোদ্রেকী রহস্য। বুদ্ধদেবের শম্পা সেই রহস্যেরই প্রতিবিম্ব।

সেইজন্যই বোধকরি শম্পা তাঁর নাটকের নায়িকা। এস্কিলসে ইলেক্‌ট্রা-চরিত্র উজ্জ্বল, কিন্তু মাতৃহন্তার ভূমিকা পুরোপুরি অরিস্টিসেরই। সফোক্লিস ইলেক্‌ট্রাকে উজ্জ্বলতর করেছেন, বিশেষত বিসদৃশ চরিত্র ক্রিসোথেমিসকে এনে এবং ক্লিটেম্‌নেস্ট্রার সঙ্গে ইলেক্‌ট্রার সংঘাত দেখিয়ে. কিন্তু তাঁর নাটকেও আরব্ধ কর্মে অরিস্টিস আগে থেকে কৃতসংকল্প। ইউরিপিডিসে ইলেক্‌ট্রার ভূমিকা আরেকটু বাড়লো — মাতৃহত্যার পূর্বমুহূর্তে ঈষৎ দুর্বল হ'য়ে-আসা অরিস্টিসকে খানিকটা উদ্বুদ্ধ করতে হচ্ছে তাকে — কিন্তু এই চরিত্রচিত্রণের পেছনে ইউরিপিডিসের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো পুরাণের সমালোচনা। পক্ষান্তরে, 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'তে অদ্রিনাথ বলতে গেলে নেহাতই যন্ত্র, যন্ত্রী আসলে শম্পা। শম্পাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে রাজি করালো, স্বহস্তে মাকে হত্যা না-করলেও হন্তা আসলে সে-ই। ইলেক্‌ট্রাকে এই প্রাধান্যদানে বুদ্ধদেব ও'নীল কিংবা জিরোদু কিংবা সার্ত্র-এর সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু শম্পার পাশাপাশি, আগেই বলেছি, বুদ্ধদেব আরেকটি প্রতিবিম্ব সংস্থাপিত করেছেন — মনোরমা। (জিরোদুর ইগিসথাস প্রশংসনীয় হ'লেও আমার মতে কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য, ও'নীলের ক্রিস্টীন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু মনোরমার মতো স্বস্থ নয়।) মনোরমা পুরাণের সেই ক্লিটেম্‌নেস্ট্রা থেকে বেশ খানিকটা ভিন্ন; পুরাণে ক্লিটেম্‌নেস্ট্রাও ভয়ংকরী — অন্তত, তার আর যাই থাক, পুত্রস্নেহ নেই। অরিস্টিস তার শত্রু, সেই বিষধর সর্প যে তাকে একদিন দংশন করতে আসবে; অরিস্টিসের বিলোপই তার কাম্য। কিন্তু মনোরমা অদ্রিকে ভালোবাসে; শুধু যে ভালোবাসে তা-ই নয়, তার সুখের স্বপ্ন প্রধানত অদ্রিকে ঘিরেই। ও'নীলের মতো বুদ্ধদেব কোনো ফ্রয়েডীয় জটিলতা নিয়ে আসেননি এখানে, মনোরমাকে একান্তই এক সুখকামী মাতা হিশেবে দেখিয়েছেন।

মনোরমা আর শম্পা — দুই বিসংবাদী প্রতিবিম্ব, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মানসতা। একজন চায় সুখ, অন্যজন ন্যায়। সুখের জন্য একজন ন্যায়ের দাবি অগ্রাহ্য করতে রাজি, ন্যায়ের জন্য অন্যজন সুখ বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর। এবং দু-জনেই চায় অদ্রিকে — একজনকে তার দুঃসহ স্মৃতি ভুলিয়ে অদ্রি সুখী করবে, অন্যজনকে তার সংকল্প সিদ্ধ ক'রে শান্তি দেবে অদ্রি। নাটকটা যেন এক অর্থে অদ্রিকে নিয়ে মনোরমা আর শম্পার মধ্যে সংগ্রাম। জয় অবশ্য হ'লো শম্পারই— মনোরমা সুখের বদলে উপহার পেলো মৃত্যু, এবং সে-মৃত্যু এলো অদ্রিরই হাত থেকে। আর শম্পা পেলো শান্তি। যদিও সে-শান্তির রূপ মৃত্যু, তবু সে-মৃত্যু তার সিদ্ধিরই নামান্তর, কেননা তার একনিষ্ঠ সাধনা আসলে ছিলো মৃত্যুরই, পাপাশ্রিত সুখলিপ্সু জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আসলে তার পিতার মৃত্যুর উদ্ভাসে শম্পার মনে হয়েছিলো বেঁচে-থাকা ব্যাপারটাই ঘৃণ্য,

কারণ বেঁচে থাকতে হ'লে পাপাচরণ অনিবার্য, বেঁচে থাকতে হ'লে বিবেককে চোখ ঠারতেই হয়। সেইজন্যে কাম, বিবাহ, সন্তান — সংসারী অস্তিত্বের যা তুঙ্গতম অভিজ্ঞতা — তার কাছে বিবমিষার কারণ। পক্ষান্তরে, মৃত্যুই সেই অঙ্গন যেখানে পবিত্রতা সম্ভব। কিন্তু শম্পার এই মৃত্যুপ্রেম কোনো একক সাধনামাত্র নয়, কোনো জৈন সন্তের প্রায়োপবেশন বা খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীর মরুযাপন নয়, এ বিদ্রোহ, এ পরিপার্শ্বে বিপ্লব আনে, ঘটায় বিস্ফোরণ। এর পরিণাম ধ্বংস, আর তার প্রধান সাক্ষ্য, না মনোরমা নয়, অদ্রিনাথ — সেই প্রায়-কিশোর তরুণ যে তার দিদিকে যেমন ভালোবাসে তেমনি ভালোবাসে মাকেও, যে একুশ বছর বয়সে এক রাত্রিতেই পাগল হ'য়ে গেলো।

৩

তপস্যারই দুই ভিন্ন দর্পণ 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' এবং 'কলকাতার ইলেক্‌ট্রা'। এক তপস্যা সংসারধর্মেরই সম্পূরক, তার সিদ্ধিতে বিন্দুমাত্র স্বাস্থ্যহানি ঘটে না সংসারের; অন্য তপস্যা সংসারবিরোধী, সংসারের বিনাশ ঘটিয়েই তার সিদ্ধি। এই দুই মুখ্য প্রতিবিম্ব ছাড়াও তপস্যার রূপ আরো আছে বুদ্ধদেবের নাটকে — আমি 'বাবু ও বিবি' এবং 'সত্যসন্ধ'র কথা বলছি। এবং সেই সঙ্গে আছে সংসার কী সেই রহস্যেরও দু-টি দর্পণ : 'পাতা ঝ'রে যায়' ও 'কালসন্ধ্যা'। 'বাবু ও বিবি'র বিষয় শিল্প, এই প্রকৃতিশাসিত জগতে শিল্পী কী-ক'রে এক স্বেচ্ছানির্বাসনের সাহায্যে রক্ষা করে সেই অতি-প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা যা ব্যতিরেকে সৃষ্টিকর্ম অসম্ভব — তা-ই এ-নাটকের উপজীব্য। 'সত্যসন্ধ'র উপজীব্য অন্য-এক তপস্যা; সত্য ব'লে শেষ পর্যন্ত কিছু আছে কি না তার এই সন্ধান যেন এই আর্ত বিশ শতকের ঈশ্বর-অন্বেষারই অনুরূপ। 'পাতা ঝ'রে যায়'-এর উদ্ভাস অস্তিত্ববিষয়ক এক নির্বেদের, এক গভীর শূন্যতার, যেন কিছুরই কোনো মানে নেই জীবনে, যেন বেঁচে-থাকা আস্‌লে মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু এই শূন্যতার উত্তর মিললো 'কালসন্ধ্যা'য় — যেন 'পাতা ঝ'রে যায়' ও 'কালসন্ধ্যা' এক দ্বৈত সংলাপ — মিললো মৌষল পর্বের সেই আশ্চর্য পুরাণের এই আধুনিক পুনর্লিখনে। কিন্তু না, 'বাবু ও বিবি' বা 'সত্যসন্ধ', 'পাতা ঝ'রে যায়' কিংবা 'কালসন্ধ্যা'র কোনো বিশ্লেষণের চেষ্টা এখানে করবো না — পরিসরের অভাব। অদূর ভবিষ্যতে সংসার ও তপস্যার এই দর্পণচতুষ্টয় নিয়েও আলোচনা করবার ইচ্ছে রইলো। ততদিনে হয়তো আরো নাটক উপহার পাবো আমরা বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ

অরুণকুমার সরকার

ভাবতে অবাক লাগে যে বুদ্ধদেব বসুও ষাট বছরে পা দিচ্ছেন। ভাবতে অবাক লাগে এই জন্যে যে আজ পর্যন্ত তাঁর রচনায় বার্ধক্যের ক্ষীণতম ছায়াটুকুও অনুপস্থিত, — না তাঁর কবিতায়, না তাঁর প্রবন্ধে। জীবনব্যাপারে তাঁর আগ্রহ যে-কোনো উদ্ভিন্ন যুবকের মতোই প্রগাঢ় এবং আত্যন্তিক। অথচ এই তো আশীর্বাণী বিতরণের সময়, সাবধানী হিতোপদেশে মুখর হবার অবকাশ, অথবা শিরোপা মাথায় দিয়ে সম্রাট হ'য়ে বসার। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু চিরকাল যুবকদের সঙ্গে-সঙ্গেই রইলেন, কিছু গম্ভীব দূরত্ব বজায় রেখে নয়, প্রায় তাদের কাঁধে হাত রেখে, পাশে-পাশে। এর ফল তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে বৈকি। অকালবৃদ্ধেরা তাঁর মানসিক বয়োপ্রাপ্তিতে সন্দেহ ক'রে যতটা দূরে স'রে গেছেন, তরুণেরা ঠিক ততটাই তাঁর কাছে এগিয়ে এসেছে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে বিশ বছর আগে তদানীন্তন তরুণদের মনেও বুদ্ধদেব একই আকর্ষণী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাহ'লে কি এ-কথাই মেনে নেব যে বুদ্ধদেব বসুর কোনোই পরিবর্তন হচ্ছে না বা হয়নি, একই কেন্দ্রবিন্দুতে অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছেন তিনি? না, ঠিক তার উল্টোটাই বরং সত্য। অতুলনীয় এক সজীব, চলমান, গ্রাহী মনের অধিকারী ব'লেই বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় না-নিয়েও, তারুণ্য বজায় রাখা। কোনো মতামতকেই তিনি আঁকড়ে ধ'রে থাকেননি, চূড়ান্ত ব'লে স্বীকার করেননি কোনো ভাবদর্শকে। স্বদেশে-বিদেশে সাহিত্য এবং চিন্তাক্ষেত্রে গত তিরিশ বছরে যত তরঙ্গ উঠেছে সবকটাই তাঁর মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সমুদ্রস্নানের আনন্দ পুরোপুরিই তিনি উপভোগ করেছেন, যদিও কোনোসময়েই নিজেকে ভেসে যেতে দেননি।

ভেসে যাওয়ার প্রয়োজনও হয়নি। প্রাথমিক মানবিক মূল্যবোধগুলিতে বরাবরই তাঁর হৃদয়-মন বাঁধা রয়েছে, তদুপরি রয়েছে তাঁর অতন্দ্র শিল্পীসত্তা। তাই কোনো ছাপমারা মতবাদের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় না-নিলেও জগদ্‌ব্যাপারে বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি যে পরিচ্ছন্ন, তৎপর এবং নিজস্ব তা একজন অলস পাঠকেরও নজর এড়ায় না। ফলত, তাঁর যে-কোনো রচনায় একটি সংস্কারমুক্ত, মানবতাবোধে প্রাজ্ঞ, নিটোল, সজীব, আধুনিক মনের পরিচয় পাই আমরা। কোথায় এর উৎস?

বুঝতে কষ্ট হয় না যে বুদ্ধদেবের যাবতীয় জ্ঞান, এমনকি সংসারবুদ্ধি, সাহিত্য থেকেই উপার্জিত; দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্বের মোটা-মোটা কেতাব থেকে নয়, পৃথিবীজোড়া গল্প-উপন্যাস-কবিতার অফুরন্ত রসভাণ্ডার থেকে। সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ব'লেই, আমার মনে

হয়, তাঁর ধারণাগুলো এমন পার্থিব, মানবিক, সরস এবং প্রাণময়। এবং ব্যক্তিগত।

এক হিশেবে বুদ্ধদেব বসুর সব প্রবন্ধই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। কিন্তু এই আপাত-দুর্বলতাই তাঁর শক্তির উৎস, তাঁর রচনার প্রধানতম আকর্ষণ। এক হাতে তথ্যের গুরুভার তথা বিভিন্ন মতবাদের ঝুলি এবং অন্য হাতে যুক্তির লণ্ঠন তথা বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে গ্রহণ-বর্জনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একটা গ্রাহ্য পরিণতির দিকে পৌঁছনোই যে-কোনো প্রাবন্ধিকের লক্ষ্য। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। পাহাড়ে ওঠার সময়ও তিনি পোশাক পালটাতে রাজি নন। চিন্তার রাজ্যে তাঁর পথ-চলা এমনই অনায়াস যে মনে হয় তিনি ঢিলে পাঞ্জাবি গায়ে নিজের আনন্দে শিস দিতে-দিতে চলেছেন।

প্রতারক এই চলনভঙ্গি। কেননা, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, প্রাবন্ধিকের কাছে যা-কিছু কাম্য, — প্রাসঙ্গিক খবরাখবর, বিশ্লেষণ, মনন এবং সংশ্লেষণ, সবই তাঁর রচনায় উপস্থিত। কিন্তু ছদ্মবেশে, নিখুঁত মুখোশ এঁটে। মনে করুন তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ দু-টি : "নোয়াখালি" এবং 'এক গ্রীষ্মে দুই কবি'। শেষোক্ত রচনাটি শার্ল বোদলেয়ার ও ফিয়ডর ডস্টয়েভস্কিকে নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা। বিষয়বস্তুটা নিঃসন্দেহে দুরূহ এবং গুরুগম্ভীর। তথাপি বুদ্ধদেবের রচনা শুরু হয়েছে আমাদের এই কলকাতা শহরের নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের এমন একটি করুণামধুর এবং নেহাৎ ব্যক্তিগত বর্ণনা দিয়ে যা কিনা অনায়াসেই কোনো ছোটোগল্পের উপক্রমণিকা হ'তে পারত। কিন্তু অনতিবিলম্বেই চুপিসারে লেখকের সঙ্গে-সঙ্গে কখন-যে আমরা তামাম ইউরোপীয় সাহিত্যের আবহাওয়ায় দু-দুজন দিক্‌পাল সাহিত্যিকের অন্দরমহলে উপনীত হয়েছি, নিজেরাই ঠাহর করতে পারি না। রচনার শেষ অক্ষরটি থেকে চোখ তুলেই অনুভব করি এক রহস্যময় উপন্যাসের জগৎ থেকে ঘুরে আসা গেল, পরক্ষণেই বুঝতে পারি বোদলেয়ার এবং ডস্টয়েভস্কি সম্বন্ধে অনেক নির্ভুল তথ্যও আমাদের শেখা হ'য়ে গিয়েছে। আর ঠিক তখনই তারিফ করি প্রাথমিক ভূমিকাটুকুর যাথার্থ্যকে, যেটাকে ছোটোগল্পের ভূমিকা ব'লে মনে হয়েছিলো। নিদারুণ গ্রীষ্মের দহনজ্বালায় শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লেশের মধ্যেই তো বোদলেয়ার-ডস্টয়েভস্কির স্ফূর্তি।

এমনিতর আর একটি রচনা "নোয়াখালি"। প্রবন্ধটিতে গান্ধীজীর বাণী ও ব্যক্তিত্ব নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে, এতই নিপুণভাবে যে গান্ধী-দর্শনের অনেক গ্রন্থেই হয়তো তা পাওয়া যাবে না। অথচ সমস্ত রচনাটি জুড়ে, আক্ষরিক অর্থেই সমস্ত রচনাটি জুড়ে, লেখকের শৈশবস্মৃতি মন্থন আর অপরূপ নিসর্গবর্ণনা। বুদ্ধদেব জানেন আলোচ্য বস্তুকে যথোচিত পটভূমিতে স্থাপন করতে পারলে ছবির মতোই তা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ এবং তর্কাতীত। প্রাবন্ধিকদের মধ্যে, আমার মনে হয়, একমাত্র বুদ্ধদেবেরই আছে এই আবহসৃষ্টির ক্ষমতা, যা ছিল রবীন্দ্রনাথের।

বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরচনার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল রবীন্দ্রচর্চার ফসলে পরিব্যাপ্ত। এই বিচিত্র নয়নাভিরাম উদ্যানে মালি ও মালাকে পৃথক ক'রে দেখা শক্ত, এখানে রবীন্দ্রনাথকে যতটা পাচ্ছি, বুদ্ধদেবকেও ততটা। লক্ষ করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতামত নিয়ে বুদ্ধদেব অল্পই মাথা ঘামিয়েছেন। একজন কারিগর সমধর্মী অন্য কারিগরের শিল্পকর্মকে যে-ভাবে দেখে থাকে, একান্ত কাছ থেকে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, কারখানার উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে, বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-দর্শন অনেকটাই সে-রকম। নামকরণে বা জাতি-বর্ণ-নির্ণয়ে তাঁর আগ্রহ নেই, রূপ-রস-গন্ধ-

ছন্দ নিয়ে যে-ফুলটি ফুটে উঠেছে, তাঁর দৃষ্টি সেই সমগ্রতায় একাগ্র।

এ-দৃষ্টি কবির। ফলত, সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলিকে বুদ্ধদেব একটি অখণ্ড কবিতা হিশেবে পাঠ করেছেন। এবং কাব্যবিচারে যে-পদ্ধতি অনুসৃত হ'য়ে থাকে অথবা হওয়া উচিত, সেই পথেই আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্র-রূপকর্মের রহস্য। হাজারদুয়ারি রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা দিক থেকে প্রবেশ করা সম্ভব। এতাবৎ বিশেষ কোনো-একটি দিকের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করাই প্রবন্ধকাররা নিরাপদ ব'লে মনে ক'রে এসেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বিশ্বাস করেন, একটিমাত্র দিক আছে, একটিমাত্রই, যে-দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে দেখা হয়। সে-দিকটি রূপকর্মের দিক, নিছক শিল্পী হিশেবে রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতির দিক। বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র বিচার এইদিক থেকেই।

তাই অপরাপর সমালোচক যখন রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার উৎস কি সমাজচিন্তার ফলশ্রুতি নিয়ে গলদঘর্ম, বুদ্ধদেব তখন চুপি-চুপি আমাদের অন্যদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেন 'গল্পগুচ্ছ'-এ মিতভাষণের কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে, তুলে ধরেন চিত্রময়ী এক বর্ণনা অথবা অনায়াসেই শিশুর মতো লাফিয়ে উঠতে পারেন : দ্যাখো, দ্যাখো কি অবাক-করা 'সহজ পাঠ'-এর এই মিল — 'ছোটো খোকা বলে অ আ / শেখেনি সে কথা কওয়া।'

স্বভাবতই, উপমা-অনুপ্রাস, বিশেষণ-অলংকরণ, ছবি-ভাবচ্ছবি এবং বর্ণনাশিল্পের বিভিন্ন দিক থেকেই বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের গদ্য, ছোটোগল্প এবং উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের দেশ-কাল সম্বন্ধে সর্বদাই অবহিত রয়েছেন অথচ তার উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব না-দিয়ে কবিতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র। এবং পাচ্ছেনও; পাচ্ছেন দুরূহতম স্থানেও। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

> আরো আশ্চর্য এই যে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) এই কিন্নরকণ্ঠ আমরা সেখানেও শুনতে পাই যেখানে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক; বরং সেখানেই যেন নির্ভুলভাবে শুনতে পাই; তাঁর ছন্দ ও শব্দতত্ত্বের আলোচনা শুধু আমাদের বুদ্ধির কাছে বার্তা পাঠায় না, আমাদের সমগ্র সত্তাকে পুলকিত ক'রে তোলে। হয়তো কোনো মীমাংসার তীরে তিনি উত্তীর্ণ করেন না আমাদের, কোনো তৈরি সত্য কখনোই হাতে তুলে দেন না; কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটি বেগ সঞ্চার করেন, যার ফলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের নিজেদের ভ্রষ্ট স্মৃতি, স্বপ্নের ভগ্নাংশ, চিন্তার রশ্মি, হয়তো ইন্দ্রিয়ের কোনো নূতন শিহরন। ('প্রবন্ধ-সংকলন' : ৩২-৩৩ পৃ°)

পরিবর্জন তো নয়ই, বরং ঈষৎ পরিবর্ধন ক'রে উদ্ধৃত কথাগুলিই বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বুদ্ধদেবের প্রবন্ধও ইঙ্গিতধর্মী, তাঁর রচনাও মূলত কবিতার সম্প্রসারণ, শব্দের সুচারু বয়ন। কিন্তু তুলনায়, দ্বিধা না-ক'রেই বলব, বুদ্ধদেবের গদ্য, বিশেষত তাঁর সম্প্রতিকালের গদ্য, ঢের বেশি সংযত, ঘনসংবদ্ধ এবং নির্মমভাবেই আত্মসচেতন। তাছাড়া এ-টাও লক্ষণীয় যে রচনার ন্যায়শাস্ত্রকে বুদ্ধদেব কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করেন না এবং প্রচ্ছন্নভাবে হ'লেও, তথ্যের পারম্পর্যকে যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে থাকেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রযুক্ত সেই একই পদ্ধতিতে বুদ্ধদেব সমকালীন কবিতারও বিচার করেছেন। বিচার না-ব'লে উপভোগ বলাই হয়তো সংগত। কেননা, প্রচলিত অর্থে যাকে বিচার

বলে, সে-রকম কিছু ঘর্মাক্তকলেবর রচনা বুদ্ধদেবের একেবারেই নয়। ফলত তাঁর রচনা সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দেরই প্রকাশ। আর তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে নিজের আনন্দকে তিনি পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। পেরেছেন তাঁর অপরূপ বাগ্‌বিন্যাস-প্রণালীর জন্যেও বটে, আবার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটুকুর জন্যেও। তাই জীবনানন্দের গভীরতা, সুধীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা কি অমিয় চক্রবর্তীর বৈরাগ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যে বুদ্ধদেব ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন না, তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ, মিল বা ভাবচ্ছবি থেকে হঠাৎ-হঠাৎ এমন অনেক হীরকখণ্ড আবিষ্কার করেন যা পাঠকের চোখেও মায়াবী আলোর ছোঁয়া লাগায়।

যে-কোনো অভিজ্ঞতাকে পছন্দসই একটা তাত্ত্বিক ছকের মধ্যে ফেলতে না-পারলে বুদ্ধিজীবীরা অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে অভিজ্ঞতাটাই মূল্যবান এবং শুধুমাত্র সেই অভিজ্ঞতাটুকুই যা তিনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তিতায় অনুভব করতে পারেন। অর্থাৎ তত্ত্বের যে-টুকু অংশ মানুষের জীবনে ফলিত এবং প্রকট, তাঁর উৎসাহ সেখানেই সীমাবদ্ধ। বিমূর্ত তত্ত্বকথায় তাঁর কোনো আসক্তি আছে ব'লে মনে হয় না। তাই বুদ্ধদেবের প্রবন্ধে কোনো সুদূর দার্শনিক তাঁর কূটজিজ্ঞাসার জালে নিজেকে ক্রমাগত ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন না, সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ একজন মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ে সশরীরে হাজির হয়।

তত্রাচ যাঁরা কোনো শিল্পীর ক্রিয়াকর্মকে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে ফেলতে না-পারলে চিত্তে সুখ পান না, তাঁরা অবশ্যই বুদ্ধদেব সম্বন্ধে দু-টি বিশেষণ প্রয়োগ করতে উৎসুক হবেন : এক, তিনি রোমান্টিক; দুই, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এ-ক্ষেত্রে দু-টি বিশেষণই যে যথোপযুক্ত বুদ্ধদেবের প্রবন্ধাবলিতে তার ভূরি-ভূরি সমর্থন পাওয়া যাবে। নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী তিনি দুর্মরভাবেই রোমান্টিক। আর তারই নাম রোমান্টিকতা, বুদ্ধদেব লিখেছেন,

> যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার ক'রে নেয় — শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল্প ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে : তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় — সেই বিশাল ও স্বতো-বিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।
>
> ('প্রবন্ধ-সংকলন' : ২১৪-২১৫ পৃ')

বুদ্ধদেব বসুর সুঠাম, কাব্যরসাপ্লুত, সাবলীল গদ্যের অন্যতম উদাহরণ হিশেবেই নয়, রোমান্টিকতার এই সংজ্ঞা, বলা বাহুল্য, আধুনিক সাহিত্যেরও সংজ্ঞা। দোষে-গুণে গোটা মানুষটাকে পাওয়াই যার অভিলাষ কোনো খণ্ডসত্যকেই তিনি মেনে নিতে পারেন না। বুদ্ধদেবের জীবনবীক্ষার মূলসূত্র এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর সাম্প্রতিক নাটক-উপন্যাসের নিহিতার্থ।

যিনি বিশ্বাস করেন 'মানুষের পক্ষে ভালো হওয়া সম্ভব শুধু একলা হ'লে', শিল্পী হিশেবে তিনি সত্য কথাই বলেন। তবুও, যাঁরা বুদ্ধদেবের সঙ্গে একমত হবেন না, সব মানুষ একমতাবলম্বী হ'লে পৃথিবী তো বসবাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠত, তাঁরাও যদি শিল্পকর্ম মনে ক'রে তাঁর প্রবন্ধাবলির পাতা ওল্টান, দেখতে পাবেন কেমন ক'রে একটি কূলপ্লাবী নদী ধীরে-ধীরে

পরিণত হয়েছে হ্রদে। দেখতে পাবেন বুদ্ধদেব বসুর মৌল মেজাজ — তাঁর তারুণ্য, তাঁর ঔৎসুক্য, উৎসাহ, কৌতূহল, আনন্দবোধ — এককথায় তাঁর চিন্তার উদ্যম যথাপূর্ব র'য়ে গেছে।

....

সমালোচনার আর একটা দিক আছে. ... সেটা সাহিত্যের রস পাঠকের মনে সংক্রামিত করা. সাহিত্যের মূল সূত্র উদ্‌ঘাটন করা. এবং প্রসঙ্গত ভালো লেখার একটি আদর্শ সকল লেখকের ও পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। এ-কাজ যাঁরাই করেছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক ব'লে স্বীকৃত. এবং তাঁদের সকলের লেখাই এতখানি সরস যে পরবর্তী যুগে তাঁদের মতামত সম্পূর্ণ গৃহীত না হ'লেও শুধু লেখার গুণেই পাঠকের চিত্তে তাঁদের রাজত্ব নষ্ট হয়নি। অর্থাৎ সমালোচনাকেই তাঁরা সাহিত্য ক'রে তুলেছিলেন। এইটেই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা · রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীরই সমালোচক।

'কবিতা' আষাঢ় ১৩৫০ — বুদ্ধদেব বসু

'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি'

প্রমথ চৌধুরী

[১৯৩৫]

'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি' একখানি নতুন বই। এ-বইয়ে লেখক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব জনৈক তরুণ লেখক হ'লেও পাঠক সমাজের নিকট সুপরিচিত। কারণ তাঁর কলম ইতিমধ্যেই বহু গল্প উপন্যাসের প্রসব করেছে। বুদ্ধদেবের লেখনীর সৃজনীশক্তি অফুরন্ত, — বারোমাসই তা যুগপৎ ফলন্ত ও ফুলন্ত।

বই লিখলেই আমরা নিন্দাপ্রশংসার ভাগী হই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ লেখকের কপালে যা জোটে সে হচ্ছে — সমালোচকের মুরুব্বিয়ানা, স্বল্প নিন্দা অথবা স্বল্প প্রশংসা। কিন্তু বুদ্ধদেবের কপালে যে-নিন্দা-প্রশংসা জুটেছে তার একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে 'অতি'। এই 'অতি' জিনিশটাকে আমি ডরাই, কারণ আমার বিশ্বাস যে অতিনিন্দুক এবং অতিস্তাবক উভয়েই সাহিত্যের বাজারে একদরের জহুরী। এই কারণেই বুদ্ধদেবের কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে আমার কখনো উৎসাহ হয়নি। এ-ক্ষেত্রে সমালোচনার অর্থ হচ্ছে বাক্-বিতণ্ডা। আর-এক কথা, আমি যদি এ-ক্ষেত্রে সমালোচনার বাম মার্গ অবলম্বন করতুম, তাহ'লে লোকে বলত যে আমি শিঙ্ বাঁকাচ্ছি হিংসেয়; অপরপক্ষে আমি যদি দক্ষিণ মার্গ অবলম্বন করতুম, তাহ'লে লোকে বলত আমি শিঙ্ ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছি।

আজকে যে তাঁর নতুন বইখানির প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ এখানি প্রবন্ধের বই — গল্পের বই নয়। বিশেষতঃ এ-প্রবন্ধগুলি আমরা যে-জাতীয় প্রবন্ধ লিখি সে-জাতীয় প্রবন্ধ নয়। অর্থাৎ এ-সব প্রবন্ধের এমন কোনো বিষয় নেই, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেতে পারে। জিওগ্রাফি, হিস্টরি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম কিম্বা নীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি। বলা বাহুল্য যে, কোনো বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ সেই বিষয়ই আমাদের লেখার সাহায্য করে। কিন্তু মনকে সেই বিষয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করাই এ-জাতীয় প্রবন্ধ লেখকের প্রধান কর্তব্য। এ-জাতীয় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের অন্তরে মন চাই কি না-ও থাকতে পারে।

কিন্তু আর-এক জাতীয় প্রবন্ধ আছে, যার উদ্দেশ্য যে-কোনো নিত্য পরিচিত নগণ্য বিষয় অবলম্বন ক'রে লেখকের আত্মপ্রকাশ করা। এ-পুস্তকে একটি প্রবন্ধ আছে, যার বিষয় হচ্ছে "বাথরুম"। অবশ্য এ-বিষয়েও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা যায়। মহেঞ্জদারোয় যখন ড্রেন ছিল, তখন বাথরুমও নিশ্চয় ছিল; তবে কি আকারের স্নানাগার ছিল আর ডারউইনের evolution অনুসারে এ-যুগে তা কি আকার ধারণ করেছে, সে-বিষয়ে অবশ্য এমন thesis লেখা যায় যার

প্রসাদে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভ করতে পারি।

কিন্তু বুদ্ধদেব সে-জাতীয় প্রবন্ধ লেখেননি। তিনি বাথরুমকে উপলক্ষ্য ক'রে, নিজের কতকগুলি মানসিক ও শারীরিক অনুভূতির এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি আত্মচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। Lamb এ-জাতীয় প্রবন্ধকারদের মধ্যে সর্বগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রবন্ধাবলী অতুলনীয়। এ-জাতীয় প্রবন্ধ মানুষের এত ভালো লাগে, কেননা তার প্রসাদে লেখক নামক একটি মানুষকে পুরো পাওয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে নিজের মনের সূক্ষ্মশরীরের।

আমি অবশ্য বুদ্ধদেবকে Lamb-এর সঙ্গে এক ব্র্যাকেটভুক্ত করতে চাইনে। আমার উদ্দেশ্য বুদ্ধদেবের প্রবন্ধের জাত চিনিয়ে দেওয়া। আর এই শ্রেণীর প্রবন্ধকেই যথার্থ সাহিত্য বলা হয়। এ-জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান গুণ হচ্ছে তা কিছুই প্রমাণ করতে চায় না, কোনো-কিছু শিক্ষা দিতে চায় না। সুতরাং fact ও logic-এর লৌহশৃঙ্খল থেকে এ-রকম লেখা মুক্ত। এর ভিতর যে fact আছে, সে হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিগত শরীর ও মনের fact। আমাদের ব্যক্তিত্ব দেহ ও এ-দুয়ের যোগফল মাত্র।

এ-শ্রেণীর প্রবন্ধ যদি প্রলাপ না-হয়, যদি তার কোনো রূপ থাকে ত সে-রূপ আমাদের বৈষয়িক মনের ভিতরে কি বাইরে যে-মন আছে সেই অনির্দিষ্ট মনকে স্পর্শ করে, আর নানা চিন্তার উদ্রেক করে। বুদ্ধদেবের প্রবন্ধগুলি ভিতর সেই রূপ আছে। তাঁর প্রবন্ধগুলির হ য ব র ল নয়। তাঁর দু-টি প্রবন্ধ আমার খুব ভালো লেগেছে। একটির নাম "রূপ ও স্বরূপ" — অপরটির "মৃত্যু জল্পনা"। আমার মতে "মৃত্যু জল্পনা"ই এ-পুস্তকের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। দেহ ও মন ঐকান্তিক অবসাদগ্রস্ত হ'লে, মানুষের অর্ধমৃত অর্ধজীবিত মনের যে-অবস্থা হয়, তার চমৎকার বর্ণনা। আর যিনি কখনো নিজের মনের ও অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য যে বুদ্ধদেবের বর্ণনা কাল্পনিক নয়, বাস্তবিক। আমি যথার্থ পাঠককে এ-প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি।

এখন আমি লেখকের ভাষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। বুদ্ধদেবের গল্পের ভাষার ও ভাবের অন্তর ইংরাজিতে যাকে বলে forced তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত। সম্ভবতঃ এ-ও একটা কারণ যার দরুণ তাঁর লেখা অতি আনন্দিত এবং অতি প্রশংসিত হয়েছিল। Forced-সাহিত্য forced-সমালোচনা টেনে আনে।

কিন্তু "রূপ ও স্বরূপ" এবং "মৃত্যু জল্পনা" প্রভৃতি লেখা ভাষার বহ্বাস্ফোটন ও ভাবের বুক-ফোলানো রূপ থেকে প্রায় মুক্ত। আমরা কোনো লেখকের muscle দেখতে চাইনে, দেখতে চাই তাঁর মন। আর মনের শক্তির একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় তার আলোয়। আর রঙ্ জিনিশটে যার জন্যে আমরা সাহিত্যিকমাত্রেই লালায়িত তা হচ্ছে আলোরই বিকার। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন আলো জিনিশটা কি? তার উত্তর — কথার জোরে অন্ধের চোখ ফোটানো যায় না।

বুদ্ধদেব কি রকম ভাষায় লিখতে চান, তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং সরস্বতীকে বলেছিলেন, 'দেবি! ভাষা এত দুর্বল কেন? ভাষার সেই রহস্য আমাকে বলো যাতে তা দীপ্ত কৃপাণ হ'য়ে ওঠে, প্রবল বন্যা হ'য়ে ওঠে, হ'য়ে ওঠে দুরন্ত বহ্নিশিখা।'

লেখকের মহাসৌভাগ্য যে, দেবী সরস্বতী তাঁকে সে-রহস্য বলেননি। কেননা তাহ'লে

বুদ্ধদেবের রচনারীতি হ'য়ে উঠত আলঙ্কারিকেরা যাকে বলেন গৌড়ীরীতি আর ইংরেজরা যাকে বলেন bombast। ফলে সে ভাষা হ'য়ে উঠত প্রবল বন্যার মতো, দুরন্ত অগ্নিশিখার মতো। অর্থাৎ সাহিত্য জগতে একটি ভীষণ উৎপাত। আমরা পাঠকরা এ-জাতীয় উৎপাতকে ভয় করি, ভালবাসিনে।

সে যাই হোক, তাঁর "বাথরুম"-এও 'দুর্বার জলরাশি'র সাক্ষাৎ আমরা পাইনি, আর তাঁর ক্লাইভ স্ট্রিটের চাঁদও দুরন্ত বহ্নিশিখা নয়।

বন্যা, তুফান অগ্ন্যুৎপাতাদির সঙ্গে কোনোরূপ সাদৃশ্য না-থাকলেও ভাষার অন্তরে যে প্রাণ ও স্পষ্ট গতি থাকতে পারে তার প্রমাণ বুদ্ধদেবের কোনো-কোনো প্রবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। "রূপ ও স্বরূপ"-এর স্বচ্ছন্দ গতি মুক্তছন্দ গদ্যের প্রকৃষ্ট নমুনা। এর ভিতর বন্যা নেই, স্রোত আছে, কিন্তু সে-স্রোত মনকে টেনে নিয়ে যায়। ... বুদ্ধদেবের ভাষার স্পষ্টগুণ তার গতি ও প্রাণ।' ·

'বিচিত্রা', অগ্রহায়ণ ১৩৪২

....

সব ভালো কবিতাই এমন যে কানে শুনলেই প্রেমে পড়তে হয়, তার 'অর্থে'র জন্য মাথা ঘামাবার কথা মনে হয় না। কবিতা আসলে 'বোঝবার' জিনিষ নয়, সুতরাং অমুক কবিতা কঠিন কি বোঝা যায় না — এটা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য। আধুনিক কবিতা কঠিন বলেই জনপ্রিয় নয়, সহজ হলেই জনপ্রিয় হবে, একথা বিশ্বাস করবার তাই কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না : কেন না সুবোধ্য কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা আসলে কবিতাই ভালোবাসেন না, কবিতার মধ্যে ইচ্ছাপূরণের উপাদান খোঁজেন মাত্র।

আনন্দবাজার পত্রিকা — বুদ্ধদেব বসু
শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৬

কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা

(তৃতীয় বর্ষ)

দশম একাদশ সংকলন

১৯৭৪

কলকাতা

(তৃতীয় বর্ষ)

দশম-একাদশ সংকলন

কৃতজ্ঞতা

প্রচ্ছদ ও সূচিপত্রের সাহায্যের জন্য

বিপুল গুহ

সম্প্রতি-প্রকাশিত 'মহাভারতের কথা'র

মুখবন্ধ পুনর্মুদ্রণের অনুমতির জন্য

সুপ্রিয় সরকার

গ্রন্থপঞ্জিতে সংযোজন :

১৫৪ মহাভারতের কথা (সমালোচনা)। রচনাকাল : ১৯৭১-৭৪।
প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৮১। ডিমাই ১৬। পৃ ২৯৯।
প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী এম. সি. সরকার। কুড়ি টাকা

চিত্রপরিচিতি

আটচল্লিশ পৃষ্ঠার উল্টোদিকে, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে,
ওপরে, কবি হেমচন্দ্র বাগচী [কৃষ্ণনগর ১৯৫৫]
নিচে, অমিয় চক্রবর্তী [কলকাতা ১৯৫৫] এবং
পরের পৃষ্ঠায়, ওপরে, যামিনী রায় [কলকাতা ১৯৫৪]
ঐ পৃষ্ঠায় নিচের ছবিতে ভোলানাথ দত্ত এবং অনেক মারাঠি সহকর্মী
[ধারওয়ার ১৯৫৫ ; 'কলকাতার যাবোয়াস্তা' দেখুন]

বাহাত্তর পৃষ্ঠায়, ম্যুনিখ-এর নিম্ফেনবুর্গ বাগানে [১৯৬১]
আশি পৃষ্ঠায়, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের লোয়েব অডিটরিয়মে, রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে বক্তৃতাদানরত [১৯৬১]

দাম : পাঁচ টাকা

১৪/১০৭ গলফ ক্লাব রোড, কলকাতা ৩৩ থেকে
প্রশান্ত বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা

মহাভারতের কথা-র কথা

বুদ্ধদেব বসু

কবির মৃত্যু

নরেশ গুহ

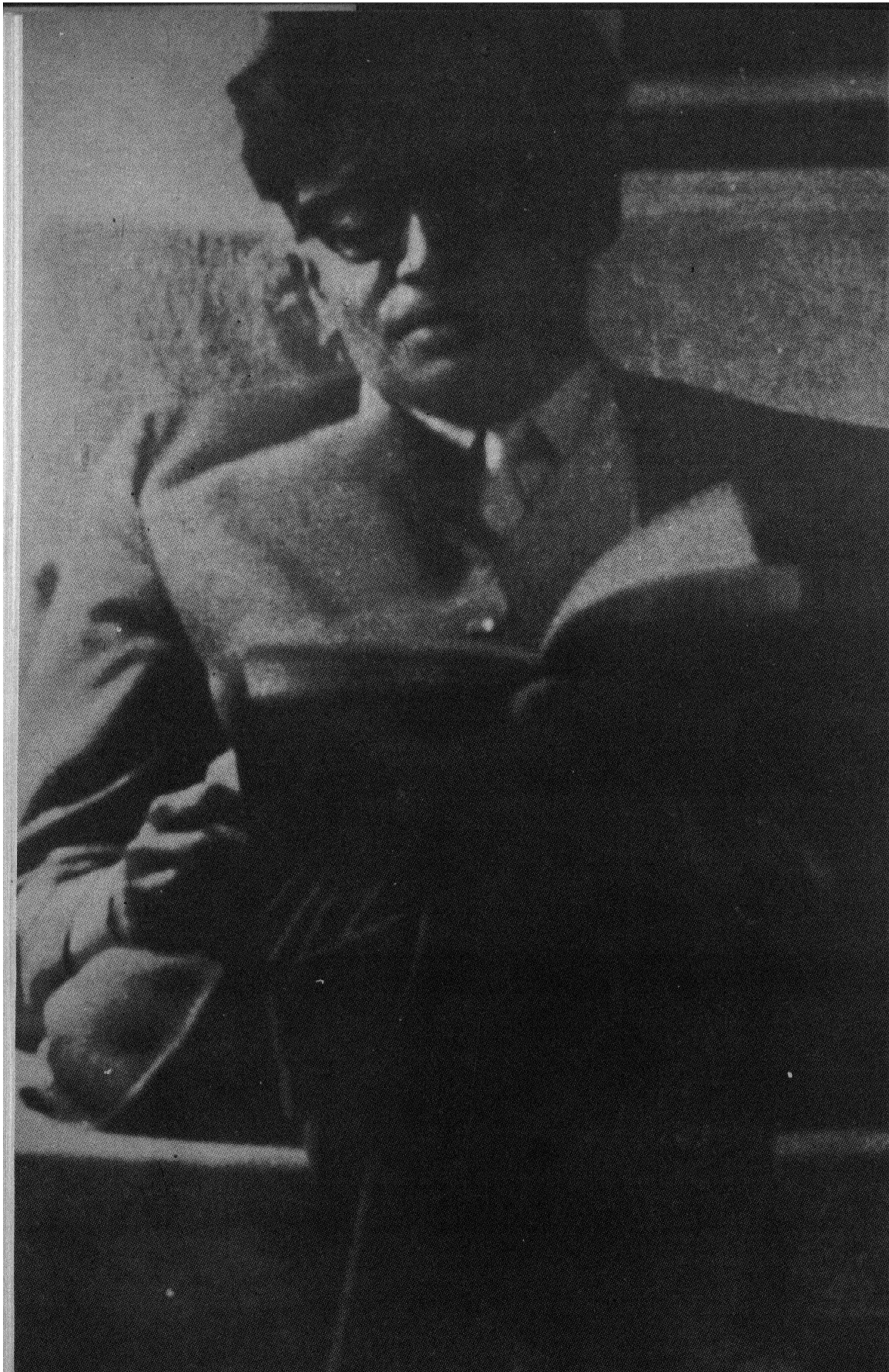
বুদ্ধদেব বসুর গদ্য

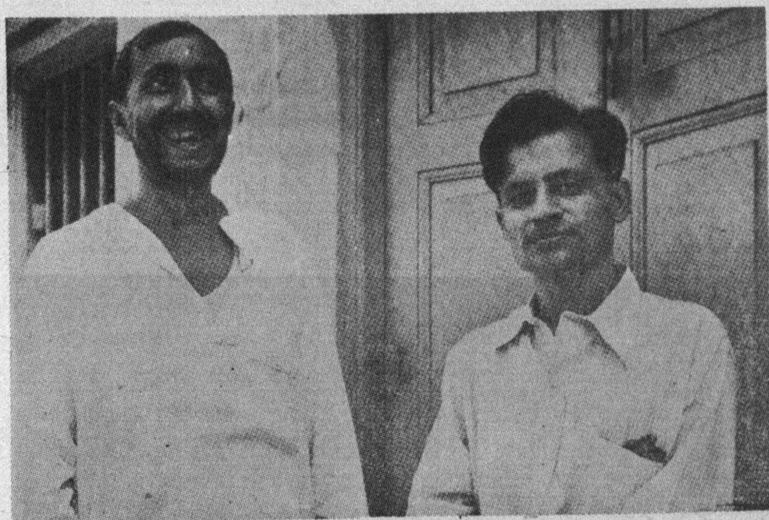
সুধীর রায়চৌধুরী

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

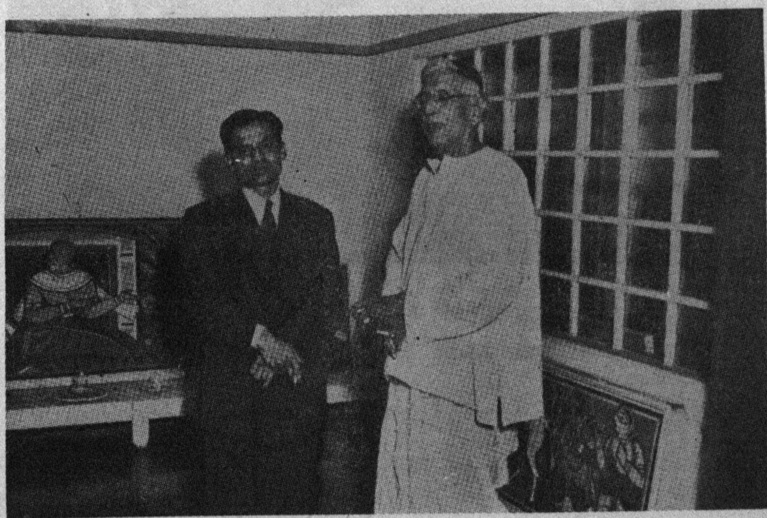
জ্যোতির্ময় দত্ত

চিঠি : গ্রন্থপঞ্জি : ছবি

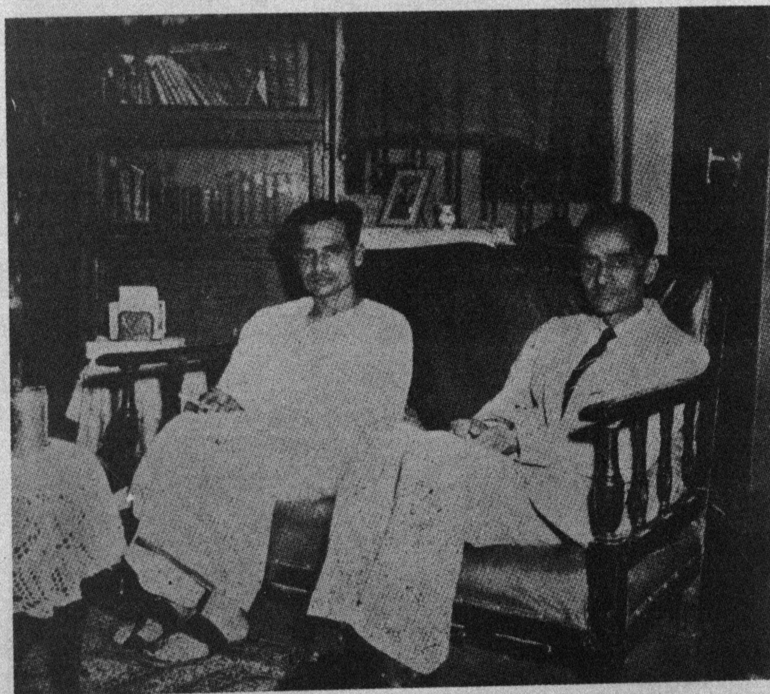




বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কবি হেমচন্দ্র বাগচী (কৃষ্ণনগর ১৯৫৫)



বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যামিনী রায় (কলকাতা ১৯৫৪)



বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কবি অমিয় চক্রবর্তী (কলকাতা ১৯৫৫)

বু দ্ধ দে ব ব সু

৩০ নভেম্বর ১৯০৮
১৮ মার্চ ১৯৭৪

কিন্তু তুমি, দেবতুল্য, তুমি শেষ পর্যন্ত স্বনিত ছিলে
যখন উপেক্ষিতা মৈনাদেরা চালিয়েছে ক্ষিপ্ত অভিযান:
পার হ'য়ে তাদের চীৎকার রোল, হে সুন্দর, তুমি এঁকে দিলে
সামঞ্জস্য; ঘটালে হননমত্ত শক্তি থেকে গানের উত্থান।

কেউ ছুঁতে পারেনি তোমার মাথা, অথবা তন্ময়
বীণাতন্ত্রী — যত হোক আক্রমণে পরাক্রান্ত, আর যত ধারালো পাথরে
বিঁধেছিলো হৃৎপিণ্ড, স্পর্শমাত্রে কোমল আদরে
পরিণত হ'য়ে গেলো — আর শ্রুতিময়।

অবশেষে যখন তোমাকে ধ্বংস ক'রে দিলো ক্রূর প্রতিদানে
তোমার অমর ধ্বনি বিহঙ্গমে, বৃক্ষে র'য়ে গেলো,
র'য়ে গেলো সিংহে ও শিলায়। তুমি গাও এখনো সেখানে

অন্তর্হিত হে দেবতা! পথচিহ্নে অনন্ত উত্তর!
যেহেতু প্রচণ্ড ওরা, তোমাকে খণ্ডিত ক'রে নিখিলে ছড়ালো —
তারই জন্য আমরা এখন শ্রোতা। আর বিশ্বপ্রকৃতির কণ্ঠস্বর।

অর্ফিউস-এর প্রতি সনেট
রাইনার মারিয়া রিলকে
এই অনুবাদ : কলকাতা, বর্ষ এক, একাদশ-দ্বাদশ সংকলন।

'মহাভারতের কথা'র কথা

বুদ্ধদেব বসু

আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে আমি একবার মার্কিনদেশের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার অধ্যাপনার একটি প্রসঙ্গ ছিলো তুলনামূলক ইন্দো-য়োরোপীয় এপিক — একদিকে ইলিয়াড, অদিসি, ঈনীড, অন্যদিকে মহাভারত ও রামায়ণ। সেই সূত্রে কিছু পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হয় আমাকে, আমার গোচরে আসে অনেক তথ্য, সংকেত, প্রতিসাম্য, অনেক সম্বন্ধস্থাপনের সম্ভাবনা আমাকে চঞ্চল করে; আমি টের পাই আমার মনের দু-একটা পূর্বার্জিত ভ্রূণাকার ভাবনা ধীরে-ধীরে পরিণত হ'য়ে উঠছে। আমার ছাত্রছাত্রীরা আন্তর্জাতিক ও অসমবয়সী — কেউ নবাগত জর্মান অথবা গ্রীক, কেউ বা য়িহুদি, কেউ-কেউ তিন-চার পুরুষের মার্কিন; বুদ্ধিমান তরুণের পাশে কৃতবিদ্য প্রৌঢ়জনও উপবিষ্ট। তাঁরা তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন অভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে-সব তর্ক তোলেন, তাতেও আমি নতুন চিন্তার উপলক্ষ পাই। মহাভারত বিষয়ে একটি বই লেখার ইচ্ছে সেই সময়েই আমার মনে অঙ্কুরিত হয়েছিলো — আমেরিকার আরো কয়েকটা বিদ্যালয়ে ঘুরে অনুশীলনের আরো সুযোগও পেয়েছিলাম।

দু-বছর পরে, মনের মধ্যে সেই ইচ্ছার তাড়না ও ব্রিফকেসে দু-খাতা-ভর্তি নোট নিয়ে, আমি ফিরে এলাম আমার অভ্যস্ত জীবনে, কলকাতায়। ভেবেছিলাম গুছিয়ে ব'সেই লিখতে শুরু ক'রে দেবো, কিন্তু যথোপযুক্ত অবকাশ আর জোটে না — মাস, বছর অন্য নানা ব্যাপারে কেটে যায়। এমন নয় যে অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে মহাভারতের সঙ্গে আমার কখনো বিচ্ছেদ ঘটেছিলো — বরং আমি যে ক্রমশ আরো জড়িয়ে পড়েছিলাম, আমার সাম্প্রতিক অনেক নাটকে ও কবিতায় তার নিদর্শন আছে। তবু : গদ্য বইটির কথা ভাবলেই আমি যেন ভয় পেয়ে পেছিয়ে যাই; আমার কেবলই মনে হয় আমি এখনো যথেষ্ট প্রস্তুত হ'তে পারিনি; পরিকল্পনা ও রচনার মধ্যে বিপুল ব্যবধান পেরোবার মতো সম্বল আমার হাতে নেই। তারপর একদিন ভেবে দেখলাম আমরা যাকে প্রস্তুতি বলি সেটা সর্বদাই এক আপেক্ষিক ব্যাপার : যে-বিন্দুটিকে এখন ভাবছি অভীষ্ট সেখানে পৌঁছনোমাত্র অভীষ্টতরর সম্ভাবনা দেখা দেবে, আর আমার বয়সে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করাও চলে না। তাছাড়া, যে-মানুষকে প্রতিদিনের শ্রমে প্রতিদিনের জীবিকা অর্জন করতে হয় তার পক্ষে অব্যাহত দীর্ঘ অবকাশ সুদূরপরাহত। যদি কল্পনাটিকে বাস্তবে উত্তীর্ণ ক'রে দিতেই হয়, তা করতে হবে প্রস্তুতির অনটন নিয়েই, সাংসারিক বিরুদ্ধতারই মধ্যে। অগত্যা, আমার বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব সুসম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্তভাবে, আমার প্রাথমিক কয়েকটি ভাবনা-ধারণাকে এখানে উপস্থিত করছি।

বলা বাহুল্য, আমি দশ বছর আগে ইণ্ডিয়ানায় যা ভেবেছিলাম, এটা ঠিক সে-বই নয়।

তখন আমার কল্পনায় ছিলো একটি সরল চেহারার অনতিদীর্ঘ নির্ভর পুস্তক, কিন্তু ধীরে-ধীরে আমার মনের মধ্যে বিষয়টির ব্যাপ্তি এত বেড়ে গেলো যে গঠনপদ্ধতি কিছুটা বদলাতে বাধ্য হলাম। আমার মনে হ'লো, এ-বইয়ের পক্ষে তথ্যসংক্রান্ত স্পষ্টতার প্রয়োজন আছে, পাঠকবর্গ ও স্বয়ং লেখকের স্মরণের সহায়কল্পে পথে-পথে নিশেন পুঁতে রাখাও ভালো; আর রচনাকালে এমন অনেক পার্শ্বিক প্রশ্ন উত্থিত হ'তে লাগলো, যা আলোচনার অযোগ্য নয় অথচ যা মূল পুঁথিতে প্রবিষ্ট করলে রচনায় শৃঙ্খলা থাকে না। তাছাড়া, আমি যেহেতু বইখানা লিখেছি বাংলাভাষায়, এবং মনে-মনে এই উচ্চাশা পোষণ করছি যে 'সাধারণ' পাঠকপাঠিকারাও এটি পড়বেন, তাই য়োরোপীয় পুরাণ ও ইতিহাস-সংক্রান্ত এমন কোনো-কোনো তথ্যের উল্লেখ করলাম যা বিদগ্ধজনের মনে হ'তে পারে বাহুল্য। এ-সব কারণে পাদটীকার ব্যবহার অনিবার্য হ'লো, এবং পৌনঃপুনিক অনুচিন্তনের ফলে সেগুলি সংখ্যায় বা আয়তনে আর বিনীত রইলো না। কোনো পাঠককে সেগুলি প্রতিহত করবে না, আশা করি। কেউ-কেউ হয়তো কৌতূহলের খোরাক পাবেন।

বলতে ভালো লাগছে, এই প্রচেষ্টায় অনেকের সাহায্য পেয়েছি। আমি গৃহবাসী জীব, সম্প্রতি লোকসমাজ থেকে বিবিক্ত; বিষয়টির প্রসার অনুযায়ী উপাদান আহরণ আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো না, যদি না কয়েকটি বন্ধু আমার সহায় থাকতেন। অনেক প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ ক'রে দিয়ে বা সন্ধান জানিয়ে, আর কখনো কোনো তথ্য বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে, আমাকে উপকৃত করেছেন শ্রী নরেশ গুহ, সুবীর রায়চৌধুরী, স্বপন মজুমদার, দেবব্রত রায় ও প্রবাল দাশগুপ্ত। শ্রী স্টার্লিন স্টীল ও সত্রাজিৎ দত্ত বিদেশ থেকে কিছু জরুরী বই উপহার পাঠিয়েছেন; আমার কোনো-কোনো আত্মীয়ের কাছে বই কেনার জন্য আর্থিক সাহায্যও পেয়েছি। প্রুফ-সংশোধন ও সম্পৃক্ত বিষয়ে নিরন্তর আমার সহায় ছিলেন শ্রী নরেশ গুহ ও অমিয় দেব; তাঁদের প্রযত্ন ও অভিনিবেশ আমাকে নানা ধরনের ত্রুটি ও অসংগতি থেকে রক্ষা করেছে। মাঝে-মাঝে, আমার আবেদনের উত্তরে, আমাকে জ্ঞানের কণিকা উপহার দিয়েছেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর গবেষণা-সহকারী শ্রী অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। 'প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা'র লেখক শ্রী মনোনীত সেন পত্রযোগে অনেক সুপরামর্শ দিয়েছেন আমাকে, দু-একটি অনুপুঙ্খ উদ্‌ঘাটন করেছেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষার তুলসীদাস-দত্ত ব্যাখ্যার প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তরুণ হিন্দী লেখক শ্রী সোমনাথ মেহ্‌টা; তাঁর সাহায্যে তুলসীদাসের স্বাদ নিতে পেরেছি। শ্রী সুবীর রায়চৌধুরী নির্দেশিকাটি রচনা ক'রে দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারো-কারো কাছে গভীর ভাবে ঋণী; কিন্তু গ্রন্থে প্রকাশিত ব্যাখ্যা ও মতামতের জন্য শুধু আমিই দায়ী, সে-কথা হয়তো না-বললেও চলে।

বইখানার অভিপ্রায় ও পরিধি বিষয়ে দু-একটি কথা ব'লে রাখতে চাই। প্রথম কথা, আমার আলোচনার ধারা সাহিত্যিক, অথবা — যেহেতু 'সাহিত্য' কথাটা বড়ো বেশি ব্যাপক — তাই বলা যাক কবিতা ও কবিতার মতো মিথিলজির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যে-সব ব্যাপার অবিশ্বাস্য (কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালে যা বিশ্বাস করতেন), আমি সেগুলিকে 'অবাস্তব' ব'লে প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং সেই সব বাস্তবাতীত রহস্যের মধ্যেই মর্মকথার সন্ধান করেছি। দ্বিতীয় কথা, আমার প্রধান আলোচ্য মহাভারত

হ'লেও তুলনা ও প্রতিতুলনার টানে রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই গ্রথিত হ'য়ে গেছে; পশ্চিমদেশীয় প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্য, এবং স্বদেশজাত আরো কিছু দৃষ্টান্ত, সেই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'লো। নানা দেশের ও নানা যুগের কল্পনাচিত্র, যারা পরস্পরের দর্পণের কাজ করে, আর কখনো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাও — এদের সংসর্গে স্থাপন ক'রে আমি দেখাতে চেয়েছি যে মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান। এই কথাটা অবশ্য ভারতবাসীদের অজানা নয়, তবু নতুন ক'রে বলারও প্রয়োজন আছে

এবারে আমার কলকজ্জার ব্যাখ্যা দেয়া দরকার, নয়তো বন্ধনীভুক্ত উল্লেখগুলি নিয়ে পাঠকেরা ধাঁধায় পড়বেন। মহাভারতের পর্বাধ্যায়-সংখ্যায় আমি সর্বত্র কালীপ্রসন্নর অনুসরণ করেছি, কেননা সেটাই একমাত্র সমগ্র সংস্করণ, যা বাঙালী পাঠকের পক্ষে — অন্তত অধিকাংশের পক্ষে — অক্লেশে অধিগম্য হবে; কারো ইচ্ছে হ'লে অংশটি প'ড়ে নিতে পারবেন। দুঃখের বিষয়, বাল্মীকি-রামায়ণের কোনো তুলনীয় বঙ্গানুবাদ প্রচলিত নেই, তাই তৎসম্পৃক্ত উল্লেখ মূল গ্রন্থ অনুসারে দিতে হ'লো। আমি প্রথমে নাম করেছি পর্বের অথবা কাণ্ডের, পরবর্তী প্রথম সংখ্যাটি অধ্যায় বা সর্গসূচক, দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্লোক বা শ্লোকগুচ্ছ নির্দিষ্ট হ'লো। যে-সব গ্রন্থে (যেমন দীর্ঘতর উপনিষৎসমূহে) অধ্যায়গুলিও পরিচ্ছেদে বিভক্ত, সেখানে তৃতীয় সংখ্যাটি শ্লোকবাচক। যেখানে একই প্রসঙ্গে একাধিক বিশ্লিষ্ট অধ্যায় বা শ্লোক উল্লেখিত হয়েছে সেখানে আমি কমা ব্যবহার করেছি, পারম্পর্য দেখাতে হাইফেন। সংস্কৃত উল্লেখ কোন পুঁথির কোন সংস্করণ অনুযায়ী, তার তালিকা নিচে দেয়া হ'লো :

মহাভারত	আর্যশাস্ত্র (আদি থেকে শল্যপর্ব), বঙ্গবাসী (সমগ্র নীলকণ্ঠের টীকা সংবলিত)
বাল্মীকি-রামায়ণ	আর্যশাস্ত্র
মনুসংহিতা	”
কঠোপনিষৎ	উদ্বোধন
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ	”
শ্বেতাশ্বতর ”	”
ছান্দোগ্য ”	মহেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত
ভগবদ্গীতা	উদ্বোধন
অধ্যাত্ম-রামায়ণ	বঙ্গবাসী
মার্কণ্ডেয়পুরাণ	”

মহাভারতের সিদ্ধান্তবাগীশ-সংস্করণটিও আমি প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছি, যথাস্থানে তা উল্লিখিত হ'লো। লক্ষ করেছি, বঙ্গবাসী ও আর্যশাস্ত্রের লেখন ঠিক অনুরূপ নয়, সিদ্ধান্তবাগীশে পাঠান্তর ও ব্যত্যয় আরো বেশি, এবং এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে পর্বাধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যাতেও

অসাম্য অনেক। এদিকে আবার কালীপ্রসন্নে পর্বাধ্যায়-সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে ভিন্ন। কিন্তু এ-সব জটিলতা আমার আলোচনার পক্ষে তেমন জরুরি নয়; কেননা অধিকাংশ পাঠান্তর তুচ্ছ, অথবা সমার্থক বিকল্প শব্দে পর্যবসিত; আমি পাঠভেদের উল্লেখ করেছি শুধু নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেলে, অথবা যেখানে শ্লোকপর্যায় পৃথক — যেমন ৩, ২৯, ৩০ ও ৪১ সংখ্যক পাদটীকায়। কোনো পাঠক যদি আমার উল্লেখ থেকে মূল শ্লোকে পৌঁছতে চান — আশা করি অন্তত কোনো-কোনো পাঠক তা চাইবেন — তার জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র শ্রমের প্রয়োজন হবে, পুঁথিসংক্রান্ত হেরফে'গুলি বৃহৎ কোনো বিঘ্ন ঘটাবে না — যদি না অবশ্য অংশবিশেষ বর্জিত হ'য়ে থাকে।

আমার ব্যবহৃত অন্যান্য আকর-গ্রন্থের পরিচয় :

ঋগ্বেদ	রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত বঙ্গানুবাদ
অথর্ববেদ	William Dwight Whitney-কৃত ইংরেজি অনুবাদ (মূলের বহু শব্দ ও শব্দার্থ সংবলিত)
মৎস্যপুরাণ	বঙ্গবাসী (মূল ও বঙ্গানুবাদ)
ভাগবতপুরাণ	,,
বিষ্ণুপুরাণ	আর্যশাস্ত্র (মূল ও বঙ্গানুবাদ)
হরিবংশ	বর্ধমান সং বঙ্গানুবাদ
জাতক	ঈশানচন্দ্র ঘোষ-কৃত বঙ্গানুবাদ
মহাভারত (বনপর্ব)	বর্ধমান সং বঙ্গানুবাদ
কালিপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত	বসুমতী (সমগ্র)
কাশীরাম দাসের মহাভারত	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
কৃত্তিবাসী রামায়ণ	দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত
তুলসীদাসের 'শ্রীরাম-চরিতমানস	গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (মূল ও ইংরেজি অনুবাদ)

যেহেতু এই পুস্তক পুরাসাহিত্য-সম্পৃক্ত, তাই গ্রীক ও লাতিন নামের লিপ্যন্তরণে আমি একটু বিশেষ যত্নবান ছিলাম, সংশয়স্থলে বহুভাষাবিদ ফাদার রবের আঁতোয়ান, এস. যে. ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের উৎকৃষ্ট অভিধানটির কাছে নির্দেশ নিয়েছি। ফলত, আমার পূর্ব-ব্যবহার এখানে অনেক বদলে গেলো (ঈডিপাস স্থলে অয়দিপৌস, ইলেক্‌ট্রা স্থলে এলেক্‌ত্রা), কিন্তু পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্যহানির আশঙ্কায় এ-ধরনের আক্ষরিক অনুকরণ আমি সর্বত্র করিনি। কোনো-কোনো বহুশ্রুত নামের প্রচলিত ইঙ্গ-বঙ্গীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রাখলাম (হোমার, ভার্জিল, সক্রেটিস, ট্রয়, ইলিয়াড); অন্য অনেক স্থলে মূলের ধ্বনি ও বাঙালিদের অভ্যাসের মধ্যে একটা রফা করা হ'লো। পাঠককে অনুরোধ, তিনি যেন এ-বিষয়ে কোনো যান্ত্রিক সমত্ব প্রত্যাশা না-করেন।

গ্রন্থের অনামী অনুবাদ সবই আমার। কোনো-কোনো স্থলে পূর্বকৃত অনুবাদের অনুসরণ

করেছি — অবশ্য ভাষাটাকে আমার নিজের ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিয়ে। সংস্কৃত থেকে অনুবাদকালে আমার সাধ্যমতো মূলের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলাম।

'মহাভারতের কথা'র প্রথম লেখন রচিত হয় ১৯৭১-৭২-এর হেমন্ত ও শীতঋতুতে, প্রকাশিত হয় আঠারোটি কিস্তিতে 'দেশ' পত্রিকায় — বঙ্গাব্দ ১৩৭৮, ১৮ চৈত্র থেকে ১৩৭৯, ১৩ শ্রাবণ তারিখের সংখ্যা পর্যন্ত। প্রেস-কপি তৈরি করার সময় প্রথম দফা পরিশোধন ও পরিবর্ধন করেছিলাম; আর তা'পর, আজকের দিনের শ্লথকর্ম-বিদ্যুৎ-বিরল বিশৃঙ্খল কলকাতায় মুদ্রণ-ব্যাপারে এত দীর্ঘ সময় কেটে গেলো যে, ইচ্ছে না-ক'রেও, পুনর্বিবেচনার সময় পেয়েছিলাম প্রচুর। আমার অত্বর-তৃপ্ত শোধন-স্পৃহার তাড়নে, আদি রচনার অনেক অংশ ক্রমে-ক্রমে নতুন ক'রে লিখেছি। যোগ করেছি অনেক নতুন প্রসঙ্গ ও টীকা — প্রুফসংশোধনের সময় পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার বিরাম ছিলো না। আর বাংলা বইয়ের দুর্মরতম শত্রু যে-ছাপার ভুল, তার বিরুদ্ধেও তিনজনে মিলে দীর্ঘায়িত যুদ্ধ চালিয়েছি। তবু, সব চেষ্টা সত্ত্বেও, কিছু ত্রুটি অনিবার্যভাবে ঘ'টে গেলো, বইয়ের পরিশিষ্টে তা উল্লেখ করলাম।

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সময় যাঁরা আমাকে পত্রদ্বারা বা টেলিফোনযোগে উৎসাহ দিয়েছিলেন, এই সুযোগে তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ তাঁদেরও, যাঁরা বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন; তাঁদের সব কথা আমি চিন্তা ক'রে দেখেছি, এবং আমার বিচারবুদ্ধি যেখানে সায় দিয়েছে, সেখানে যথোচিত পরিবর্তনও করেছি। আর যাঁরা আমাকে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্ন ক'রে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে ও-সব বিষয় আমার চর্চার ও এই গ্রন্থের পরিধির বহির্ভূত। আমি পণ্ডিত নই, প্রেমিক মাত্র; এই আলোচনা এক রসভোক্তার আনন্দবোধের নিঃসরণ।

বইখানার একটি দ্বিতীয় খণ্ড আমার পরিকল্পিত আছে, কিন্তু কতদিনে তা লিখে উঠতে পারবো জানি না।

মার্চ, ১৯৭৪
নাকতলা, কলকাতা

এম. সি.সরকার এণ্ড সন্সের সৌজন্যে

কবির মৃত্যু

নরেশ গুহ

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, নগরী নিশ্চল, দেশ প্রায় নিষ্প্রদীপ, এমন এক বসন্তরাত্রির শেষ যামে, অনলস এবং অভ্যস্ত সৃষ্টিকর্মে ক্ষান্তি দিয়ে, অমোঘ মৃত্যুর হাতে তিনি সমর্পণ করলেন নিজেকে, নীরবে নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অসহায় আমরা তাকিয়ে দেখলাম, ক্রমে শরশূন্য ব্রণরহিত হ'য়ে এলো তাঁর তরঙ্গ। তিনি মৃত হলেন। নিদারুণ এই বিচ্ছেদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর্তবিলাপের কণ্ঠ আমাদের রোধ হ'য়ে এসেছিল।

তাঁর প্রিয়তম সুহৃদ এবং সহযাত্রী আর-এক বাঙালি কবির অনুরূপ বিচ্ছেদে কাতর হ'য়ে, বহু বছর আগে — আজ মনে হয় মাত্র সেদিন — বুদ্ধদেব লিখেছিলেন : 'যে-কোনো মৃত্যুই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু বীরের মৃত্যু মহান।' সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি কবিকে তিনি, এদেশের প্রথামতো, 'ঋষি' কেন বলেননি, বলেননি 'পুরোহিত', কেন ব'লেছিলেন 'যোদ্ধা' এবং 'বীর'। আজ জানতে পেরেছি, সেই বিশেষণের জন্ম হয়েছিল বন্ধুতার উচ্ছ্বাস থেকে নয়, নয় আলঙ্কারিকের প্রবণতা থেকে। এদেশের পক্ষে অনভ্যস্ত ঐ বিশেষণের অন্তরে লুকিয়ে আছে এ-যুগের কবিকৃত্য বিষয়ে তাঁর বেদনা এবং বৈদগ্ধ্যময় আত্মোপলব্ধি। কবির কথা বলতে গিয়ে তাই তিনি স্মরণ করেছিলেন মহাভারতীয় বীরদের, লিখেছিলেন : 'দ্রোণ কর্ণ অভিমন্যুরা আজকের দিনে ভিন্নভাবে মূর্ত হ'য়ে থাকেন। জ্ঞানী, শিল্পী, স্রষ্টা তাঁরা; রূপ অথবা চিন্তার জনয়িতা; কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক। আমরা জেনেছি সৃষ্টিশীলতাই শৌর্য; জেনেছি সৃষ্টিশীল মানুষ নিজেকেও অনবরত সৃষ্টি ক'রে চলেন।' আমাদের কালে বীরত্বের অবসান ঘটিয়ে, বীরের আসন লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হয়েছে যন্ত্র কিংবা যন্ত্রপ্রতিম মানুষ, যারা ভুলে গেছে, 'সব যুদ্ধ ধনুর্বাণ দ্বারা সম্পন্ন হয় না; কিংবা ঐ ধনুঃশর এক প্রতীকমাত্র, এক স্পৃশ্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য, যার অন্তরালে ব্যঞ্জনার বিস্তীর্ণ বীথিকা আমরা দেখতে পাই।' সমাজের কোন কাজে লাগেন কবিরা, কিংবা আদৌ কোনো 'কাজ' তাঁদের দিয়ে নিষ্পন্ন হয় কিনা, তা-নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত মানুষের হর্তাকর্তারা যখন দেশদেশান্তরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বুদ্ধদেব তখন অনায়াসে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন : 'মহাভারতের বীরেরা অসাধ্যসাধন করেছেন, জগতের কবিরাও তাই ক'রে থাকেন। জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম : এই হ'লো মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র। পাত্রভেদে রূপভেদ হয় সংগ্রামের, এবং একটা স্তরে এসে তাকে বাইরে থেকে আর সংগ্রাম ব'লে চেনা যায় না।' কবির পক্ষে সঙ্গত এই একান্ত ও গোপন যুদ্ধে, 'প্রত্যক্ষভাবে সহকর্মী বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাঁর হয় না, এবং যা তিনি সৃষ্টি করেন তাও এক বায়বীয় বস্তু, প্রায় কোনো বস্তুই নয় :শাদায় কালোতে পংক্তিবদ্ধ

শব্দ শুধু। তাকে সভ্যতার বা আমাদের অস্তিত্বের একটি প্রধান উপাদান ব'লে স্বীকার করতে স্বভাবতই অনেক মানুষের বিবেকে বাধে। কিন্তু তিনিও যোদ্ধা : তাঁর শৌর্য অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত, শুধু অনুভূতির গোচর, ভাবনার অধিগম্য।'

প্রবৃত্তির কারাগারে যে-মানুষ বন্দী, সে-ই আবার সমর্থ নিজেকে শাপভ্রষ্ট দেবশিশু ক'রে রচনা করতে, — প্রথম পার্থের উপযুক্ত এই বন্দীর বন্দনা উচ্চারণ ক'রে বাংলাকবিতার রণক্ষেত্রে যিনি প্রবেশ করেছিলেন, সংগ্রামের শেষে — প্রায় অর্ধশতক ব্যাপী অবিরাম সংগ্রামের শেষে — কোন উপার্জিত গৌরব তিনি রেখে গেলেন আমাদের জন্য একথা ভাবতে গেলে, কবিবন্ধুর প্রসঙ্গে উচ্চারিত তাঁর নিজের কথারই পুনরুক্তি করতে আমি আপাতত বাধ্য। তাঁর সেই ভাবনার আপাতলক্ষ কোনো ব্যক্তি হ'লেও, স্বীয় আরাধ্য সংকল্পই ছিলো তার প্রকৃত লক্ষ। 'আমাদের চিন্তা স্বভাবত অস্পষ্ট', লিখেছিলেন তিনি, 'আমাদের ভাষা স্বভাবত বিশৃঙ্খল, আমাদের আবেগ স্বভাবত অপরিচ্ছন্ন; এবং এই প্রাকৃত ব্যবস্থা অথবা অবব্যস্থাতেই যাকে বলে কাজ চ'লে যায়, সর্বসাধারণ এই নিয়েই তৃপ্ত থাকে। কিন্তু কবি চান আত্মোপলব্ধি, তাই তাঁর জীবন এক অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম : চিন্তার সঙ্গে ভাষার, ভাষার সঙ্গে ছন্দের, ছন্দের সঙ্গে অর্থের, অর্থের সঙ্গে ইঙ্গিতের যুদ্ধ, সীমাহীন, বিরামহীন, পর্যায়ধর্মী : সন্ধি হয় না কখনো, একটি যুদ্ধে যদি কষ্টেসৃষ্টে জেতা গেলো, তখনই নতুন ও তীব্রতর আর একটি সংগ্রাম আরম্ভ হ'য়ে যায় : কবির যন্ত্রণার ও চিরযৌবনের রহস্য এ-ছাড়া আর কিছুই নয়। যে-ভাষা হাটে-বাজারে মুখে-মুখে ঘূর্ণিত হ'তে-হ'তে মলিন হ'য়ে যাচ্ছে, কিংবা যা অভিধানের অবরোধে মৃতপ্রায়, কবি তাতে সঞ্চার করেন প্রাণ, তাপ, দ্যুতি, ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, তাকে ক'রে তোলেন একাধারে চঞ্চল ও স্থির, সনাতন ও সদ্যোজাত, অবাধ্য ও উত্তাল প্রকৃতিকে বিরাট চেষ্টায় সংহত করেন একটি আত্মবশ স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে।' সামান্য বদল ক'রে, তাঁর কথাই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে আজ আমার একটুও লজ্জা হচ্ছে না : 'আমাদের সমকালীন বাংলাদেশে এই সৃষ্টিক্রিয়ার দুর্বিষহ গৌরব যিনি সবচেয়ে প্রসন্ন মুখে বহন করেছেন' তিনি বুদ্ধদেব বসু। এই দৃষ্টান্তে কৌতুক ছাড়া আর কিছুই বোধ করার ক্ষমতা নেই যাদের, সেই নামহীন 'সর্বসাধারণ' স্বভাবতই কোনোদিন তাঁকে সহ্য করতে পারেনি। পারা কঠিন।

বুদ্ধদেব বিষয়ে যা-কিছু বলা যাক তাই হ'য়ে উঠবে কবিতা বিষয়ে বলা। আক্ষরিক অর্থে তিনি কবিতাতে সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে, যে-কবিতার মায়াবী টেবিল থেকে — যেন সাময়িকভাবে — উঠে গিয়ে, নিঃশব্দে শেষবারের মতো তিনি নিদ্রিত হ'লেন। কাব্যভাবনাই তাঁর একমাত্র জীবনী। বাংলাভাষায় অধিকতর প্রজ্ঞা আর মনীষা আর লাবণ্যের সঙ্গে সেই কবিতার রহস্য আর কে ব্যক্ত করেছেন আমি জানি না।

আধুনিক বিশ্বে কোনো প্রধান কবির রচনাই পরিমাণে বিপুল না। ইয়েট্‌সের না, রিলকের না, এলিঅটেরও না। তবু দেখা যাবে, সংকলন বা অনুবাদের বাইরেই, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা, ছোটোবড়ো মিলিয়ে উনিশ। তাঁর প্রথমতম কাব্যগ্রন্থের সমবয়সী আমি, এই শহরে এসেছিলাম ষোলো বছর বয়সে। উৎকর্ষে আর বৈচিত্র্যে আর প্রগাঢ়তায় তাঁর কবিতার

অলোকসামান্য অথচ কঠিন বিবর্তন পাশে থেকে লক্ষ করতে-করতে আজ আমি পঞ্চাশের দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। মনে না-প'ড়ে কি পারে, স্বকীয় রচনার চেষ্টাতেই শুধু তৃপ্তি ছিলো না তাঁর। অবিরাম তিনি যুদ্ধ করেছেন আধুনিকতার শত্রুপক্ষের সঙ্গে, ক্লান্তিহীন ছিলেন তিনি সমকালীন সমস্ত কবিদের গুণকীর্তনে। এখন আর তিনি বাধা দিতে পারবেন না জেনে, সগর্বে ঘোষণা করি . প্রকৃতি এবং পল্লীপ্রেমিক আবহমান বাংলাকাব্যের পরিবেশে, শীর্ষস্থানীয় এই বিদগ্ধ নাগরিক কবি নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে যুদ্ধ চালিয়ে, মর্যাদার উচ্চাসনে স্থাপন করতে পেরেছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতাকে, প্রকৃতির স্তব কিংবা পল্লীর স্তাবকতা যে-কবিতার আদর্শ নয়।

বিশ্বসাহিত্যে পরিপ্লাবিত তাঁর বিদগ্ধ ভারতীয় চিত্তের পূর্ণ জাগরণ ঘটেছিল ব্যাসকৃত মহাভারতের প্রবল উল্লাসে। আর সেই জন্যই তাঁর চিত্তপ্রসূত প্রধান কবিতাবলীর মূল ভাবনাসূত্র নিছক স্বদেশীয় হ'তে পারেনি, হয়েছে সমকালীন সর্বদেশীয়। তাঁর উৎকৃষ্টতর কবিতার বিষয় তাই প্রধানত কবি এবং কবিতা, বিশ্বব্যাপী যন্ত্রযুগের হৃদয়হীনতার মধ্যে সমাজের সঙ্গে কবির বিবর্ধমান বিচ্ছেদের চেতনা, যে-সমাজে কবি উদ্বাস্তু এবং স্থিতিহীন। একালীন বিশ্বের প্রধান কবিদের মতো, তাঁকেও তাই প্রকৃতির সপক্ষে নয়, নিষ্ঠুরভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হ'য়েছিল নিজের প্রতিভাকে। তাঁর কাব্যে তাই কবির প্রতীক হ'য়ে উঠেছিলো তারাই যারা নিঃসঙ্গ, যারা অন্ত্যজ, যারা অসুখী এবং চিরদুঃখী। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাবনায় কবি তাই ঋষি নন, পুরোহিত নন, কবি বীর এবং যোদ্ধা, যে-কবির মুখে আমরা শুনতে পাই :

আমি কে, তা মনে রেখো। সহজেই লক্ষ্যবেধ ক'রে,
না-বুঝে, প্রথমবারে, তারপর থেকে সহজেরে
অসহ্য আত্মীয় জেনে কেবল খুঁজেছি ঘুরে-ফিরে
মায়াবনবিহারিণী নিমিত্তচেতন হরিণীরে।
দেয় না সে আশ্রয়, প্রমিতি, প্রজ্ঞা; তাই তো আমার
পৌঁছবার তৃপ্তি নেই, আছে নিত্য-আরব্ধ যাত্রার
আবর্তন; তাই আমি বনবাসে, নির্বাসনে, ছদ্মবেশে
ঘুরেছি দ্বাদশ দ্বীপ ইন্দ্র, হর, বরুণের দেশে;
করেছি অবগাহন সব তীর্থে; কামনার সান্দ্র আবেদনে
জ্বলেছি সম্মত ধূপ হাজার শয্যায়, মনে-মনে
দ্রৌপদীকে দুর্বল জেনেও।...

হায়, সব অর্জুনেরই সারথি নিস্পৃহ হন একদিন, আর তখনই গাণ্ডীব ধুলোয় প'ড়ে যায়। বীরের মৃত্যু ইন্দ্রপাততুল্য। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে উত্তাল এই মুহূর্তেও এ-কথা আমি নিশ্চিত জানি : কোনো দুর্লভ অথচ প্রাপণীয় সার্থকতার প্রতিভূরূপে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চিরকালের মতো বাসা বাঁধলেন তিনি, ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তাঁকে তুলে নিয়ে মৃত্যুর রথ আমাদের পক্ষে অগম্য ধামে মিলিয়ে গেলো। — এই বাক্যও মৃত্যুর পূর্বে তাঁরই সর্বশেষ লেখা। কে জানতো, এত শীঘ্র, এমন নিদারুণ প্রসঙ্গান্তরে ব্যবহার করতে হবে।

* কলকাতার বেতারে পঠিত

একজন ভাষা-শ্রমিকের চিঠি

....

জনৈক তরুণ সহকর্মীকে লেখা

২৩/০৮/৭২

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। বোদলেয়ারের 'মাতাল হও' কবিতাটির একটি সুষ্ঠু অনুবাদ বিষ্ণু দে বহুকাল আগে করেছিলেন, তাঁকে জিগেস করলে খোঁজ পাবে।

সম্প্রতি আমার হাতে একখানা 'ভাগবতপুরাণ' আসার ফলে আমার মনের প্রশ্নগুলির আপাতত নিরসন হয়েছে, তাই ডক্টর হাজরাকে আর বিব্রত করিনি। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরির 'অথর্ববেদ' তোমার পক্ষে চোখে দেখা ও নাড়াচাড়া করা কি সম্ভব? আমি জানতে চাই বইখানাতে বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদ আছে কিনা, কোনো টীকা আছে কিনা — থাকলে সেটা কোন ভাষায় রচিত। পুরোটা সংস্কৃত হ'লে আমার পক্ষে দুর্বোধ্য হবে।

সংস্কৃত কলেজের বই আমি কি ঋণ পেতে পারি — কোনো অধ্যাপকের সাহায্যে? অধ্যক্ষ এখন কে?

আমার পুজোর লেখা এখনো শেষ হয়নি — কিন্তু ফাঁকে-ফাঁকে মহাভারত ভাবছি।

বুদ্ধদেব বসু

২১/৯/৭২

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আমার পক্ষে আক্ষরিক অনুবাদই ঠিক হবে — তুমি হুইটনির দুটো খণ্ড ছুটির আগে আমাকে এনে দিয়ো। এক মাস সময়ের মধ্যে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উদ্ধার ক'রে নিতে পারবো আশা করছি।

আমার ফরমায়েশি কাজ আপাতত শেষ, 'মহাভারতের কথা' সংশোধনের কাজে হাত দেবো। তাহ'লেও পড়ার ও আলাপ-আলোচনার সময় থাকবে। তুমি যদি ছুটিতে কলকাতায় থাকো 'মাঝে-মাঝে এখানে চ'লে আসতে দ্বিধা কোরো না।

সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে একদিন যাবার জন্য লুব্ধ হচ্ছি। আগামী শীতঋতুতে কোনো-একদিন যাবার চেষ্টা করবো — আশা করি তুমি আমার পথপ্রদর্শক হ'তে পারবে।

আমার বোদলেয়ার বইটা বহুকাল ধ'রে ছাপা নেই — এম. সি. সরকার নতুন সংস্করণ

বের করবে, কিন্তু কতদিনে, তা এখনো অনিশ্চিত।

হুইটনির বইটাতে সুদীর্ঘ ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই?

রোমান হরফে মূল লেখন মুদ্রিত আছে, অথর্ববেদের এমন একটিও সংস্করণ কি তোমাদের লাইব্রেরিতে নেই? গ্রন্থাগারিককে জিগেস করবে?

এ-প্রসঙ্গে আরো একটা বই উল্লেখ করছি — মৈত্রী উপনিষদ। সময় পেলে ছুটির আগে খোঁজ নিয়ে রেখো।

তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

বু. বসু

২৯/৯/৭২

কল্যাণীয়েষু,

কাল তোমাকে বলতে ভুলে গেলাম যে ছুটির মধ্যে একখানা মৈত্রী উপনিষদ, পেলে আমি বিশেষ উপকৃত হই। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি থেকে আনা যাবে কি? এটার কিন্তু মূল অবশ্য চাই (বাংলা, রোমান বা দেবনাগরী হরফে), সঙ্গে চলনসই অনুবাদ।

বু. বসু

২৭/১/৭৩

কল্যাণীয়েষু,

ইতিমধ্যে সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার থেকে একখানা বাংলা হরফে ছাপা কৌষীতকি সংগ্রহ করেছিলুম, তবু তোমার পাঠানো কাওয়েল-সংস্করণটি কাজে লাগলো। সেটি, তুমি এর পর যেদিন আসবে, ফেরৎ দিতে পারবো।

তোমাকে শ্বেত ও কৃষ্ণ যর্জুর্বেদের কথা বলেছিলুম। তোমার কলেজ-লাইব্রেরি থেকে আনানো যাবে কি? ইংরিজি অথবা বাংলা অনুবাদ সমেত মূল সবচেয়ে কাঙ্ক্ষণীয় — আর অবশ্য ভূমিকা টীকা ইত্যাদি।

যুধিষ্ঠিরই মহাভারতের নায়ক, এই কথাটা আমার প্রথম মনে হয়েছিলো ইণ্ডিয়ানাতে, যখন সেখানে এপিকসংক্রান্ত একটি কোর্স পড়াচ্ছিলাম।

স্বাতীর পরীক্ষা চলছে।

তোমারে মা-বাবাকে বোলো তাঁরা একদিন এলে খুব খুশি হবো।

বুদ্ধদেব বসু

২৩/৭/৭৩

কল্যাণীয়েষু,

প্রবাল, গাইগার-এর বইতে উল্লেখ দেখলাম, হিন্টারনিৎস-এর 'A History of Indian Literature'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে পালি সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। কিন্তু আমার কাছে যে-পাঁচ ভল্যুম হিন্টারনিৎস আছে, তাতে পালির নামগন্ধ নেই — মনে হচ্ছে পুরো

বইটা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। সেই পালি-সংক্রান্ত খণ্ডটা তোমার কলেজ-লাইব্রেরি থেকে

দুটো বই-ই পুজোর ছুটির ঠিক আগে চাই।

আমাকে এনে দাও তো খুশি হবো। আর — সেদিন যা বলেছিলাম — সংস্কৃত-পালি ইত্যাদি মিশিয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যের একটা ইতিহাস — আশা করি কেউ-না-কেউ সে-রকম বই লিখেছিলেন।

তোমার মা-বাবাকে আমাদের প্রীতি জানিয়ো।

বু. বসু

১০/১০/৭৩

কল্যাণীয়েষু,

বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে হ্বিন্টারনিৎসই একমাত্র প্রামাণিক এই খবর শুনে ঈষৎ নিরাশ হয়েছি — আমার ধারণা ছিলো এতদ্দেশীয় বিদ্বজ্জনেরও কিছু অবদান আছে। যা-ই হোক, আমি ইতিমধ্যে হ্বিন্টারনিৎস-এর দ্বিতীয় খণ্ডটি সংগ্রহ ক'রে ফেলেছি, সুতরাং এ নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না।

'যস্য রাগো ...'র উৎসের সন্ধান পেয়ে সুখী হয়েছি। আমার সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন ছিলো 'পাণং ন হানে' — ইতিমধ্যে তোমার হস্তলিপি-অঙ্কিত আর-একটি টুকরো কাগজ খুঁজে পেলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাতেও ঐ উক্তিটি নেই। ওটি কোনো-না-কোনোভাবে উদ্ধার করতে পারবো এই আশা ছাড়িনি।

আমি সেদিন নারীজাতি বিষয়ে ঐ মন্তব্য করেছিলুম ব'লে প্রতিভা বসু আমাকে তিরস্কার করেছেন। খবরটা তোমার মা-কে জানিয়ো।

তুমি সপরিবারে আমাদের বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

বুদ্ধদেব বসু

২০/১০/৭৩

কল্যাণীয়েষু,

ফেরারি 'পাণং ন হানে'-কে অবশেষে গ্রেপ্তার করতে পারলে এটা সত্যি সুসংবাদ। এবারে শ্লোকটিকে আমার নোটবইয়ে বন্দী করলাম — অগ্নি, বন্যা বা ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ না-ঘটলে আর পালাতে পারবে না আশা করি। সম্পৃক্ত অন্যান্য তথ্য তুমি কলেজ খুললে সুবিধেমতো জানিয়ো — আমার সবুর সইবে।

'মহাভারতের কথা'র এগারোর ফর্মা এখনো ছাপা হয়নি — ১৯৭৩-এর মধ্যে বই বেরোবে ব'লে এখন আর আশা করছি না।

তোমরা শিগগিরই আর-একদিন আসবে শুনে খুশি হয়েছি। আশা করি বিবিধ আনন্দে ছুটি কাটাচ্ছো।

বু.ব.

পুনশ্চ/তুমি যে নীলের ওপরে ফ্যাকাশে-নীল কালিতে লেখো, সেই অক্ষরবিন্যাস আমার

ক্ষীয়মাণ দৃষ্টিতে মরীচিকাবৎ প্রতিভাত হয় — আকার-বর্ধক কাচের সাহায্যে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করি। ভবিষ্যতে ঘনকৃত কালি ব্যবহার করতে পারবে কি?

বু. ব.

(ডাকছাপ ১৯/১১/৭৩)

কল্যাণীয়েষু,

ঋগ্বেদ ১ : ৯২ : ১০, ৩ : ৬১ : ১, ও ৩ : ৬১ : ৩ — এই তিনটি সূক্ত তুমি আমাকে লিখে পাঠালে সুখী হবো, আমার ভাণ্ডারে সংস্কৃত বই নেই। মূলের সঙ্গে এবটা যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ থাকা ভালো। রমেশ দত্তর অনুবাদে ৩ : ৬১ : ১-এ 'পুরাতনী' ৩ : ৬১ : ৩-এ 'নবতরা' শব্দের ব্যবহার আছে — এগুলি মূলে কী ছিলো বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

আশা করছি এবারে তোমরা একদিন এখানে সমাগত হবে।

বু. ব.

নিশ্চয়ই তোমার কলেজে তুমি সহজেই মূল ঋগ্বেদ পেয়ে যাবে? বাংলা বা রোমক হরফে কোনো সংস্করণ থাকলে কোনো এক সময়ে দেখতে চাই (এখনই নয়)।

২৭/১২/৭৩

কল্যাণীয়েষু,

প্রবাল, অথর্ববেদ ৪ : ১৬ বরুণ-সূক্তের একটি পঙক্তি বিষয়ে আমার কৌতূহল হচ্ছে — মনিয়র-উইলিয়মস যার অনুবাদ করেছেন 'He wields the universe, as gamesters handle dice' : আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ সমেত মূল পঙক্তিটি তুমি কি আমাকে লিখে পাঠাতে পারবে? তোমার প্রতিবেশী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় পুস্তক পাওয়া যাবে আশা করি।

বু. ব.

২১/১/৭৪

কল্যাণীয়েষু,

তোমার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অবধি চিন্তিত ছিলুম — সেদিন তোমার দীর্ঘ ও সুলিখিত চিঠিখানা পেয়ে বুঝলাম তুমি দেহে-মনে স্বস্থ ও প্রফুল্ল আছো। অথর্ববেদের উদ্ধৃতিটি কাজে লাগবে — কিন্তু ভবিষ্যতে আবার যদি কোনো বৈদিক পাঠের জন্য তোমাকে লিখি, তাহ'লে সঙ্গে একটা আক্ষরিক বঙ্গানুবাদও দিয়ো। অথর্ব : ৪ : ১৬ : ৫-এর একটা অনুবাদ কি দু-চারদিনের মধ্যে পাঠাতে পারবে?

আমার ইনটাক্টিভ (!) লজিক অপ্রমাণ করতে গিয়ে বেশি আঘাত পাওনি — এটা কিন্তু মস্ত বাঁচোয়া। আমি, তেইশ বছর বয়সে, এক শীতের সন্ধ্যায়, দৌড়ে বাস্ ধরতে গিয়ে চৌরঙ্গির ফুটপাতে হড়কে পড়েছিলুম — তখন দেখেছিলাম বাঁ হাতের বৈযুজ্যে ডান হাতও চালাতে পারছি না, লেখা বন্ধ — আমার আঘাত বেশ গুরুতর হয়েছিলো, বাঁ হাতে স্বাভাবিক বল ফিরে আসেনি। দু-একবার হাত-পা না-ভেঙে কেউ বড়ো হয় না (হয়তো এটাও ভুল!) —

তোমার ফাঁড়া অল্পেই কাটলো।

গত ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় স্বাতী একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছে — তোমার মা-কে খবরটা দিয়ো। তোমার মা-বাবার ব্যস্ততা প্রশমিত হ'লে তাঁদের নিয়ে একদিন আসবে আশা করছি।

বু. ব.

পত্রপ্রাপক প্রবাল দাশগুপ্ত চিঠিগুলির এই ভাষ্য যোগ করেছেন

(২১/৯/৭২)

'হুইটনির দুটো খণ্ড' : অথর্ববেদের ইংরিজি অনুবাদ।

(১০/১০/৭৩)

'নারীজাতি বিষয়ে ঐ মন্তব্য' : এর আগে শেষ যেদিন মা আর আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিন চ'লে আসার সময়ে আমায় বু.ব. বলেন : 'প্রবাল, তুমি আজ মেয়েদের ঘরেই সময় কাটালে, তাই জ্ঞানের কথা বলা হ'লো না।' তখন দরজার দিকে এগোতে-এগোতে বু.ব.-র সঙ্গে মা আর আমি এই নিয়ে হালকা এক বিতর্ক জুড়ে দিয়েছিলাম যে মহিলাদের সঙ্গে 'জ্ঞান'-এর কোনো বৈযুজ্য আছে কিনা; মৈত্রেয়ী গার্গীর কথাও উঠেছিলো।

(২০/১০/৭৩)

'ফেরারি "পাণং ন হানে"' : এই শ্লোকটির উৎস হারিয়ে গিয়েছিলো, হঠাৎ আমার পুরোনো এক কলেজের খাতায় আবিষ্কার ক'রে বু.ব.-কে লিখে পাঠিয়েছিলাম।

(২১/১/৭৪)

'লজিক অপ্রমাণ' : কিছুদিন আগে জ্যোতির্ময় দত্তের বাঁ হাত ভাঙা বিষয়ে বু. ব. বলেছিলেন, মানুষের ভিতরে এক সহজাত প্রবৃত্তি এমনভাবে কাজ করে যাতে দুর্ঘটনায় শরীরের বাঁ দিকের প্রত্যঙ্গই জখম হয়, আমরা ইন্সটিংক্‌টিভলি বাঁ দিকেই পড়ি যখন প'ড়ে না-গিয়ে উপায় থাকে না। এ-সিদ্ধান্তের সমর্থনে বু.ব. কয়েকটি বামাঙ্গিক দুর্ঘটনার গল্প বলেছিলেন। এসব শোনার কিছু দিনের মধ্যে আমার ডান কব্জি ও কনুইয়ে আঘাত পেয়ে লিখেছিলাম, শরীরের বাঁ দিকেই যে চোট লাগে, বু.ব.-র এই ইনডাক্টিভ জেনরালাইজেশন হাতে-কলমে খণ্ডন করার অবেচেতন বাসনা আমার নির্জ্ঞানে কাজ করছিলো ব'লেই হয়তো আমি গাড়ির ধাক্কায় টাল সামলাতে না-পেরে ঠিক ডান দিকেই পড়েছিলাম।

'রাত ভ'রে বৃষ্টি'

....

সাক্ষীকে লেখা দুটি চিঠি

২০/৯/৬৯

প্রীতিভাজনেষু,

"রাত ভ'রে বৃষ্টি"র একটি চিহ্নিত কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। রক্তবর্ণে অঙ্কিত অংশগুলি অভিযোগকারীর মতে "আপত্তিজনক"। আপনি উপন্যাসটি পড়ে উঠে আমাকে একবার টেলিফোন করলে সুখী হবো — সকলের সুবিধেমতো কোনো-একদিন আমার কৌঁসিলি

করুণাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

আশা করি আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল। নমস্কারান্তে,

বুদ্ধদেব বসু

শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্ত

৬/৬/৭০

প্রীতিভাজনেষু,

আদালতে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল আপনার সঙ্গে যে-ইতরজনোচিত ব্যবহার করেছে, তার বিবরণ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। কৌতুকের বিষয় এই যে আমরাই 'অশ্লীলতা'র দায়ে অভিযুক্ত, এই সব কদর্যভাষী গোপালচন্দ্র ঘোষেরা নয়।

করুণাশঙ্কর আমাকে জানালে যে আপনি যে-রকম শান্তভাবে এই বর্বরতা উপেক্ষা করেছেন, এবং যে-রকম সুশৃঙ্খলভাবে আপনার বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আপনার এতটা সময় ও মনোযোগ আপনি এই ব্যাপারে ব্যয় করছেন, এর জন্য ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাই। যদি এর ফলে আমাদের আইনপ্রণেতা ও বিচারকমণ্ডলীর মানসতায় তিলপরিমাণ পরিবর্তন ঘটে, তাহ'লে সবই সার্থক হবে।

আগামী সপ্তাহে কোনো সন্ধ্যায় আপনি ও অরুণবাবু কি বাড়ি থকবেন? আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎমতো দু-একটা কথা বলতে চাই।

বুদ্ধদেব বসু

শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্ত

বুদ্ধদেব বসুর গদ্য

সুবীর রায়চৌধুরী

যে-গৃহিণীপনার অভাব রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় লক্ষ করেছিলেন, সেই গৃহিণীপনাই লেখক বুদ্ধদেব বসুর প্রধান গুণ। নিপুণ সংসারী যেমন স্বল্প বিত্ত থেকে ধীরে ধীরে আশানুরূপ সঞ্চয় গ'ড়ে তোলেন, বুদ্ধদেব বসুও তেমনি 'বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলি' মেনে নিয়ে বাঙলা গদ্যকে স্বচ্ছন্দ গতি দিয়েছেন। অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন বাঙলা ভাষাকে স্বাধীন, স্বনির্ভর ক'রে না তুলতে পারলে এর কোনো মুক্তি নেই। তাই সংস্কৃতের মতো ইংরেজির প্রভুত্বও আমাদের ভাষার পক্ষে ক্ষতিকর — তবে প্রভাব এবং প্রভুত্বের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য। বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃতির মতো, জীবিত ভাষার ক্ষেত্রেও আদান-প্রদান প্রাণের লক্ষণ। সেজন্য মাতৃভাষার পরেই যে-ভাষাগুলির চর্চা আমরা করি, তার কিছু কিছু প্রভাব আমাদের শব্দভাণ্ডারে, বাগ্‌ধারায় অথবা অন্বয়ে এসে পড়া অসম্ভব নয়, কিন্তু তার দ্বারা আমাদের 'মুখের ভাষার নিজস্ব ও মৌলিক ছন্দ' যেন ব্যাহত না হয়। ভাষার স্বাভাবিকতা বিষয়ে এই বোধ সবাই জন্মসূত্রে পান না — ঐতিহ্যচেতনার মতো এই জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। কালানুক্রমিকভাবে বুদ্ধদেব বসুর রচনা পড়লে দেখা যাবে, এই স্বাচ্ছন্দ্য, এই সাবলীলতা তিনি বহু পরিশ্রমে আয়ত্ত করেছেন। তাঁর গোড়ার দিকের রচনায় শব্দ-ব্যবহারে আঞ্চলিক প্রভাব এবং ইংরেজি শব্দ ও অন্বয়ের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর গদ্যে আঞ্চলিকতাকে পরিহার করেছেন, ইংরেজি শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করেছেন, যদিও বহু ইংরেজি শব্দ বা বাগ্‌ধারাকে বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর গদ্যের যে স্পন্দনময়তায় আমরা অভিভূত, তা বহু পরীক্ষা-সমীক্ষার ফল। স্বাভাবিক ভাষা অন্বেষণের পথে তিনি গদ্যকে তুলে নিয়ে এলেন 'স্পন্দনমহিমায়।'[১] 'দময়ন্তী' (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের শেষে 'বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দে'র মিলন বিষয়ে যে-ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিলো, তার এক জায়গায় বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন :

> . গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি। দেখা গেছে এ দু'য়ের সম্বন্ধ তেল-জলের সম্বন্ধ নয়।

কবিতার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা কতদূর সার্থক হয়েছিলো তা শঙ্খ ঘোষ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন 'ছন্দের বারান্দা' প্রবন্ধে। গদ্যের ক্ষেত্রেও তাঁর লক্ষ্য ছিলো এই।

আসলে কেবল অধীত বিদ্যার ওপর নির্ভর করলে তিনি এতো বড়ো গদ্য লেখক হ'তে পারতেন না। সুধীন্দ্রনাথের ভাষা ধার ক'রে বলা যায় যে, তিনি তাঁর অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারেন। অথচ ঐতিহাসিকভাবে তিনি নতুন কিছুই করেন নি — প্রমথ চৌধুরীর মতো 'চলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষা' জাতীয় কোনো আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন নি (বরং তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' ও একটি গল্পগ্রন্থ 'রেখাচিত্র' সাধু ভাষায় লেখা), সুধীন্দ্রনাথের মতো 'ইংরেজি এবং সংস্কৃতের বর্ণসঙ্কর' ঘটিয়ে নতুন কোনো রীতির আবিষ্কার করেন নি, অথবা পরবর্তীকালের কমলকুমার মজুমদারের মতো শুদ্ধ বাঙলা গদ্যের অন্বেষণে জটিল অন্বয় এবং দুরূহতা-র অরণ্যে পাঠকদের বনবাস দেন নি। এবং তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পরে তিনি আমাদের প্রধান গদ্যলেখক। বিদ্রোহী না হ'য়েও যে অসাধারণ হওয়া যায় তার প্রমাণ বুদ্ধদেব বসু। আসলে বাঙলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কি এই বিশ্বাসই দৃঢ় করে না যে প্রতিভার স্পর্শে আপাত-দুর্বল ভাষাও শক্তিশালী, স্বনির্ভর হ'তে পারে? অথচ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা অন্বয়ের ক্ষেত্রে কোনো 'বৈপ্লবিক' পরিবর্তন ঘটান নি, শব্দ-গ্রহণে কোনো শুচিবাইকে প্রশ্রয় না দিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি প্রচলিত এবং পরিচিত শব্দব্যবহারের পক্ষপাতী। এদিক দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর আদর্শ রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরুতেই অকপটে এই ঋণ স্বীকার করেছিলেন :

> আমার কাছে — প্রত্যেক আধুনিক বাঙালী লেখকের কাছে — কিন্তু বিশেষ করে আমার কাছে আপনি দেবতার মত। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি। সে-ভাষা আপনার পছন্দ হয় না। আমারই দুর্বলতা, অক্ষমতা। উৎস-স্রোত স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ — আমি কি তাকে ঘোলাটে করে তুলি আমার বেসামাল ইংরিজি শিক্ষা দিয়ে? কিন্তু তর্ক করবো না; শুধু এই সুযোগ গ্রহণ করছি আপনাকে আমার অন্তরের গভীরতম ধন্যবাদ জানাবার — আপনি আমাকে ভাষা দিয়েছেন বলে।[২]

এই চিঠি লেখা হয়েছিলো আজ থেকে চার দশকেরও আগে। তারপর বুদ্ধদেব বসুর রচনারীতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু যেটার বদল ঘটেনি সেটা হ'লো রবীন্দ্রনাথের গদ্য বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত আদর্শ গদ্য বলতে তিনি কী বোঝেন তা বুদ্ধদেব বসু বিশদভাবে আলোচনা করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প' (১৯৬১) নামক রচনায় — তাঁর নিজের গদ্যপ্রসঙ্গেও প্রবন্ধটি মূল্যবান, কেননা রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কে যা তাঁর বক্তব্য, নিজের সৃষ্টিকর্মে সেটাই তাঁর সাধনা। বুদ্ধদেবও চান মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হোক, কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্ত হবে 'শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, মাত্রা ও ধ্বনিজ্ঞান।' ভাষাকে অস্বাভাবিক ক'রে অসাধারণ হওয়া যায় না — এই ছিলো তাঁর অভিমত। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের গদ্য বিষয়ে তাঁর ধারণা :

> রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নূতনত্বের যা উৎস ও আশ্রয়, তা বাঙালির মুখের ভাষার নিজস্ব ও মৌলিক ছন্দ; যে-সুরে আমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, যে-ভাবে আমাদের কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ঘ'টে থাকে — আমাদের আবেগ ও নৈরাশ্য, সংশয়, উত্তেজনা ও দীর্ঘশ্বাস, এই সবকিছুর এক আদর্শ ধ্বনিরূপের নামান্তর হ'লো রবীন্দ্রনাথের গদ্য।[৩]

অন্যদিকে সংস্কৃত কবিতা তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো কৃত্রিম, কেননা তা মুখের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁর অভিমত হলো :

> যে-ভাষায় শিশুর মুখে বোল ফোটে না, স্বামী-স্ত্রীতে প্রেমালাপ বা কলহ চলে না, যাতে ঘরকন্না বেচাকেনা ইত্যাদি নিত্যকার কাজ সম্পন্ন হবার উপায় নেই, সে-ভাষায় কেমন ক'রে কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে তা ভেবে আজকের দিনে আমরা অবাক হ'তে পারি। আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে তা সম্ভব হ'তে পারে শুধু একটি শর্তে : কবিতাকে 'জীবন' বা 'স্বাভাবিক' থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, তাতে অপণ্ডিতের অধিকার থাকবে না, প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্তি বর্জন করা হবে, হার্দ্য আবেদনের বদলে প্রাধান্য পাবে কৌশল, নৈপুণ্য, বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া।[৪]

বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখক-জীবনের সূচনায় আধুনিক হবার উৎসাহে ভাষার এই সহজ বৈচিত্র্য উপেক্ষা করেছিলেন। কেননা তখনো পর্যন্ত অধীত বিদ্যার সঙ্গে ঐতিহ্যচেতনা যুক্ত হয়নি। এই পর্বে বুদ্ধদেব বসুর ওপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর কাছে সাধু-চলিত ভাষার বিতর্ক ছিলো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার। গদ্যের মধ্যে পদ্যের স্পন্দনময়তা তিনি সঞ্চারিত করতে চাননি। তাঁর ঢঙটাই হ'লো বৈঠকি। তিনি মুখের ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ আবিষ্কারে ততোটা আগ্রহী ছিলেন না, যতোটা ছিলেন শিক্ষিত লোকের কথাবার্তার সঙ্গে লেখার ভাষার ব্যবধান কমিয়ে আনতে। এই কারণে সুধীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিলো 'প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিতান্ত চলতি বাংলা বহু ভাষাবিদ পাঠকের অপেক্ষা' রাখে। আর স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী স্বীকার করেছেন :

> পদ্য লেখক হিসাবে আমি সরস্বতীর মাথায় বনেট পরিয়েছি; আর গদ্য লেখক হিসাবে আমার লেখার মাথায় হ্যাট পরিয়েছি।[৫]

এই 'হ্যাট পরা বাঙলা গদ্যে' বুদ্ধদেব বসুও গোড়াতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম যুগের রচনায় শুধু ইংরেজি ধরনের অন্বয় নয়, বাক্যের মধ্যে প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়, যে-প্রবণতা তিনি পরবর্তীকালে বর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কিশোর বয়সের রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

> দেহের মতো মনেরও আমাদের কতগুলো অভ্যেস আছে, সেই অভ্যেসের সঙ্গে যা খাপ খায় না, অর্থাৎ আমাদের sense of proportion-এ যা incongruous ঠেকে, তাকেই আমরা সচরাচর ridiculous আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু একটা জিনিশ ridiculous না হ'য়েও incongruous হ'তে পারে, নইলে satire ভিন্ন অন্য জাতের humorous রচনা সম্ভব হ'তো না।[৬]

বাক্যের মধ্যে ইংরেজি শব্দের বহুল প্রয়োগ তাঁর প্রথম পর্বের গল্প-উপন্যাসেও লক্ষ্য করি। চলিত ক্রিয়াপদ বিষয়েও তিনি কিছুটা অস্থির। তাঁর বহু বিতর্কিত 'রজনী হ'ল উতলা'। (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) গল্পটির প্রথম লাইন স্মরণ করা যাক :

> ঘোলা জল চিরে স্টিমার সামনের দিকে চলছে; তার দু-পাশের জল উঠচে, পড়চে, দুলচে

— তারপর ফেনা হয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্চে, জলকন্যার নগ্নদেহের মতো শুভ্র, দ্রাক্ষারসের মতো স্বচ্ছ।

প্রথমত, একই সঙ্গে 'চলছে' এবং 'উঠচে'-র ব্যবহার পরে তিনি করেন নি। দ্বিতীয়ত উঠছে, পড়ছে, দুলছে-র শেষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি বুদ্ধদেব বসু পরবর্তীকালে বর্জন করতেন না। এছাড়া তাঁর এই সময়ের রচনায় বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দও চোখে পড়ে। 'সাড়া' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে (১৯৩০) ছিলো : 'যত্ন করিয়া চোখের সমস্ত কেতুর মুছিয়া ফেলিল' (পৃ: ৯)। পিচুটি অর্থে 'কেতুর' বা 'কেতর' এখনো আদর্শ বাঙলায় স্বীকৃতি পায় নি। পরের সংস্করণে (১৯৪৭) লেখক শব্দটি বর্জন করেন। তেমনি 'অভিনয়, অভিনয় নয়' (১৯৩০) গল্পগ্রন্থে দেখতে পাই জন্য-র পরিবর্তে তরে-র কাব্যিক প্রয়োগ 'নারী-সুলভ লজ্জায় ক্ষণিকের তরেও আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি' (পৃ: ২১৭) অথবা ' জোছ্‌নার মতো ম্লান বরণা' (পৃ. ২২০)

আসলে চলিত ভাষার স্বভাবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনো সম্পূর্ণ হয়নি —চলিত ভাষায় 'তাঁহার'-এর প্রয়োগ অথবা সাধু ভাষায় 'হইতে' অর্থে 'থেকে'-র ব্যবহার তিনি করেছেন। এই অস্থিরতার জন্যই দেখতে পাই 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-প্রবন্ধাদি চলিত ভাষায় লেখা হ'লেও তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' এবং একটি গল্পগ্রন্থ 'রেখাচিত্র' (১৯৩১) সাধুভাষায় লেখা। 'সাড়া' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি অবশ্য লিখিত হয়েছিলো চলিত ভাষায়। উক্ত উপন্যাসের শেষতম সংস্করণে (১৯৫৯) তিনি কৈফিয়ৎ হিশেবে বলেছেন :

> 'সাড়া' এবং একই সময়ে রচিত 'রেখাচিত্রে'-র গল্পগুলি, কেন 'সাধুভাষায়' লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম বলতে পারি না। তখন হয়তো মনে হয়েছিলো যে উভয় ভঙ্গিতেই রচনা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই যে আমার মতের বদল হলো তা কোনো-কোনো পাঠকের অজানা নাও থাকতে পারে।

আসলে ছন্দোমুক্তির অন্বেষণে বুদ্ধদেব বসু বুঝেছিলেন যে চলিত ভাষাই স্বাভাবিক এবং এর কোনো বিকল্প নেই। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের 'ভাষার সহজ বৈচিত্র্য' কবিদেরই দান। চলিত ভাষার আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে সার্থক করেছেন আধুনিক কবিরাই — তারই অভিঘাত দেরিতে এসে পৌঁছেছে আমাদের গল্প-উপন্যাসে। প্রমথ চৌধুরীর ঐতিহাসিক আন্দোলনের পর রবীন্দ্রনাথ আর কোনোদিন চলিত ভাষায় ফিরে যান নি — এর জন্য আমরা প্রায় পুরো কৃতিত্বটা চাপিয়ে দিই প্রমথ চৌধুরীর ওপর। কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ করি না সেটা হ'লো রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভিতরের তাগিদেই ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ করছিলেন :

> আমরা পুরাতন সাহিত্যে পেয়েছি পদ্য, সেইটেই বনেদি। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক হবে না, সাধু ভাষার আদর্শ ছিল তার মধ্যে।
>
> ... চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়।[৭]

যে-প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ ছড়ার ছন্দকে জাতে তুললেন, সেই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তিনি চলিত ভাষাকে বাহন করলেন।* এই চেষ্টাই প্রমথ চৌধুরীরও আগে বিচ্ছিন্নভাবে

করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ গাল্পিক ঔপন্যাসিকের বাহন ছিলো সাধু ভাষা। ব্যতিক্রম যাঁরা, তাঁরা প্রায় সবাই কবি অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস লিখলেও কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্র অসামান্য গদ্য লেখক হওয়া সত্ত্বেও (তাঁর পত্রাবলি থেকে জানা যায় যে তিনি প্রমথ চৌধুরীর লেখার ভক্ত ছিলেন)

---

* রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্পষ্ট ক'রে বলেন চলিত ভাষায় সম্প্রসারণশীলতা এবং গতিময়তার কথা। এই কারণে তাঁর মনে হয়েছিলো চলিত ভাষা এতো সম্ভাবনাময় :

'এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করে না চলতি ভাষা। স্বদেশী বিদেশী হাল্কা ভারি সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট মেলা শক্ত। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। 'বিদায়' কথাটা সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবি ভাষা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোশাক পরে বসেছে। 'হয়রান করে দিয়েছে' বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মনে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। ...

ভাষার অবিমিশ্র কৌলীন্য নিয়ে খুঁতখুঁত করেন এমন গোঁড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুই মুখো করে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটাও সম্ভব নয় (দ্র. 'বাংলা ভাষা-পরিচয়')।

কিন্তু এই সহজ সত্যটি সেদিন অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়নি। সেজন্য তাঁদের মনে হয়েছিলো মুখের ভাষা এবং লেখার ভাষার মধ্যে ব্যবধান 'স্বাভাবিক' — চলিত ভাষা কোনোদিন সাধু ভাষার স্থান নিলে তা সর্বনাশী হবে। এরকম একজন ছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, যিনি সম্ভবত পূর্ণতার খোঁজে অবশেষে মাতৃভাষাকেও বিসর্জন দেন। পরিমল গোস্বামীকে লেখা তাঁর চিঠির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি :

> **Have you ever been aware that rhythm of this dection (চলিত ভাষা) and the rhythm of the old written Bengali are utterly different? The former is based on stress, and the second on quantity. Spoken Bengali of West Bengal has even greater stress than the spoken Bengali of East Bengal. The two - the spoken and the written languages may be good independently but their combination is never good. Here comes the fundamental problem. How can you have coherent prose rhythm in Bengali when you are continuing in the same sentence তৎভব and তৎসম words, first based on stress, and the second on quantity ... And *jukta-vama* will never go with real *tadbhaba* diction... The old prose had a greater range of rhythm and therefore of mood. This wretched hybrid is suited only to matter of fact communication or buffoonery... (দ্র. "প্রবাসীর আড্ডা", পরিমল গোস্বামী, 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা' ১৩৮১ পৃ ৬৩) টীকা নিষ্প্রয়োজন।**

একটি কি দুটি গ্রন্থ ছাড়া চলিত ভাষাকে কোথাও অবলম্বন করেন নি, বাঙলা উপন্যাসে আধুনিকতার দিক্‌চিহ্ন 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) সাধু ভাষায় লেখা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত সাধু এবং চলিত ভাষায় পাশাপাশি রচনা ক'রে গেছেন), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের প্রধান সৃষ্টিকর্মগুলির বাহন সাধু ভাষাই, এমন কি চলিত ভাষার অবিস্মরণীয় শিল্পী পরশুরামও গল্পে সাধু ভাষা দিয়েই শুরু করেছিলেন। কিন্তু হাওয়া বদল ঘটালেন একই সঙ্গে কবি এবং গদ্যলেখক যাঁরা। অন্নদাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে নানা রীতির লেখক, কিন্তু চলিত ভাষার ভবিষ্যৎ বিষয়ে তাঁরা দ্বিধাহীন। আসলে গদ্য-পদ্যর বিরোধ ভঞ্জনের প্রচেষ্টায় তাঁরা মৌখিক বাক্‌স্পন্দকে খুঁজে পেলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই দিক্-নির্দেশক, কিন্তু তাকে ব্যাপক রূপ দিলেন কবিরা এবং এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন অগ্রণী। 'ছন্দস্পন্দিত গদ্য' যা 'আধুনিক বাঙলা গদ্যের প্রবর্তক ও বিবর্তক', তা আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একথা বুদ্ধদেব বসু বারবার স্বীকার করেছেন। তাঁর নিজেরও লক্ষ্য ছিলো এই স্পন্দনময় গদ্য। প্রথম যুগে তিনি চেয়েছিলেন শুধু আধুনিক গদ্য লিখতে (তখনো তাঁর আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ যুক্ত হয়নি), তারপর 'ছন্দস্পন্দিত গদ্য' এবং সবশেষে লক্ষ হ'লো স্পন্দনময়তার সঙ্গে সংহতি। মধ্য পর্বে তিনি ছিলেন শব্দের সম্মোহে আবিষ্ট — শব্দনির্বাচনে পাই অসামান্য ধ্বনিজ্ঞান, বর্ণনায় পারিপাট্য। কিন্তু তখনও সংহতি নয়, সৌন্দর্যই ছিলো তাঁর অভিপ্রেত। বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের গদ্যকে বলেছেন তাঁর 'ছুটির ঘন্টা', সেজন্য তাঁর কবিস্বভাব এবং গদ্যস্বরূপে মিল নেই। অন্যদিকে বুদ্ধদেবের গদ্য তাঁর কবিব্যক্তিত্বেরই সম্প্রসারণ — তাই প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস-নাটক কোনো শাখাতেই এই কবিসত্তা গোপন থাকে নি। তিনি নিজে যাকে বলতেন 'কবিতার গুণ', তা তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন গদ্যের মধ্যে।

বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের ক্রমবিবর্তন আলোচনা করবার আগে আমরা দেখবো তাঁর রচনারীতি সমসাময়িককালে কী রকম হয়েছিলো। 'যেদিন ফুটলো কমল' (১৯৩২) প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> পড়তে পড়তে খটকা লেগেছে পদে পদে তোমার ভাষায়। অনেক স্থানেই বাক্যের প্রণালী অত্যন্ত ইংরেজি। মনে মনে ভাবছিলেম এখনকার যুবক-যুবতীরা সত্যই কি এমনতরো তর্জমা-করা ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কয়ে থাকে? অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় তো আমি এতটা লক্ষ্য করিনি।[৮]

এর উত্তর বুদ্ধদেব যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গটি তিনি পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের গদ্যবিষয়ক প্রবন্ধে। আসলে তাঁর ধারণা আধুনিক লেখকদের বহু আগে থেকেই এই প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছে :

> [রবীন্দ্রনাথ] দ্রুতি, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের সাধনায় স্বীকার ক'রে নেন, ইংরেজি ধরনের অন্বয় — যা তাঁর আগে বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগরও করেছেন, কিন্তু পার্শ্বোক্তি, সর্বনাম ও ব্যুৎক্রমের ব্যবহারজনিত যার পূর্ণরূপটি রবীন্দ্রনাথের আগে প্রতিভাত হয় নি, যদিও সমালোচকেরা তাঁকে ভুলে গিয়ে কখনো-কখনো এমনও বলেছেন যে কতিপয় অযোগ্য আধুনিক লেখকই বাংলা গদ্যে ইংরেজি রীতির প্রবর্তক। কিন্তু ইংরেজি তো আর নেই, সেটাই বিশুদ্ধ বাংলা

হ'য়ে গেছে, কিংবা ধরনটাকে হয়তো ইংরেজি বলাই ভুল; ... অন্তত পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের পরে এ-কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য যে এক-দাঁড়ি-দুই দাঁড়ি নির্ভর কৃত্তিবাসী পয়ারের সঙ্গে বাংলা গদ্যের কোনো সম্বন্ধ আছে, কিংবা 'খাঁটি বাংলা অন্বয়' নামক অন্য কোনো পদার্থ আর সম্ভবপর।

বিদ্যাসাগরের রচনায় 'ইংরেজি ধরনের অন্বয়' আদৌ আছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ হ'তে পারে, কিন্তু এটা ঠিকই আমাদের কথাবার্তায় ইংরেজি বাগ্‌ধারার অনুপ্রবেশ বহুকাল ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ কত আগেই লিখেছিলেন, 'দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না' ('শিক্ষা') অথবা 'লাগামপরা অবস্থায় মর্' ('ভারতবর্ষ')। বুদ্ধদেবও ভাষার স্বাভাবিকতার নামে শুদ্ধতাবাদী ছিলেন না। তাঁর শেষতম গ্রন্থ 'মহাভারতের কথা'তেও এ-জাতীয় ইংরেজি বাগ্‌ধারার বাঙলা রূপান্তর দুর্লক্ষ্য নয় :

ব্যাসদেবের সব তাস প্রথম থেকেই টেবিলের উপর উত্তান (পৃ২০৫)। সেটাও অর্জুনের টুপিতে একটা বাড়তি পালক গুঁজে দেবারই কৌশল মাত্র (পৃ ২৫৭)।
আমাদের মনে হয় যেন গ্যাস-ভর্তি বেলুনের ঝাঁক শূন্যে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে (পৃ ২০৯)।

এবং এর সঙ্গে ব্যবহার করেছেন ওষ্ঠসেবা (পৃ ১৩০), বিহঙ্গদৃষ্টি (পৃ ২৪), প্রেরণাপ্রাপ্ত (পৃ ৫৬) জাতীয় শব্দ।

তবে কি বুদ্ধদেব বসু শেষ পর্যন্ত ইংরেজি বাচনিক পদ্ধতি ত্যাগ করতে পারেননি? আসলে এই ধারা তিনি পরে আত্মস্থ করেছিলেন রবীন্দ্রঐতিহ্য থেকে। কোনো এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : অনেক কিছু 'শেষের কবিতা' থেকে জন্মেছে। এর মধ্যে একটা হল ইংরেজীর অন্বয়ে বাক্যগঠন।'[২] সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য' (১৩৪১) গ্রন্থে বহু উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গদ্যে ইংরেজিয়ানার। সেখানে দেখতে পাই ' বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর যুগ থেকেই (দ্র. 'সে কি আরামের ভুল') রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই প্রবণতা। তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ কেন বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে ইংরেজিয়ানার অভিযোগ করেছিলেন? তিনি হয়তো ভেবেছিলেন তাঁর 'পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত।'

বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা নিশ্চয়ই সর্বনাশী হ'তো, যদি না তিনি সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভাষার স্বাভাবিক ছন্দটি ধরতে পারতেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য হ'লো 'সপ্রাণ বাঙলা'। এই সপ্রাণতা তাঁকে অস্বাভাবিক হ'তে দেয়নি। কিন্তু তাঁর প্রথম দিকের গদ্যে এই ইংরেজিয়ানার অনুপ্রবেশ অনেক আড়ষ্ট। সুকুমার সেন লক্ষ্য করেছেন :

বুদ্ধদেববাবুর গদ্যরীতি সযত্নরচিত, সুমিত, পরিপাটি। তবে গোড়ার দিকে ইঁহার গদ্য অনাবশ্যকভাবে ইংরেজীর অনুবাদে ও অনুসরণে কন্টকিত ছিল। (সাধুভাষায় লেখা বলিয়াই কি 'সাড়া' এ দোষ হইতে অনেকটা নির্মুক্ত?) যেমন

অবিশ্যি কবিতা সে ছোঁয় না — বাদে কোলরিজ ('অকর্মণ্য', পৃ ৩২)। ‡

‡ এ-জাতীয় প্রয়োগ সমসাময়িক অনেক লেখকের মধ্যে লক্ষ করা যায়। যেমন 'অথচ ও হয়তো জন্মেও বই পড়ে না — বাদে আইনের বইগুলি' ('একদা', গোলাপ হালদার, ৫ম সং, পৃ ৯৪)

নিচু ইজিচেয়ারের গভীরতা থেকে বাবা মুখ তুলে তাকালেন; তাঁর ভ্রূ জিজ্ঞাসায় কুঞ্চিত হ'লো ('পরস্পর', পৃ ২৪)।

সে দূরে স'রে রইলো — ঠাণ্ডা, সাদা বিচ্ছিন্নতায় ('সূর্যমুখী', পৃ ২২)।[১৫]

তাঁর প্রথম যুগের রচনা থেকে এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। তিনি তখন 'সাগরের অভিমান হইল' না লিখে লিখতেন, 'সাগরের অভিমান ব্যথিত হইল' ('সাড়া')। তাঁর এই পর্বের বানানেও কোনো সঙ্গতি নেই — কারণে-অকারণে হস্ চিহ্ন এবং হাইফেন-এর ব্যবহার ঊর্ধ্ব কমার নির্বিচার প্রয়োগ, রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জনের সঙ্গতির অভাব, ট্রেন, চেন, কেক-এর স্থলে ট্রেইন, চেইন, কেইক লেখা, তদ্ভব শব্দের বানানে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের প্রতি ঔদাসীন্য চোখে পড়ে। কিন্তু চলিত ভাষার বাক্স্পন্দটি যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'লো, তিনি ক্রমশ ঝুঁকলেন ধ্বনিসংবাদী বানানের দিকে, বাঙলা বানানের নৈরাজ্যের মধ্যে নিয়ে এলেন যথাসম্ভব নিয়ম-শৃঙ্খলা। তাঁর গদ্যের বিবর্তনের সঙ্গে এই বানান রীতির রূপান্তরও লক্ষণীয়। Z-এর বদলে জ, Zh-এর বদলে জ — এই দুটির বর্ণের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য আমরা বুদ্ধদেব বসুর কাছে ঋণী। আসলে তাঁর এই বানান পদ্ধতি কোনো বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা নয়। বানান ব্যাপারটি তো শুধু চোখের নয়, কানেরও — ভাষার স্পন্দনময়তা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লক্ষ্য হ'লো বানানের দৃশ্য এবং শ্রুতির রূপের ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। তাঁর অসামান্য ধ্বনিজ্ঞান থেকে তিনি একদিকে যেমন ঝুঁকেছিলেন ধ্বনি-সংবাদী বানানের দিকে, তেমনি অন্যদিকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভাষার জাদু শব্দের অভিনবত্বে নয়, শব্দের ব্যবহারে। বাঙলা শব্দভাণ্ডারের দুর্বলতা নিয়ে তিনি অনেক আক্ষেপ ক'রে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিলো প্রচলিত শব্দের ব্যবহারে কিংবা পুরনো শব্দের পুনরুজ্জীবনে। * তিনি সংস্কৃতভাষার বিপুল শব্দাবলি ও অসংখ্য প্রতিশব্দ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রধানত কাব্যকে উপলক্ষ ক'রে বলা হ'লেও গদ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংস্কৃত ভাষার বিপুল শব্দ-সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, এখানে 'কোনো শব্দই অসংগত নয়, কোনো শব্দই অনিবার্য বা অনন্য নয়।' ফলে তাঁর ধারণা, 'সংস্কৃতে অনেক সময় শব্দ সংখ্যা বেড়েছে অর্থের নতুনতর দ্যোতনার জন্য নয়, নেহাৎই বৈচিত্র্যের খাতিরে। এবং যে-শব্দ বৈচিত্র্য দেয়, তা কবিতায় কিছু দিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষাকে তার বিপুল শক্তির জন্য, এই এক খেদজনক মূল্য দিতে হয়েছে।'[১০] গদ্য-পদ্য উভয় শাখাতেই বুদ্ধদেব এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর গদ্য বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'মুক্তছন্দ গদ্যের প্রকৃষ্ট নমুনা'।[১১] এই মুক্তছন্দের প্রবহমানতা কিন্তু অসংখ্য প্রতিশব্দ

---

* পূর্বোদ্ধৃত সাক্ষাৎকারে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন : 'কিন্তু পুনরুজ্জীবিত করা যায় বহু শব্দকে। দেয়া যায় নতুন বিশেষার্থ। সে সব শব্দ সচরাচর আমরা ব্যবহার করি না, সেই সব অচল পয়সাকে করা যায় চকচকে মুদ্রার মতো গতিশীল। যেমন "আমি যাকে ভালোবাসি", এবং "যে আমায় ভালোবাসে" এই দুটি ভাব বোঝানোর মতো শব্দ ইংরেজি, ফরাশি এবং জার্মান ভাষায় আছে। কিন্তু বাংলায় নেই। প্রাকৃতে আছে, সংস্কৃতে আছে। আমি এর ব্যবহার কবিতায় করেছি। যেমন "কান্তা" আর "বনিতা"। যে তোমায় ভালোবাসে, এবং তুমি যাকে ভালোবাসো।'

বা নতুন, অপরিচিত শব্দের ওপর নির্ভর নয়। আমি আমার মতের সপক্ষে তাঁর বিভিন্ন বয়সের রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

> চৈত্রের দুপুরে যে-কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হলাম, কোনো এক শ্রাবণের বৃষ্টিঝরা রাত্রে সে কবিতা বোবা হ'য়ে রইলো। অবসরের শান্ত অপরাহ্নে যে-লেখা মনকে ছুঁতে পারলো না, কোনো এক উদ্ব্যস্ত বে'লা-দশটায় ট্র্যাম ধরবার জন্য ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ তারই দুটি লাইন মনে প'ড়ে দাঁড়াতে হ'লো থমকে ("কালের পুতুল"-১৯৫৪)।

অথবা

> আরাম নেই স্নানে, তৃপ্তি নেই পানে, পরিধান দুঃসহ, নিজের দেহটা সুদ্ধ অশ্লীল হ'য়ে উঠেছে। পিঠের সঙ্গে মিনিটে-মিনিটে লেপটে যাচ্ছে গেঞ্জিটা; নামছে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম, কাপড়ের তলায় গা বেয়ে সারিসারি কৃমির মতো। রাস্তায় আগুন, বারান্দায় হলকা, চুল্লির মতো বাথরুম : আর ঘরের মধ্যে গ্রীষ্মাতুর মহিলার বিলাপধ্বনি। দিনের পর দিন, দিনে ও রাত্রে, একই রকম ("এক গ্রীষ্মে দুই কবি"-১৯৫৮)।

পূর্বোক্ত দুটি উদ্ধৃতিই প্রবন্ধ থেকে। এর সঙ্গে 'তিথিডোর' (১৯৪৯) উপন্যাসের 'চেতনপ্রবাহী গদ্যে'র নমুনা দেওয়া যেতে পারে :

> ... চুপ; সারা বাড়ি চুপ; শ্বেতা একবার আকাশের দিকে মুখ তুললো, তারা, চুপ; স্বাতী নড়লো না, সত্যেন নড়লো না, চুপ, কুলোর প্রদীপের ছায়া-ছায়া আলো, লুকোনো, লাজুক, বলতে-না-পারা কথা; ভুলতে-না-পারা; ... চোখ নেই, চোখ খোলা, খোলা জানলা কালো, বাইরে কালো, কালো আকাশে তারা; দূরে, পারে, পরপারে; হ'য়ে যাওয়া, না-হওয়া, হ'তে থাকা, চিরকালের, আকাশ-ভরা স্তব্ধ তারা তাকিয়ে থাকলো।

গল্প-প্রবন্ধ-উপন্যাস সব শাখাতেই তাঁর গদ্যের এই স্পন্দনময়তা অনুভব করা যায়। 'কঙ্কাবতী'-র কবি গদ্যরচনাতেও শব্দের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ। 'সাড়া'র নায়ক সাগর অনুভব করেছিলো :

> তিনটি কথা — সাধারণ, অনাড়ম্বর তিনটি কথা পাশাপাশি বসাইলে তাহারা আর কথা থাকে না — আগুনের মতো, আগুনের ফুলের মতো জ্বলিয়া ওঠে। — পৃথিবীতে আর মির‍্যাকল ঘটে না, এ-কথা মিথ্যা। 'Out of three sounds I frame, not a fourth sound —'
>
> সাগর বলিয়া ওঠে : বুঝলে ফাউস্ট — 'not a fourth sound, but a star —'

এই বিস্ময় তিনি গদ্যের যে কোনো শাখাতে সঞ্চারিত করতে পারেন। কবি এবং কাব্য শব্দ দুটির প্রয়োগও তাঁর রচনায় ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত। এই কারণে ডস্টয়েভস্কি-টোমাস মান্‌কে তিনি বলেন কবি, 'চার অধ্যায়' তাঁর কাছে মনে হয় কাব্য। অথচ সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের (গদ্য) রচনায় লক্ষ করেছিলেন 'গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জনে' ঔদাস্য। সুধীন্দ্রনাথের 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৩৬৪) গ্রন্থের "উক্তি ও উপলব্ধি" থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

> তাঁর একাধিক ত্রুটি — যথা উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন, গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জনে ঔদাস্য,

অথবা ইংরাজী বাচনিক পদ্ধতির হুবহু অনুবাদ — আমাকে যেমন পীড়া দেয়, তেমনই বিস্ময় জাগায়, তাঁর অবাধ, অনায়াস ও সমান্তরাল ভাবনা-বেদনা।

বুদ্ধদেব বসুর গদ্য প্রসঙ্গে 'গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জনে ঔদাস্য'র অভিযোগ মনে হয় কিছুটা অর্ধমনস্ক। পরে অবশ্য এ-বিষয়ে বুদ্ধদেবকে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে আসলে তাঁর আপত্তি বুদ্ধদেবের 'গদ্যের কবিত্ব' নিয়ে নয়, তাঁর কাব্যে গদ্যের প্রভাবের বিষয়ে। চিঠিটা হ'লো এই :

আপনার তথাকথিত দোষত্রয় সম্বন্ধে যা বলেছি, তার ভিত্তি আপনার গল্পসংকলনে মোটেই নেই। আসলে ও-কথা না তুললেও চলতো। কিন্তু ত্রুটি না দেখালে আপনার গুণবর্ণনা পাছে স্তুতিবাদের মতো শোনায়, এই ভয়ে পুরাতন স্মৃতি মন্থন ক'রে ওই বিষ উগ্‌রেছি। আপনার গদ্যের 'কবিত্বে' আমি চিরদিনই মুগ্ধ : আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোট নালিশ এই যে তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প।...
সে যাই হোক, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্পর্কে আপনি যা বলছেন, তা আমি সম্পূর্ণ মানি। যে-লেখা সাধারণযোগ্য নয়, তার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু লিখতে গেলেই আমি একটা প্রচণ্ড বাধা অনুভব করি, এবং সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে আমার সমস্ত শক্তি খরচ হ'য়ে যায়, দুরূহতা অতিক্রম করা আর সাধ্যে কুলোয় না। সেই জন্যেই আমি এত কম লিখি, এবং লেখা শেষ ক'রে সাধারণ লেখক যে-আরাম পান, তা আমার কপালে জোটে না। তবু চেষ্টায় আমি বিমুখ নই; এবং ইতিমধ্যে প্রবর্ত্তনা যদি একেবারে না ফুরোয়, তাহ'লে কোনো এক দিন হয়তো সরল রচনা আমার কলম দিয়েও বেরোবে। ততদিন পর্য্যন্ত আপনি আমার ঈর্ষ্যাভাজন।[১১]

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের আলোচনাতেও এই স্বীকারোক্তি মূল্যবান। যাই হোক, 'কালিদাসের মেঘদূত' (১৯৫৭) প্রকাশের পর থেকে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেলো — স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে তিনি বেশি ঝুঁকলেন সংহতির দিকে। গদ্যের স্পন্দনময়তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়, কিন্তু লক্ষ রাখতে হবে গদ্য যেন কবিতার দ্বারা অধিকৃত না হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু অতুলচন্দ্র গুপ্তর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্য 'মহাকবির গদ্য, সুতরাং কোথাও পদ্যগন্ধী নয়।' কবির গদ্য নয়, মহাকবির মতো গদ্য হ'লো এই পর্বে তাঁর লক্ষ্য। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের পর যাঁর গদ্যের তিনি সবচেয়ে অনুরাগী ছিলেন, তিনি হলেন রাজশেখর বসু। রাজশেখর বসুর 'ক্লাসিক মানসে'র আকর্ষণে তিনি উচ্ছ্বাসের চেয়ে প্রাধান্য দিলেন শৃঙ্খলাকে, আবেগের চেয়ে বুদ্ধিকে। এটা নেহাৎ আকস্মিক ঘটনা নয় যে, তাঁর গোড়ার যুগের নায়কেরা কবি বা লেখক, কিন্তু পরের দিকে আভিধানিক বা ভাষাবিজ্ঞানী (দ্র. 'একটি জীবন', 'প্রেমপত্র')। বস্তুত রাজশেখর বসুর গদ্য বিষয়ে তিনি যা বলেছেন, তা অনেকটাই প্রয়োগ করা যায় তাঁর শেষ জীবনের রচনা, বিশেষভাবে 'মহাভারতের কথা' প্রসঙ্গে :

আর কেমন ক'রে বাংলা, তার স্বাভাবিক বাগ্‌ধারার বৈশিষ্ট্য লঙ্ঘন না-ক'রে, সংস্কৃতের চারুতাকে আয়ত্তে আনতে পারে — হ'তে পারে একই সঙ্গে নির্ভার ও সংবৃত, পরিশীলিত

ও গতিশীল, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সহযোগে শিষ্টালাপের মতো প্রাঞ্জল, যথোচিত ও নির্বহুল, তার কোনো প্রকৃষ্ট উদাহরণ যদি খুঁজতে হয় তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তাঁর 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র গদ্যকে সর্বাগ্রে স্থাপন করতে চাইবো।[২৫]

তবে একটা বিষয়ে রাজশেখর বসুর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। প্রয়োজনমতো ইংরেজি বাগ্‌ধারার রূপান্তর রাজশেখর বসু সাধ্যমতো এড়াতে চাইতেন। কিন্তু এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মত আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। তাহ'লেও শেষ জীবনে তিনি চেয়েছিলেন স্বাভাবিক বাগ্‌ধারার সঙ্গে সংস্কৃতের চারুতার সমন্বয় ঘটাতে। 'মহাভারতের কথা' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন তিনি, অবিচল ও তূষ্ণীভূত এক দর্শকমাত্র, কিন্তু সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত ও পূর্বজ্ঞাত সংহারক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলেন — 'প্রবৃত্ত' কথাটা বড্ড যেন বেশি বলা হ'লো, কেননা তিনি আর রথারূঢ় নন এখন, তাঁর হাতে নেই গদা বা কশা বা সুদর্শনচক্র, তাঁর চিত্ত বীতরাগ ও বীতমন্যু — পুনরাবৃত্ত তরঙ্গের মতো প্রাণোচ্ছ্বাস তিনি পেরিয়ে এসেছেন (পৃ ২৩১)।

তাঁর আগের যুগের রচনার চেয়ে এখানে তৎসম শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশি, যদিও 'বীতমন্যু' ছাড়া অপরিচিত শব্দ নেই।

এইভাবে বুদ্ধদেব বসু শব্দের আকর্ষণ থেকে পৌঁছোলেন সংহতিতে। আধুনিক অনেক লেখকের ধারণা, বিচ্ছিন্ন না হ'লে বিশিষ্ট হওয়া যায় না — এই কিংবদন্তি যে কত মিথ্যা তার প্রমাণ বুদ্ধদেব বসু। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে রচিত তাঁর বিপুল এবং বিচিত্র গদ্যগ্রন্থগুলি এই সাক্ষ্যই দেয় যে ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা কোনো 'চেষ্টাকৃত নূতনত্বে'র ওপর নির্ভর ক'রে না। ভাষা অমূল তরু নয় — দেশ-কাল-মাটির সঙ্গে তার নিবিড় যোগ। বুদ্ধদেব বসু শুরু করেছিলেন অধীত বিদ্যাকে সম্বল ক'রে, কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো পণ্ডিতিয়ানা বর্জন করতে — আত্মানুসন্ধানের তাগিদে তিনি ক্রমশ চ'লে এলেন মাটির কাছাকাছি। মাটির কাছাকাছি মানে এই নয় যে তাঁর রচনায় অপশব্দ বা আঞ্চলিক শব্দের ছড়াছড়ি (বরং ঠিক উল্টো; এদিক দিয়ে তিনি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যানুসারী), মৌখিক ভাষার স্বাভাবিক ছন্দটি তিনি বিকৃত করতে চাননি, যদিও তিনি গ্রাম্যতা, আঞ্চলিকতাকে পরিহার করেছেন। তিনি বিদ্রোহী নন, বিপ্লবী নন — তিনি ছিলেন ধীরে-ধীরে ডালপালা মেলে বেড়ে-ওঠা অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো, শ্রান্ত পথিক যার তলায় আশ্রয় নেবার সময় মনেও রাখে না তার পরিণতির ইতিহাস। কেননা শিকড় তো মাটির তলায়।

উল্লেখপঞ্জি

১ কথাটি শঙ্খ ঘোষের। 'ছন্দের বারান্দা' (১৩৭৮) বইয়ের নাম-প্রবন্ধটিতে তিনি বুদ্ধদেব বসুর ছন্দোমুক্তির সাধনা-বিষয়ে উপসংহার করেছেন : 'তেমনি বাঁধা-ছন্দ থেকে গদ্যের দিকে নয়, গদ্যকেই তিনি তুলে নিতে চান স্পন্দনমহিমায়। বাঙলা কবিতার ছন্দ-অভ্যাসে তিনিও শেষ অবধি মুক্তিই খোঁজেন, তবে ছন্দোমুক্তি নয়, ছন্দে মুক্তি' (পৃ ৭৩)।

২ দ্র "বুদ্ধদেব বসু চিঠি : রবীন্দ্রনাথকে", 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৮১, পত্র ১। এর পর

থেকে দে. সা. ব'লে নির্দেশিত।
৩ "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প", 'প্রবন্ধ-সংকলন', বুদ্ধদেব বসু, কলকাতা ১৯৬৬, পৃ ২৭।
৪ "সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ", ঐ, পৃ ১৯৫-৯৬। এর পর থেকে স. ক. ব'লে নির্দেশিত।
৫ 'আত্মকথা', প্রমথ চৌধুরী, দ্বিতীয় পর্যায় — পূর্বাশা', সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬০ বাংলা।
৬ "জেরোম কে জেরোম ও তাঁহার সাহিত্য", 'কল্লোল', বর্ষ ৬, আশ্বিন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
৭ 'বাংলা ভাষা-পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ ৪৬০।
৮ দ্র "রবীন্দ্রনাথের চিঠি ! বুদ্ধদেব বসুকে", পত্র ৩ দে. সা.।
৯ "বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপ", 'দৈনিক কবিতা সংকলন', বিমল রায়চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৬৮, পৃ ১০।
৯ক "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ৪র্থ খণ্ড (১৮৯১-১৯৪১), শ্রীকুমার সেন, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ ৩৪২।
১০ স. ক. পৃ ১৯২-৯৩।
১১ "হঠাৎ-আলোর ঝলকানি", প্রমথ চৌধুরী, 'কলকাতা', 'কলকাতা', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৬৮, অতিথি সম্পাদক নরেশ গুহ ও অরুণকুমার সরকার, পৃ ১৩২।
১২ "পত্রগুচ্ছ", 'কবিতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিসংখ্যা' বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১-২, পৃ ২৫।
১৩ "রাজশেখর বসু", 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩, ক্রমিক সংখ্যা ১-১, পৃ ১৬০।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

জ্যোতির্ময় দত্ত

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ঔপন্যাসিক; দীর্ঘ ও কঠিন সাধনার দ্বারা তিনি নিজেকে পরিণত করেছিলেন প্রচারকে।' 'বই থেকে বইয়ে, জীবনানন্দের উপলব্ধির গভীরতা বেড়েছে, কিন্তু প্রকরণের উন্নতি হয়নি।' দুটোই ভুল কথা, কিন্তু এগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এঁরা যদিও মহৎ ঔপন্যাসিক ও কবি, স্ব-পেশার প্রতি এঁরা খুব বেশি মনোযোগ দেননি। নিজেদের ব্যবসায়ের যন্ত্রগুলির ওপর এঁদের নেই উগ্র ভালোবাসা; নেই সম-ব্যবসায়ীদের বিষয়ে কোনো কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথের পর, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পেশাদার, মনস্ক লেখক হলেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দের অধ্যাত্মজীবন নীরব ও আত্মগোপনকারী; তিনি তাঁর জটিল সৃষ্টি-প্রক্রিয়া — একটা রোমশ ওলের মতো — মাটির তলায় লুকিয়ে রাখেন। তাঁর কবিত্বের রহস্যে আমরা অভিভূত হই; তিনি অনন্য, অননুকরণীয়। কিন্তু যাঁরা নিজেরা লেখক হ'তে চান, তাঁদের অনুধাবনীয় হচ্ছেন বুদ্ধদেব। ভাষার কারিগরি শেখবার মতো, রবীন্দ্রনাথের পর এমন কামারশাল আর দ্বিতীয় নেই। নেই লেখকপেশার পরিশ্রম ও মর্যাদার বুদ্ধদেবের চেয়ে উচ্চতর দৃষ্টান্ত। তিনি বাংলাভাষার লেখকের জন্য এমন মান স্থাপন করেছেন যাতে আমরা সচেতন হয়েছি যে, যদিও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মাত্রেই রবিবাসরীয় পত্রিকায় টুকিটাকি লেখা প্রকাশ করতে পারেন, লেখক হওয়াটা মনীষা ও সাধনা-সাপেক্ষ। জন্মের সময় মাতৃহীন হয়েছিলেন বুদ্ধদেব; যে-আশ্রয়, যে সান্নিধ্য, যে-উষ্ণতা মানবী মাতা তাঁকে দিতে পারেননি, তা তিনি পেয়েছিলেন দেবী বাংলাভাষার কাছ থেকে। প্রতিদানে, এই ভাষা-শ্রমিক বাংলাকে দিয়েছেন, দেড়শোর বেশি বই — যাদের প্রকরণ ও বিষয়ের বৈচিত্র্য আছে, এবং যার কোনো-কোনোটি অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় রচিত, কিন্তু কোনোটিই তিলমাত্র অযত্নে নয়।

২

অযত্নে তো নয়ই, বরং একটু বেশি যত্নে, বেশি পটুতায়। বস্তুত, ভাষার ওপর তাঁর আধিপত্যই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুর্বলতায় পরিণত হয়। তাঁর রচনা এতো মসৃণ ও প্রাঞ্জল যে তাঁর উপন্যাসে কখনো-কখনো আমরা অন্ধকারের অভাব অনুভব করি। তাঁর চরিত্রেরা প্রত্যেকেই — কিশোর-উপন্যাস থেকে 'প্রেমপত্র' পর্যন্ত — খুবই সবাক; এবং তারা নিজেরা যেটুকু বা অব্যক্ত রাখে, তা লেখক — অধিকাংশ সময় যাঁর থেকে চরিত্রগুলি প্রভেদ করা যায় না — অসংখ্য সাহিত্য ও শিল্প-অনুষঙ্গের উল্লেখ সহযোগে বুঝিয়ে দেন। তাঁর উপন্যাসের ভাষায় ও বিষয়ে, চার দশকে, অনেক বদল হয়েছে ঠিকই। আগের মতো অনুপ্রাসময়, স্বরবর্ণবহুল নয়

তাঁর স্টাইল; তাঁর চরিত্রেরা কিশোর বুদ্ধদেবের ঢঙে বলা যায় — এখন আর শুধু 'বুকিশ' নয়, এবং তাদের বুকুনিও নয় কেবল ইংরিজি : তারা এখন ইংরেজি সাহিত্যের পরিধি ছেড়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, এবং কেবল-সাহিত্য ছেড়ে পাশ্চাত্য ছবি ও সংগীত ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও ধর্মেও প্রবেশ করেছে। কিন্তু তারা এখনো অতি সচেতন ও বাগ্মী. কখনো-কখনো মনে হয় তারা কম কথা বললে কি একটু আড়ষ্ট হ'লে, বেশি প্রকাশ পেতো। অবশ্য এটাই বুদ্ধদেবের ঢঙ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তিনি ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক। যদিও উপন্যাসের উপজীব্যই হচ্ছে মানুষে-মানুষে ভিন্নতা, বুদ্ধদেবের ছিলো না সামাজিক কি মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যে কোনো কৌতূহল। কবিতায় যেমন, উপন্যাসেও বারম্বার তিনি এঁকেছেন, সাজিয়েছেন, কখনো-কখনো হেসেছেন, কেবল নিজেকে নিয়ে। আর — এবং সেটাও প্রধানত কবিরই ধ্যানের বস্তু — তাঁর উপন্যাসের নায়িকা হচ্ছেন স্বয়ং সরস্বতী। ইয়ান ফ্লেমিঙ যেমন তাঁর রহস্যোপন্যাসে ক্ষীণতম অজুহাতে জেমস বণ্ডকে দিয়ে মোটরগাড়ির দৌড় করান কি জুয়ো খেলান, বুদ্ধদেব তেমন সুযোগে-কুযোগে ভাষাতত্ত্বের কূটপ্রশ্ন তোলেন, উল্লেখ করেন কোনো চিত্রশালার ঐশ্বর্য, বর্ণনা করেন কোনো প্রতিকৃতির। এবং যখন এসবের কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ করছেন না, তখনো বুদ্ধদেবের উপন্যাসে শিল্পই হচ্ছে প্রধান মাদক-শক্তি। তাঁর চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ নয়, আমরা তারিফ করি বুদ্ধদেবের ভাষা; আমাদের যুগপৎ শঙ্কা ও হর্ষের উদ্রেক করে ঝরনার মতো লেখকের স্টাইল, যা একের পর এক শাব্দিক ও তাত্ত্বিক পাথর অতিক্রম ক'রে যায়। এই উপন্যাসগুলির জেমস বণ্ড বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং। এখানে তাঁর মোটর-দৌড়, তাঁর জুয়োর বাজিধরা, তাঁর জলের তলার মৃগয়া, সবই বাংলা ভাষার সঙ্গে। আপামর জনসাধারণ হয়তো এই দৃশ্যে মোটেই রোমাঞ্চিত হবেন না। কিন্তু অপর লেখকেরা? বিশেষত শিক্ষানবিশ কবিরা?

কিন্তু, বুদ্ধদেব শেখান কি শুধু শব্দ, কি ছন্দ, কি দীর্ঘ বাক্যের গঠন? তিনি কি জাগান না কৌতূহল? তিনি কি শিক্ষিত করেন না রুচি? প্রথম থেকেই বুদ্ধদেব স্বদেশী ও বিদেশী সকল সাহিত্য বিষয়েই এক বিরামহীন আলোচনা ধারা বাঙালি পাঠকের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছেন। তাঁর চরিত্রে এটা বিশেষ লক্ষণীয় আমি আগে বলেছি তিনি ছিলেন অতি আত্মকেন্দ্রিক; সেটা ভুল; তাঁর জীবন ছিলো একান্তভাবেই সাহিত্যকেন্দ্রিক। এবং তাঁর সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগ ও কৌতূহল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। সমালোচনা, সম্পাদনা, অধ্যাপনা — কোনোটাই তাঁর কবিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং সবকিছুই একই কেন্দ্রীয় তাগিদের প্রকাশ। এমন বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বঙ্গদর্শন-প্রকাশ যতোটা তার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বানুগ, ডেপুটিগিরি ততোটা নয়। এমনও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে শান্তিনিকেতন কি পদ্মা যতোটা অন্তস্থ, সাধনা-র সম্পাদনা ঠিক ততোটা নয়, তা অনেক বেশি বাহ্যিক ঘটনা। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রতিটি কাজ একই ডালের কোনোটি পাতা, কোনোটি কুঁড়ি, কোনোটি ফল। কৈশোরে যে-ডালে প্রগতি-পত্রিকার কুঁড়ি সম্পূর্ণ ফোটার আগেই ঝ'রে গেলো, সেই ডালেই ফুটেছিলো পঁচিশ বছর স্থায়ী 'কবিতা'। রিপন কলেজে ইংরেজি সাহিত্য অধ্যাপনারই পরিণতি যাদবপুর তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের প্রতিষ্ঠা। বাইরের আর আত্মার জীবন এমন অভেদ নয় আমাদের আর কারো।

৩

এই অভ্রভেদের প্রায় সুন্দরতম, মিষ্টতম, সবচেয়ে পুষ্টিকর ফল — এমন কি তাঁর অত্যাশ্চর্য্য সাহিত্য-সমালোচনার চাইতেও উপাদেয় ও পুষ্টিকর ফল—তাঁর অনুবাদ-কবিতা। বুদ্ধদেবের গদ্য এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। এটি কেবল তাঁর গদ্যের দ্বারা প্রভাবিত। এমনকি—এই প্রবন্ধের প্রথম দুটি বাক্যের ভিত্তিতে—এও বলা যায় যে বুদ্ধদেবের অনুকারী। এটা সত্য যে এই উনিশশো চুয়াত্তর সালে কোনো দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে গেলে বুদ্ধদেবের গদ্যের প্রত্যক্ষ অনুকরণ না-করলেও, তার দ্বারা প্রভাবিত না-হ'য়ে উপায় নেই। কিন্তু তাঁর গদ্যের চেয়েও—আমার বিশ্বাস—আরো প্রভাবশালী হবে তাঁর অনুবাদ কবিতার ভাষা। বুদ্ধদেবের যে-দুটি কীর্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রথম, তার একটি তো, অবশ্যই, 'মহাভারতের কথা'। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সমগ্র মহাভারতের অর্থ — নৈতিক ও নাটকীয় অর্থ — বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। নীলকণ্ঠ মহান; যে কোনো কবির চেয়ে মহৎ তাঁর কীর্তি; কিন্তু তিনি শ্লোক পরম্পরার বিশদ টীকাকার; মহাভারতের সামগ্রিক বার্তা কিছু আছে কিনা এই ধোঁয়াটে অপ্রামাণ্য, দূরদার্শনিক মরীচিকা নিয়ে নীলকণ্ঠ মাথা ঘামাননি। অরবিন্দ, গোখলে ও গান্ধী মহাভারতের অংশমাত্র — গীতা — বিষয়ে লিখেছেন এবং গীতাকে তাঁরা দেখেছেন ধর্মগ্রন্থ রূপে; তার পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক কি নাটকীয় তাৎপর্য বিষয়ে এই মনীষীরা নিরুৎসুক। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনার পরিধি একই সঙ্গে অতিরিক্ত বিস্তৃত ও সঙ্কীর্ণ : বিস্তৃত, কারণ ভাগবত পুরাণও তাঁর আলোচনার অন্তর্গত; অপরপক্ষে সংকীর্ণ, কারণ তাঁর ঘোষিত অভিপ্রায় এই 'ইতিহাসের', এই বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী রহস্যের আকরগ্রন্থের, মর্মোদ্ঘাটনের ততোটা নয়, যতোটা যেন তেন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা; উপরন্তু, তাঁর আলোচনার ভঙ্গিটাও বড়ো সাম্প্রদায়িক ও ঝগড়ুটে। উপনিষদের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ এই রক্তস্বেদময়, অবিন্যস্ত, জটিল, বীভৎস গ্রন্থের বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলেননি। মহাভারত-বিষয়ে জীবনানন্দের তাত্ত্বিক আলোচনা পুরোনো কোনো তোরঙ্গ থেকে উদ্‌ঘাটিত হবে এমন নিশ্চয় কেউ আশা করেন না, কিন্তু তাঁর কবিতায়ও মহাভারতের কোনো উল্লেখ নেই। বস্তুত, সেই আদি যুগ থেকেই, উচ্চ বর্ণের ভারতীয় কবি ও সমালোচকেরা এই জনসাধারণের প্রাণের বস্তুটি বিষয়ে নীরব; এবং তাঁদের এ-নীরবতা কর্ণভেদী। মহাভারতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল দ্বন্দ্বগুলি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। মহাভারত কথক প্রশ্ন তুলেছেন : কর্ম কী? হিংসা কি সমর্থনযোগ্য? যজ্ঞে বলিদানের নৈতিকতা কী? বর্ণাশ্রমের ভিত্তি কী? শাক্যমুনি (যাঁর নাম প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও নেই, কিন্তু মহাভারতের অনেক বিতর্কেই যিনি প্রধান প্রতিপক্ষ, এবং যুধিষ্ঠির স্পষ্টতই যাঁর মানসপুত্র) কি সত্যিই মূর্তিমান অধর্ম? বর্ণ-কবি ও সমালোচকেরা এগুলি অবহেলা করেছেন, এড়িয়ে গেছেন, ব্যাকরণ ও ন্যায়ের খুঁটিনাটি প্রশ্নের সমাধানে অসামান্য সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি প্রদর্শন করেছেন। এই দু-হাজার বছর; হিন্দু সমাজ যুদ্ধের দিকে চোখ বুজেছিলো, এবং ধর্মকে নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ক'রে পরিণত করেছিলো আচারে। বুদ্ধদেব বসুই প্রথম — দু-হাজার বছরে প্রথম — উচ্চবর্ণের কবি ও বুদ্ধিজীবী যিনি মহাভারতের মুখোমুখি হলেন। এরকম কাক তালের যাঁরা মানে খোঁজেন, তাঁরা নিশ্চয় বুদ্ধদেবের নামকরণ রহস্যে অভিভূত হবেন। উপনিষদ-পুনরাবিষ্কারের মতো, মহাভারতের পুনরাবিষ্কার আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে একটি

প্রধান নতুন অধ্যায়। এবং ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক বুদ্ধদেবকে, ব্রাহ্ম-জাগরণের পিতাদের মতোই, একজন বীজ-চিন্তার জনক হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য।

৪

কিন্তু বুদ্ধদেবের যে দ্বিতীয় কীর্তি 'বাংলাভাষায় প্রথম' তা কোনো ধারণা, কোনো তত্ত্বের চেয়েও গভীর ও বীজ বস্তু; তা একেবারে ভাষারই মূল প্রাণশক্তির ব্যাপার। বুদ্ধদেবই প্রথম যিনি কোনো প্রধান বিদেশী কাব্যের একেবারে আক্ষরিক, ছন্দানুগ, অপরিবর্তিত অনুবাদ করেছেন বাংলায়। কাশীরাম কি কৃত্তিবাস, কেউই অনুবাদক নন; পয়ারের মোটা, যান্ত্রিক, আট-সেরি-ছয়-সেরি ছাঁচে বাল্মীকিকে ধরা যায় না। বাংলা ভাষা তখনো প্রস্তুত ছিলো না। এমনকি এই সেদিনও, এমনকি সত্যেন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে, ভিক্তর য়ুগো কি এলেয়েটের কবিতা অতি শিথিল, অতি তরল, অতি গাঙ্গেয় রূপ নিয়েছে; বিষ্ণু দে'র 'ইকরি-মিকরি চামচিকরি', কিংবা সুধীন্দ্রনাথের হাইনে অনুবাদ চাতুর্য, তির্যকতা ও কৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কিন্তু দু-জনেরই ভাষা বড়ো আড়ষ্ট, বড়ো কৃত্রিম; এঁদের বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব এতোই দৃঢ় যে অন্যের চরিত্রে প্রবেশ করতে গেলে এঁরা হয় শোলার মুখোশ, নয় লোহার বর্ম, প'রে আসতে বাধ্য হন। অথচ অনুবাদে প্রয়োজন পরম নম্যতা, গতিশীলতা, জলের মতো পাত্র ভেদে ভিন্ন আকার ধারণের ক্ষমতা; একটা ভাষার সব পেশিগুলি ঠিকমতো বেড়েছে কিনা তার শ্রেষ্ঠ পরীক্ষাই বোধহয় অনুবাদ। বুদ্ধদেবের অনুবাদে অবশেষে বিশ্বাস হয় যে এমন আবছাতম অনুভূতি নেই যার ছায়া ধরা যায় না বাংলায়, নেই ভাবের এমন সূক্ষ্ম পরিবর্তন যার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না আমাদের ভাষা। কোথায় গেলো সেই অনড় জড়বাদী পয়ার? — সেই পয়ার যাতে জগতের যাবতীয় বৈচিত্র্য ও রহস্য কার্য-কারণের সরলতম সম্পর্কে, 'তথায়-আইল-রাম-বান্ধিতে-জাঙ্গাল' ধরনের বাক্যে, পরিণত হয়? কে এই কলুর বলদকে মুক্তি দিলো যাতে সে কখনো ফিঙে কখনো তিমি কখনো শিমূল তুলোর রূপ নেয়? অবশ্যই, রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভাগ্যবান; তিনি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শৈশব থেকে বর্ধিত। তাঁর অনুবাদ থেকে টের পাওয়া গেলো, বাংলার কতোদূর বৃদ্ধি ঘটেছে। বোদলেয়ার একজন মহৎ কবি শুধু নন, একজন বিচিত্র ও বিপরীত কবি। 'ক্লেদজ কুসুমে' নেই এমন ছন্দ, পঙক্তিবিন্যাস, কি মিলের জটিল অনুক্রম, ফরাশি সাহিত্যে যা অন্যত্র আছে। ক্ল্যাসিকাল থেকে রোমান্টিক, স্বর্গীয় থেকে নারকীয়, কৃত্রিম থেকে বাস্তব, ভাবগম্ভীর থেকে সভ্য ও পরিহাসময় — বোদলেয়ার এক মেরু থেকে অপর মেরুতে সারাক্ষণ দুলছেন। তাঁকে বাংলার মতো এক সুদূর ভাষায় অনুবাদ? এটা যিনি পরেন, তিনি নিজে যদি এই যুগের একজন প্রধান কবি না-ও হতেন, কৃত্তিবাস কি রাজা জেমস-এর বাইবেল অনুবাদকদের মতো তিনি চিরস্মরণীয়। শুধু বোদলেয়ার নয়। ইনি ক্ল্যাসিকল ও আধুনিক, ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়, উভয় সাহিত্যের ধারাই প্রবাহিত করেছেন আমাদের ভাষায়। বস্তুত, শুধু যদি কালিদাস ও বোদলেয়ারের ভূমিকা দুটিই সারা জীবনে লিখে থাকতেন কেউ, তাহ'লেও বাংলা সাহিত্যের অমরদের তিনি হ'তেন অন্যতম। সমালোচনাও যদি সাহিত্যের একটি বিভাগ হয়, তবে ঐ প্রবন্ধ দুটির লেখক একটি বিভাগে অন্তত অদ্বিতীয়।

৫

কিন্তু, ঐ অনুবাদগুলির দিকে আরেকবার তাকান! বুদ্ধদেবের শব্দের ঝুলি বড়ো ছিলো ব'লেই কি 'ক্লেদজ কুসুম'গুলিকে তিনি এমন সার্থক বাংলা কবিতায় পরিণত করতে পারলেন? সুধীন্দ্রনাথের শব্দভাণ্ডার কি বুদ্ধদেবের চেয়ে ছোটো ছিলো? বুদ্ধদেবের অনেক অনুবাদ — যেমন 'সুন্দর জাহাজ' — বাংলাতে আশ্চর্য স্বাভাবিক ও প্রাণময়; তাদের অনুবাদ ব'লেই মনে হয় না। এতোগুলি কবিতাকে কী ক'রে করলেন বুদ্ধদেব জীবনদান? কই, ইংরেজ অনুবাদক তো তা পারেননি! যদি ভাষার বিকর্তনই একমাত্র শর্ত হয় — অনুবাদকের নিজস্ব কোনো ক্ষমতার প্রয়োজন না-থাকে — তবে ইংরিজিতে কেন এই কবিতাগুলি এমন জীবন্ত নয়? নিচের কবিতাটি পড়ুন; এটা এখন বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি: রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কি 'উর্বশীর' পাশেই এর স্থান।

সু ন্দ র জা হা জ

অলস মায়াবিনী, বলবো তোকে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী —
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোকে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ;
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

অলস মায়াবিনী, বলবো তোকে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী —
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

এগিয়ে আসে তোর নিটোল স্তনভার রেশমে অবিরাম,
অনেক দ্বৈরথে বিজয়ী ওরা দুটি বর্ম অভিরাম —
যুগল ঢাল ধরে কত না

সুগোল, রেখায়িত আলোক-রশ্মির দ্যোতনা।

উগ্র ঢাল, তার তীক্ষ্ণ শরমুখ রঙিন, কোপনীয়,
রেখেছে সঞ্চিত যা-কিছু মায়াময়, মধুর, গোপনীয় —
আসব, সুরা, সৌগন্ধ্য —
বুদ্ধি বানচাল, হৃদয়ে প্রলাপের ছন্দ।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোকে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।

প্রবল নায়কের বিরোধী খেলোয়াড় অকাতর,
ও-দুটি বাহু যেন ক্লান্তি ঝলকিত অজগর,
প্রেমিক বাঁধা পড়ে ক্ষমাহীন
অতি কঠিন তোর হৃদয় কারাগারে চিরদিন।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত না অদ্ভুত বিকিরণ,
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

এই কবিতাটি যেন বাংলা ঐতিহ্যের পরিপূরক — 'উর্বশী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র উভয়েরই প্রতিধ্বনিময়। এটা কি কেবল 'অনুবাদ'? বুদ্ধদেব উনিশশো পঞ্চাশের আগেও অনুবাদ করেছেন। কিন্তু সেগুলি অনেক হাল্কা, বুদ্ধদেব অনেক 'স্বাধীনতা' নিয়েছেন, অনেক পরিবর্তন করেছেন মূলের, অথচ তাতে শব্দ-সংখ্যাই কেবল বেড়েছে কিন্তু অনুবাদগুলি সহজ কি অনাড়ষ্ট হয়নি। বোদলেয়ার ও কালিদাসের অনুবাদে লক্ষণীয় হচ্ছে সংহতি; এ দুজনের মতোই বাঙালি কবিটিও আঙ্গিকে একজন ক্ল্যাসিসিস্ট। শুধু অনুবাদে নয়, উনিশ শো পঞ্চাশের মাঝামাঝি শব্দের বন্যা নেবে গিয়ে, বুদ্ধদেবের সাহিত্যের সকল বিভাগেই দেখা দিলো অর্থের, অভিজ্ঞতার, ঘন পলি। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু এমন কি 'উত্তর তিরিশ' ও 'কালের পুতুল'-এর তুলনাতেও কতো পরিণত বুদ্ধদেবের এ-যুগের গদ্য। তিনি আর ভেসে যান না বাক্যের পর বাক্যের উচ্ছ্বাসে; তাঁর সাহিত্যিক রুচি চিরকালই খুব তীক্ষ্ম, কিন্তু এখন তাঁর সমালোচনায় এসেছে চিন্তার সেই গভীরতা এবং সাহিত্য পাঠের সেই প্রসার যা সুধীন্দ্রনাথ এতোকাল আকাঙ্ক্ষা ক'রে এসেছিলেন। এবং এই পরিণতিরই সংকেত হচ্ছে কালিদাসের

ভূমিকায় 'শুধু প্রতিশব্দের স্তুপীকরণের' বিরুদ্ধে, শব্দের 'সম্মোহনের' বিরুদ্ধে তাঁর সতর্কবাণী। এই কি সেই তরল, শব্দ-মাতাল তিরিশের বুদ্ধদেব বসু? ইনি এতোকাল ছিলেন পারদের মতো ঝকঝকে ও অস্থির; পঞ্চাশের মাঝামাঝি প্রথম তাঁর নিজস্ব, অনন্য, বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে অশ্রুত এক কণ্ঠ শোনা গেলো। প্রায় পঞ্চাশ বছরে পৌঁছে, কঙ্কাবতী-র কবি তাঁর চুমকি-আর-জরি-ঝকমকে পোশাক ত্যাগ ক'রে নগ্ন হ'লেন।

ভুল যা ঝংকার, ঝর্ণা, বরদাত্রী কঙ্কাবতীরে,
যার ঠোঁট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি শিখেছিলি তুই —
[আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১]

এতোকালের ঝংকার, ঝর্ণা, বরদাত্রী কঙ্কাবতীকে ত্যাগ ক'রে তিনি এসে পৌঁছুলেন 'যে আঁধার আলোর অধিক'-এ। এটি বুদ্ধদেব-এর জীবনের ও কবিত্বের, কেন্দ্রীয় অব্যয় কস্তুরী। বুদ্ধদেব পঞ্চাশ বছর ধ'রে বিশাল এক গাছের মতো সাহিত্যের নানান বিভাগে ডাল মেলেছেন; এবং তাতে ফুটিয়েছেন অজস্র শব্দময় অবচীন পল্লব, অনেক সুন্দর ফুল, শাঁসালো পুষ্টিকর ফল, লতা, অর্কিড, — কখনো খেয়ালে, কখনো জীবিকার জন্য, — এবং এই নিয়েই মাতামাতি করেছে তাঁর ক্ষুদ্র কিন্তু বিশ্বস্ত পাঠক সমাজ। কিন্তু নিজে বুদ্ধদেব ছিলেন, মূল থেকে মগডাল পর্যন্ত, 'অলক্ষ্য, দুর্গম আর পুলকে বধির' এক কবি, যিনি সমাজ ও পরিবারের উষ্ণ ক্রোড়ে বসবাস ক'রেও হ'য়ে গিয়েছিলেন হিমালয়বাসী ঋষির মতো বিবিক্ত। 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এর একটি কবিতায় তিনি তো নিজেকেই বর্ণনা করছেন :

ভি ন দে শী

প্রেমিকারা মৃত আজ, স্তন ছিলো শালুক ফুলের মতো;
শামুকের ভেজা গন্ধে, ঠাণ্ডা ঘাসে নিবিড় পুকুর —
ছোটো, কিন্তু হাঁটুজল পেরোলে তুফান।

বন্ধু সব মৃত; — আর নামে না উদার সন্ধ্যা বারান্দায়,
হালকা ভেলা দোলে না উতল ঢেউ কথোপকথনে। —
খেলা, কিন্তু পরিণামে সামুদ্রিক যান।

প্রকৃতিও মৃত; — জন্তুর গুহার দ্বারে উৎকোচ অচল,
লাল বাঘ পতঙ্গ প্রণত,
বৃক্ষতাপে দেয় না ভিজিয়ে কোনো নির্বোধ সন্তান।

শুধু — যতক্ষণ
গাছে-গাছে ডাকিনীরা মুণ্ড নাড়ে, তাল দেয় শূলবদ্ধ বিড়লীর
আর্তনাদ —

বৃষ্টির অস্পষ্ট রাতে ফুটপাতে প'ড়ে থাকে এক
ভিনদেশী হৃৎপিণ্ড,
স্পর্শময়, ক্রমশ বিদ্বান।

এই 'ভিনদেশী হৃৎপিণ্ড' তার লেখার টেবিলের নির্বাসন থেকে এক খুব কূট আত্মজীবনী বিধৃত ক'রে গেছে বুদ্ধদেবের পরিণত কবিতায়, নাটকে ও গল্পে। এগুলি তির্যক, সূক্ষ্ম রহস্যে আবৃত, নানান বিরোধাভাসে ভরা। তাঁর শেষ কয়টি কবিতার বইয়ের নামের মধ্যেই আছে এক মর্মান্তিক বিরোধাভাস, এক দুঃখজয়ী রসিকতা — 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' (অথবা, 'জন্মের আগে : মৃত্যুর পরে'); 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'মরচে-পড়া পেরেকের গান;' 'একদিন : চিরদিন;' 'স্বাগতবিদায়'। স্পষ্টতই, এক মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঘটেছিলো তাঁর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি, এমন এক শীত যার কনকনে বাতাসে ঝ'রে গিয়েছিলো বুদ্ধদেবের ভাষার অবান্তর পল্লব। তিনি একেবারে চুরমার হ'য়ে গিয়েছিলেন; সেই ধ্বংসের স্তূপের মধ্যেই কবি নিজেকে ধীরে-ধীরে পুনর্নির্মাণ ক'রে নিলেন; মেনে নিলেন বিচ্ছেদ; ফিরে এলেন আবার সৃষ্টির কাছে। কৈশোরেও তিনি জীবন থেকে পশ্চাদপসরণ ক'রে আশ্রয় নিয়েছিলেন বইয়ের দুর্গে। কিন্তু কী ঘন, কী স্মৃতিময় এই দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন! এই কবিতা থেকে যা-কিছু শৌখিন সব ঝ'রে গেছে; এরকম শক্ত-মন ও আঁটো-গড়নের কবিতা আমাদের ভাষায় আর কেউ কি লিখেছেন?

আ ট চ ল্লি শে র শী তে র জন্য

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায় — ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ,
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস,
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল বিশ্বস্ত নির্বেদে।

প্রাঙ্গণে কিছুই নেই; পারিস তো বধির হ'য়ে যা।
যা তোর নিজের নয়, তা শেখাতে পারে কোন মুনি?
বরং তুলে নে ঘাড়ে আদিবাসী সিনবাদের বোঝা,
ক-টি মাত্র মিল খুঁজে সারাদিন গাধার খাটুনি।

শীতের নোঙর পড়ে, আর কিসে তোর প্রয়োজন?
তীর, দ্বীপ, সিন্ধু নিয়ে জেগে ওঠে অমল দেয়াল,
এক হ'য়ে মিশে যায় ঘণ্টা, বেলা, পরিবর্তন,

রৌদ্র আর জ্যোৎস্নার তালিমারা রঙিন খেয়াল
অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে স'রে যায় নিখিল পৃথিবী,
কেননা, গতির পারে, তারে তুই সৃষ্টি ক'রে নিবি।

[আটচল্লিশের শীতের জন্য : ২]

কিন্তু কী সেই আকর-অভিজ্ঞতা যা বুদ্ধদেবের এই দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনকে, কবিতার কাছে দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণকে, প্রথমবারের থেকে এতো ভিন্ন ক'রে তুললো? কিন্তু, তার আগে, জানা দরকার প্রথমবার কী ঘটেছিলো।

বুদ্ধদেব বসু কৈশোরেই এতো ভালো ও এতো বেশি লিখে ফেলেছিলেন, কল্লোল যুগের বালক-বিস্ময়রূপে তাঁর খ্যাতি এতোই বিস্তৃত, যে আমরা লক্ষ করি না বুদ্ধদেব আসলে খুব ধীরে পরিণত এক কবি। এখনো অনেকে আছেন যাঁরা এই কবির প্রসঙ্গ উঠলে মাথা দুলিয়ে আবৃত্তি করেন।

দিনের কাজের হাওযার আওয়াজ হাজার জোয়ারে রহে
হাওয়ার রথের চাকায়-চাকায় ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে আকাশে রটে
কী কলরোল।
আমি সে-দিনের শব্দের নিচে, আমি সে-কাজের শব্দের পিছে শুনি,
আমার বুকের হৃদয়ের রোলে, রক্তের তোড়ে, কানে আর প্রাণে, শুনি.
(কঙ্কাবতী)
হৃদয়ের তালে তাল রেখে টিপ টিপ গান গেয়ে যায়
'কঙ্কা — কঙ্কা — কঙ্কাবতী —
কঙ্কাবতী গো।...'
আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে : মনে হয় আঁকাবাঁকা
জলে, মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায় :
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝ'রে পড়ে সুর — 'কঙ্কা! কঙ্কা!
কঙ্কাবতী!

এই শব্দের প্লাবন, এই কিশোরোচিত আকুলতা এমন অনেককে মুগ্ধ করে যাঁরা অন্য কোনো প্রকারের কবিতা আদৌ উপভোগ করেন না। আজকের পাঠক যদিও এই শব্দের পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত বোধ করবেন, এটা মানতেই হয় যে সার্থকনাম কল্লোল-স্টাইলের এটা একটা শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এই নারী অবয়বহীন; এই কবিতা কোনো স্পষ্ট চিত্রকল্পহীন। কিন্তু সে যুগের রীতিই ছিলো এই। যেমন

মোহিনী সে-অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান;
সাবধানে যেও সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তার মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান।
[অজিত দত্ত]

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম;
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।
[অজিত দত্ত]

প্রথম সাপটা দেখবে নিথর পাথর সম্মোহিত,
কোন সে আদিম অন্ধ অঘোর অন্বেষণের দ্বিধা
আঁধার-চোঁয়ানো ছায়া-বিদ্যুৎ হেনে খোলে কুণ্ডলী।
[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

ভূজের ভুজঙ্গতলে হে নতাঙ্গী, নির্ভয় নির্ভরে
তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরথরে।
স্ফুরৎপ্রবাল ওষ্ঠে গূঢ়ফণা চুম্বন-উৎসুক,
একপারে রক্তাশোক, অন্যতটে হিংসুক কিংশুক
[অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

যদিও এই রীতিকে তখন কেউ-কেউ অভিনব ভেবেছিলেন, শব্দের পৌনঃপুনিকতা বাংলা ভাষা ও কবিতার এক মৌলিক দুর্বলতা। আমাদের ভাষা আর্য পরিবারের পূর্বতম প্রান্তবর্তী; উত্তর ইয়োরোপীয় কাঠিন্যের বদলে বাংলার অধিকাংশ শব্দ হাওয়াই কি তাহিতির ভাষার মতো তরল, তা ক্ষিপ্র ও সীমিত হসন্তে শেষ হ'য়ে যাওয়ার বদলে অলসভাবে ও ফিকে হ'য়ে মিলিয়ে যায়। বাংলা দ্বিত্বপ্রয়োগবহুল, ধ্বন্যাত্মক ও অনুকারী। 'লোকটা হাঁসফাঁস করতে-করতে যাচ্ছিলো, টপটপ ক'রে পড়ছিলো ঘাম' — এই বাক্যটি সংজ্ঞার্থ কি সংশ্লেষ নির্ভর নয়, বাক্যটিতে বরং লোকটির ক্রিয়াকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করা হয়েছে এবং শব্দগুলি প্রতিটি কর্মের করছে অনুকরণ। 'পাতায়-পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া' — এই বাক্যটি প্রতীকী নয়, এটিতে প্রকৃতি প্রত্যক্ষত অনুকৃত হচ্ছে। এটা একধরনের অপরিণত ও আদি উপকারিতা, যাকে অনেক বাঙালিই কবিতা ব'লে ভুল করেন। শিশু কি পশুদের প্রতি হামেশাই পরিণত বয়স্কেরা এই ধরনের অনুকারী ভাষা ব্যবহার করেন : 'খোকা চলে হাঁটি-হাঁটি পা পা', 'হাঁউমাঁউ কাঁচা খাঁউ, মাঁনুষের গঁন্ধ পাঁউ।' কিন্তু এটা না-বিজ্ঞান, না-কবিতার ভাষা, কারণ উভয়েই দরকার — অবশ্য দুই ভিন্ন ধরনের — স্পষ্টতা ও কাঠিন্য।

আশ্চর্য এই যে অনুপ্রাস, দ্বিত্বপ্রয়োগ, অনুকারী ধ্বনির পৌনঃপুনিকতা অর্থাৎ শব্দের এই দেশজ, অতি-বাঙালি ব্যবহার সবচেয়ে বেশি করেছেন তাঁরাই, যাঁরা শব্দ-চয়নে সবচেয়ে সংস্কৃত-নির্ভর : ভারতচন্দ্র ও মধুসূদন। কল্লোল-যুগের লেখকেরা এটা বুঝতে পারলে কি কৌতুক বোধ করতেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র পর তাঁদের ভাষা খুব প্রতিক্রিয়াশীল? যে নিজেদের যতোই তাঁরা দামাল ও রোমান্টিক ব'লে ঘোষণা করুন, তাঁদের স্টাইল অষ্টাদশ শতকী? শুধু কল্লোল গোষ্ঠীর নয়, অধিকাংশ বিদ্রোহেচ্ছু ও উত্তেজিত মানুষের কবিতায় থাকে এই অভিপ্রায় ও স্টাইলের ব্যবধান। নজরুল ইসলাম ও যুবক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বক্তব্য 'বিপ্লবী' হ'তে পারে, তাঁদের ভাষায় নেই আবিষ্কার, নেই রহস্য, নেই অনুভূতির ভাঙচুর। নিচের অনুপ্রাসবহুল পঙক্তিগুলি 'অন্নদামঙ্গলের' লেখকের হাত থেকেও কোনো শিথিল মুহূর্তে বেরুতে পারতো :

যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়।

যায় অতীত
কৃষ্ণকায়
যায় অতীত
রক্তপায় —
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়! ...
ঐ রে দিক-
চক্রে কার
বক্র পথ
ঘুর-চাকার!
ছুটছে রথ
চক্র যায়!
দিগ্বিদিক
মূর্ছা যায়!
কোটি রবি শশী ঘুর পাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রর্তকের ঘার-চাকায়!

৭

বাংলা কবিতার এই দুই ভাষা : একটা হচ্ছে রুদ্ধশ্বাস, উত্তেজিত শব্দস্রাব; অন্যটা ধীর, নিচু, দ্বিধাময়। একটি বাগ্মিতার ভাষা, অন্যটি উন্মোচনের। একটির আবেদন শ্রুতির প্রতি, অন্যটি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার। একটিতে লেখক নিজেকে ও শব্দকে নিয়ে বিভোর, তাঁর নিজের বাইরে কিছুই তিনি স্পষ্ট দেখতে পান না। তাঁর প্রকৃতিবর্ণনায় অপর বস্তুর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না, কেবল তাঁর ভাবাবেগ প্রকাশিত হয়। অন্যটিতে কবি জগৎ বিষয়ে কৌতূহলী; তিনি প্রায় একটি স্বচ্ছ আধার, একটি নিরপেক্ষ বাহনে পরিণত হয়েছেন যার মধ্য দিয়ে অনায়াসে অপর বস্তু ও প্রাণী পাঠকের চৈতন্যে প্রবেশ করে। বুদ্ধদেব বসু প্রথম থেকে দ্বিতীয় রীতিতে পৌঁছেছেন যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। তাঁর কিশোর স্টাইল প্রথম থেকেই, ঐ ধরনের রচনা হিশেবে, খুব পরিণত। প্রায় লেখা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব এমন এক শব্দের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যার তরলতা ও গতি যে-কোনো লেখকের ঈর্ষণীয়। কিন্তু এই তরলতা শেষে এক ইচ্ছাতীত অভ্যেসে পরিণত হ'লো; 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'-এও লেখক শক্ত মাটি ছুঁতে পারছিলেন না, শব্দের টানে ভেসে যাচ্ছিলেন। এ যাবৎ তিনি ছিলেন কল্লোল যুগেরই কবি, যদিও সেই গোষ্ঠীর অগ্রগণ্য, এবং অন্যদের চেয়ে নিরলস, রুচিবান ও শিক্ষিত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখনো প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার কি অজিত দত্তের ছিলো না কোনো গুণগত প্রভেদ; তিনি কেবল অন্যদের থেকে বই-এর সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে, কবিতার প্রকরণের পরীক্ষায়, এবং সাহিত্য-বিষয়ে সচেতনতায় ভিন্ন ছিলেন। আর-একটি লক্ষণেও ছিলেন ভিন্ন : সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক প্রেমে। অন্যে যে অনুরাগ জীবনকে দেয়, তা তিনি দিয়েছিলেন মুদ্রিত

অক্ষরকে। এটাই 'মর্মবাণী', কি 'বন্দীর বন্দনা'র আশ্রয়হীন আবেগের কারণ।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণীরমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি;
তাদের মেটাতে হয় বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভে।

পুরানা পল্টনের এই লাজুক, তোৎলা, প্রাদেশিকতা-বিষয়ে অত্যুৎসচেতন যুবকটি কেন লক্ষ বছরের শৃঙ্গারকামনাকে 'বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভে' উপবাসী রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন? কারণ, বিস্তর সাহিত্যপাঠের ফলে, বিশেষত সুইনবর্ন-অর্নেস্ট ডসন প্রমুখ শতাব্দীশেষের রোগপাণ্ডুর কবিদের প্রভাবে, কিশোরটি ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছিলেন :

আছে ক্রুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় ক্লেদলিপ্ত লোভ,
হিরন্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিজ্ঞাসার কুটিল কুশ্রীতা।

আছে এমনকি বোদলেয়ারেরও — অবশ্য, সুইনবর্নের ভাবানুবাদ পরিস্রুত — ছায়া :

নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে
কুৎসিত কঙ্কাল —
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী —
জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি —
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।

এই যুবক — যদিও বারে-বারে নিজেকে ইনি কামুক ও লম্পটরূপে বর্ণনা করেন, এবং সমসাময়িক পাঠিকারা, যাঁর শয়তানির খ্যাতিতে মধুর শঙ্কায় শিউরে-শিউরে উঠতেন — আসলে অতিঅনভিজ্ঞ এবং এঁর বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে এতো আকর্ষণের বস্তুটির দিকে তিনি লজ্জায় ভালো ক'রে তাকানইনি :

তোমার যে-স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সততস্পন্দিত —
দেখেছি অস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ-উন্মাদ,
জানি, তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াষে।

লক্ষ করুন, এমন কি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বীর নয়, 'সদ্যোজাত অধরের শোষণ তিয়াষ' পর্যন্ত এই পূর্ব বঙ্গীয় এর্নেস্ট ডসনের অসহ্য ঠেকছে। তাই ব'লে, তিনি কি ভিরু? তিনি কি জানেন না কাকে বলে পাপ? এই কিশোর অবতরণ করেননি কি নরক বেশ্যালয়ে? বুদ্ধদেবকে কেন আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মারা হয়নি, এই নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন জনৈক পাঠিকা।

আশ্চর্য, এঁর বেশ্যালয়ে গমনের বর্ণনার অতিরঞ্জিত, কৃত্রিম ভাষায় মহিলাটি অনুভব করলেন না কৌতুক! বস্তুত, বড়ো নিরপরাধ এই বালক; অনেক বিশেষণ প্রয়োগ ক'রে সে যে-আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তা কেবল এই সুকুমারমতি কবির মনে হবে নারকীয়। অন্যেরা বালকটির শয়তানিতে ভড়কাবেন তো না-ই, বরং সস্নেহে মুচকি হাসবেন!

আমি সেথা গিয়েছিনু সন্ধ্যাবেলা — প্রলুব্ধ, অস্থির,
আসঙ্গ-বাসনা পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক :
সারঙ্গ-সংগীতস্বনে শিহরিছে উৎসব-উৎসুক
হেমচ্ছটাবিচ্ছুরিত বাতায়ন প্রতি পণ্যস্ত্রীর।
মদ্য ফেনাতীব্র গন্ধ কী-আনন্দে পশিলো রুধিরে!
উজ্জ্বল বসন বর্ণ, বিষবাষ্প উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
কৃত্রিম রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস
আমারে ডাকিয়ে নিলো তরঙ্গিত দেহগঙ্গানীরে।
সেখানে আকাশ নাই, তারা সেথা কখনো ফোটে না,
কটুগন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা।

বাহিরিয়া এনু পথে। কণ্ঠ ঠেলি ঘন্য ন্যক্কার
উঠিছে ব্যাকুল বেগে মর্মান্তিক আত্ম-অপমানে;
বিতৃষ্ণা — বিষাক্ত সর্প — রক্তস্রোতে ক্রূর ফণা হানে,.
নির্মম ঘৃণার কশা মর্মমূলে করিছে প্রহার।
আমি যে করেছি পান ব্যগ্র কণ্ঠে এই উগ্র সুরা —
মোরে দিয়ে বিধাতার এই শুধু ছিলো প্রয়োজন।
স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ-বীভৎস ইন্দ্রিয়মিলন —
নির্বিচারে প্রাণীসৃষ্টি ক'রে থাকে যেমন পশুরা।

বিধাতা ও প্রকৃতি বীভৎস; বালকটি তাহ'লে কোথায় পাবে আশ্রয়? কিশোর বুদ্ধদেব-এর ছিলো একটাই।... বই!

অন্ধকার শূন্যগৃহে জ'মে আছে বিষণ্ণতা-রাশি
পদশব্দ শুনে কেহ সচকিয়া ডাকিলো না নাম,
কেহ আসিলো না কাছে। নিজ হাতে দীপ জ্বালিলাম,
কর্কশ আলোকপাতে গৃহতল উঠিলো উদ্ভাসি।
সহসা পড়িলো চোখে এককোণে মোর গ্রন্থগুলি
সারি-সারি ব'সে যেন আছে সবে মোর প্রতীক্ষায়
কেহ ছিন্ন নগ্ন গাত্র, কেহ দীপ্ত সুদৃশ্য শোভায়,
যত্নহীন উপেক্ষায় কারো অঙ্গে পড়িয়াছে ধূলি।
সম্ভাষিনু তাহাদের সিক্ত চিত্তে সস্নেহ আদরে,
মোর স্পর্শ পেয়ে মূক পত্র হ'লো যে মুখর;

অন্তরঙ্গ বন্ধু যেন; — কত প্রশ্ন, প্রগাঢ় উত্তর,
বহু পুরাতন প্রেম উচ্ছ্বসিত নব বেগ ভরে।
যে কথা কহেনি কভু তারা কিংবা দক্ষিণা বাতাস,
শুনিলাম ইহাদের মুখে সেই উজ্জ্বল আশ্বাস। ...
এ জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারীমাংস চেয়ে সুখকর,
মলাটে ধূলির গন্ধ — মুখমদ্য তার তুল্য নয়,
গ্রন্থের অক্ষয় গ্রন্থি — পরিপূর্ণ প্রবল প্রণয়,
এই প্রেমে সমাসীন স্বপ্নলব্ধ পরমসুন্দর।
হেরিতেছি একসঙ্গে শত শিল্প, সংগীত, কবিতা,
কারুকার্য, চারুকলা, মাধুর্যের নাহি পরিসীমা।
বিধির বিধান লঙ্ঘি মানুষের জ্বলন্ত মহিমা —
ব্রহ্মাণ্ড-অম্বর মধ্যে অনির্বাণ গৌরবসবিতা।
আমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার।
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।

কবির বর্ণনাই যথেষ্ট; আর উল্লেখের প্রয়োজন ছিলো না যে এই অদ্ভুত লাজুক, বইয়ের পেছনে আত্মগোপনকারী যুবকটির কাছে 'এ জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারীমাংস চেয়ে সুখকর/মলাটে ধূলির গন্ধ — মুখমদ্য তার তুল্য নয়।' তাঁর বর্ণনা থেকে নারীটির এমনকি শাড়ির রঙ পর্যন্ত জানা যায় না। সেটা ছিলো 'উজ্জ্বল বর্ণ', তার নিশ্বাস ছিলো 'বিষবাষ্প', তার ঠোঁট 'কৃত্রিম-রক্তিম' এবং এই অতি অসার্থক কুহকিনীর শরীরকে বাঙাল ডন জুয়ানটি কিঞ্চিৎ অপ্রত্যাশিতভাবে 'তরঙ্গিত দেহগঙ্গানীর' ব'লে বসেন। অন্যদিকে, বইগুলির প্রতি কী স্নেহময় তাঁর দৃষ্টি! 'কেহ ছিন্ন নগ্নগাত্র, কেহ দীপ্ত সুদৃশ্য শোভায়,/যত্নহীন উপেক্ষায় কারো অঙ্গে পড়িয়াছে ধূলি।' আমি নিশ্চিত যে সত্যি-সত্যি তরুণ বুদ্ধদেব তাঁর কোনো বই-এর শাদা অঙ্গে 'যত্নহীন উপেক্ষায়' ধুলো পড়তে দেননি। তাঁর কাছে তাঁর বাল্যের প্রাদেশিক পরিবেশের চেয়ে অনেক সত্য ছিলো সাহিত্য, বিশেষত ইংরিজি সাহিত্য। তাঁর আত্মীয়-স্বজন বলতে প্রধান অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সুইনবার্ন, রসেটি, কীটস, শেলি, বায়রনও অতি ঘনিষ্ঠ। অতি নীল রক্তবান তিনি, তাঁর সাহিত্যিক বংশ অতি প্রাচীন।

শাপভ্রষ্ট দেব আমি!
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি শূন্যতায় উড়ি যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লব মর্মর
প্রেমগুঞ্জনের মতো কী অমৃত ঢালে মর্মমাঝে।
রবির গভীর স্নেহে, শিশিরের শীতল প্রণয়ে
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ পবন তারে মৃদু হাস্যে আন্দোলিয়া যায়।

রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ তলে।

এই শাপভ্রষ্ট দেব শেলির প্রমিথিউস ও রবীন্দ্রনাথের বিহঙ্গ। বস্তুত, এই কবিতার প্রায় প্রত্যেকটি পঙক্তি অপর কোনো কবির প্রতিধ্বনি, এবং একটি প্রতিভাবান বালকের বিশ্ব কাব্যে নিমজ্জনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এঁর ওপর যে 'রবির গভীর স্নেহ' পড়েছে তা তো আমরা 'আকণ্ঠ করিতে পান' থেকেই টের পাচ্ছি; এবং ইংরিজি সাহিত্যের যে কোনো পাঠক ধরতে পারবেন যে,

রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ তলে

হচ্ছে কীটস্ এর স্মৃতি ...

And haply the Queen-moon is on her throne
Cluster'd around by all starry Fays;

এবং কীটস হচ্ছেন মিল্টনের। এটাই ইংরিজি সাহিত্যের রাজপথ। এবং রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব-এর পর, এটা বাংলা সাহিত্যেরও অংশ।

৮

এই চেনা পথ দিয়েই চলছিলেন বুদ্ধদেব বসু 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত। ছন্দের বৈচিত্র্য, পঙক্তির হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্য, শাণিত ভঙ্গি, শ্লেষ — ইত্যাদিতে ক্রমশই পারদর্শী হ'য়ে উঠছিলেন। ধীরে-ধীরে লালিত্য, পেলবতা, মাধুর্যের আকর্ষণ কাটিয়ে অর্জন করছিলেন স্পষ্টতা ও গদ্যের কাঠিন্য। 'এ কী/ জোনাকি!/ তুই কখন /এলি বলতো!' যে-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, তারই অন্তর্ভুক্ত "ব্যাং" ও "ইলিশ", সেই আশ্চর্য দুই নাগরিক কবিতা। সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের কবিতায় গদ্যগুণের অভাব বিষয়ে একবার ক্ষীণ অনুযোগ করেছিলেন, কিন্তু "ব্যাং", "মায়াবী টেবিল" কিংবা "ইলিশ"-এ কবিতা শ্রেষ্ঠ অর্থে গদ্যের দ্বারা আক্রান্ত। এগুলির পঙক্তিগুলি কোমল লতানো স্বরবর্ণের মালা নয়, এদের মেরুদণ্ডে আছে ব্যঞ্জনবর্ণের হাড়। এবং এখানে ছবিগুলি স্পষ্ট, দেহময় :

বর্ষায় ব্যাঙের ফুর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক;
উচ্চকিত ঐকতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।

আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চসুর।
আজ কোনো ভয় নেই — বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।

ঘাস হ'লো ঘন মেঘ; স্বচ্ছ জল জ'মে আছে মাঠে।
উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে।

স্পর্শময় বর্ষা এলো; কী মসৃণ তরুণ কর্দম!
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ — সংগীতের শরীরী সপ্তম।

আহা কী চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে!
কাচ-স্বচ্ছ ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরের খোঁজে ...

প্রায় আঙুলে উঠে আসবে, এমন ভেজা-ভেজা জলরঙের মধ্যে, জাপানি প্রথায়, একটা-দুটো অনুপুঙ্খ, চিনে কালিতে বিশেষীকৃত হয়েছে এই কবিতায়। 'ঘাস হ'লো ঘন মেঘ' — ছবিটা ব্যাপক, একটু ঝাপশা; পাঠক অনেক ওপর থেকে বৃষ্টি ভেজা মাঠগুলি দেখছেন; তারপর দৃষ্টি চিলের মতো ছোঁ মেরে নেমে আসে এই চিক্কণকান্তি গায়কের ওপর, যার 'কাচস্বচ্ছ ঊর্ধ্বদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরের খোঁজে'। এই কবিতাগুলি একেকটি নিখুঁত ছোটো-ছোটো রত্ন; কোনো কাব্যমঞ্জুষা কি লহরীতে বিশেষভাবে সংকলনের যোগ্য; এবং, এর মধ্যে একটা চিন্তার শিরদাঁড়া আছে ব'লে, অতি-অনুবাদনীয়। কিন্তু, এখনো বুদ্ধদেবের কবিতা পদাতিক; এখনো তাঁর চিন্তা বাঁধা পথে চলে; তাঁর ব্যক্তিত্ব এখনো মধ্যবিত্ত ও মার্জিত ও কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত; কোনো পাগলামি কি সর্বনাশ তাঁর এখনো হয়নি। তাঁর পঙক্তিগুলি এ-যাবৎ তাই সরল, জটিল অনুচ্ছেদহীন, দ্রুতবহ। অভিজ্ঞতার যে প্রচণ্ড চাপে বাক্য দুমড়েচুমড়ে যায়, অনুচ্ছেদে-অনুচ্ছেদে গ্রন্থিবদ্ধ হ'য়ে যায়, মসৃণ গতি ভুলে ছোটোছোটো বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণি তোলে, তা থেকে এতোকাল কবি যেন সুরক্ষিত ছিলেন। বস্তুত, কেবল বুদ্ধদেব নন; বাঙালি কবিমাত্রেই এমনভাবে সমাজের মধ্যে প্রোথিত, এমন আত্মীয়-পরিবৃত ও পরিবারের মধ্যে গাঁথা, এমন মানসিকভাবে স্থির ও নিরাপদ তাঁর জীবন, যে আধুনিক ইয়োরোপীয় কবির অনিশ্চয়তা, নিঃসঙ্গতা, ভ্রান্তি ও প্রহেলিকা ও নৈরাশ্য, তাঁর অজ্ঞাত। আমাদের কারো-কারো জানালায় যে ওপারের উট একবারও উঁকি দিয়ে যায়নি, এমন নয়। কিন্তু ঐ নাস্তি-র সঙ্গে মুখোমুখির উপযোগী কবিতার ভাষা গ'ড়ে ওঠেনি। কেউ-কেউ নিতান্ত ব্যক্তিগত সমাধান উদ্ভাবন ক'রে নিয়েছেন; জীবনানন্দ আশ্রয় নিয়েছিলেন এক শিশু-ভাষায়। অপর দিকে, নাস্তি যাঁর কবিতায় প্রায় একটা স্বাক্ষর-শব্দ, সেই সুধীন্দ্রনাথের বাক্যগুলি ছিলো দীর্ঘ ও সরল সম্মুখ-গতিময়। তিনি তাঁর ভাষায় বুদ্ধিশাসিত গড়ন অবিকৃত রেখে তার পৃষ্ঠভাগে কেবল বসিয়ে দিয়েছিলেন বিশেষ-অর্থবহ, কিন্তু অপরিচিত শব্দ; এবং তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি, বৈপরীত্য এবং সংঘাত — তাঁর আকরিক 'অর্কেস্ট্রা' গ্রন্থে — ছন্দের বৈচিত্র্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতাকে তিনি যতোই চূড়ান্ত ব'লে প্রচার করুন, সুধীন্দ্রনাথের ভাষার প্রজ্ঞা ভাঙেনি। আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতা-ভাষা বহুমুখী, তির্যক, অনিশ্চয়, আণবিক; জাতির সমতল, মসৃণ, ফাটলহীন ভাষাকে আধুনিক কবি চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছেন; এর জন্য নিজেকে ক্ষয় করতে হয়েছে, ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির অলৌকিক তীক্ষ্ণতা অর্জন করার জন্য তাঁর সাধারণ চেতনাকে দীর্ণ করতে হয়েছে, র‍্যাঁবো-র সেই বিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী, বহু সাধনায়, ('through a systematic derangement of the senses') এটা সম্ভব করেছেন। কিন্তু বাংলাভাষায় এই প্রক্রিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও ভীরুভাবে ঘটেছে, এবং এখনও আমাদের মাতাল নৌকো ঘাটে অষ্টাদশ শতকী কাছি দিয়ে বাঁধা। যিনি বাংলা কবিতাকে মালার্মে কি রিলকে-র তুল্য ঘনত্ব ও বহুমুখিতা দান করেছেন তিনি 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-

এর বুদ্ধদেব বসু। বাংলাভাষার এটি একটি সীমান্তশীলা, একটি দিকচিহ্ন। 'রাত তিনটের সনেট', কি 'স্মৃতির প্রতি'-র চেয়ে অধিক দূর কোনো বাঙালি কবি অগ্রসর হননি। ঠিক, 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর এখনো বেশি পাঠক নেই; একদা যেমন 'সাতটি তারার তিমির' কি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' অনেকের দুর্বোধ্য, কি অকাব্য, মনে হয়েছিলো, তেমনি আজো এই কবিতাগুলিতে প্রবেশ করেছেন কেবল দু-একজন অগ্রসর কবি-পাঠক। কিন্তু যাঁরা একবার প্রবেশ করবেন, তাঁদের সামনে খুলে যাবে এক খনি, যার খাদের পর খাদ দিয়ে ক্রমশই অর্থের গভীরে নেমে যাবেন পাঠক। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এক চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কবিতা; সেই বিচ্ছেদ এখন বিশুদ্ধ কবিতায় পরিণত হয়েছে; ব্যক্তিগত আবেগ, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য এখন সার্বিক ও চিরন্তন হ'য়ে গেছে। প্রথম কবিতা থেকে শেষ পর্যন্ত, বাংলা কবিতায় এ এক নতুন কণ্ঠস্বর। অলৌকিক — কারণ এর বক্তা না-বুদ্ধিজীবী, না-বাবু, না-বাঙালি, না-বাঙাল — তিনি এক মানব, যে সময় ও দেশের অতীত এক চৈতন্যর বিন্দুতে পৌঁছেছে।

স্মৃতির প্রতি : ১

তোমাকেই দেবী ব'লে মানি। কিছু নেই, যা তোমার নয়।
তাই তো তোমার ঘুম, যাকে বলি আরম্ভ, কারণ;
চলে সে গোপনে, তার দিগন্তেও নেই জাগরণ;
কিন্তু যদি আধেক তাকিয়ে তুমি পাশ ফেরো, ফুটে ওঠে
ফুলের বিস্ময়,

পৃথিবীর মাটিরে ক'রে চুমো খায় উজ্জ্বল আঙুর।
তাই পট শূন্য প'ড়ে থাকে, পাথর নিঃসাড়, বীণা
শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না-শেখাও
সাগর-যাত্রা, যুযুধান রাত্রি আর দিনের বন্ধুর

পথ পিছে ফেলে, নিয়ে যাও ত্রিকালের শান্ত সমতলে,
দূর থেকে আরো দূরে, জন্মান্তরে, প্রাগৈতিহাসিক
নীলিমায় — যেখানে, মাতার গর্ভে, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলে

মানবের ভাগ্য আর অফুরান ঐশ্বর্য তোমার।
আঁধারে তোমার স্বত্ব, কিন্তু তাই আলোর অধিক;
তুমি যা অলস হাতে ফেলে দাও, কানাকড়ি মূল্য নেই তার।

এই কবিতাগুলিকে যাঁদের কূট ব'লে মনে হয়, তাঁরা 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-ভুক্ত "আরোগ্যের তারিখ" কবিতাটি প'ড়ে নিতে পারেন, সেখানে কবিজীবনের এক ক্রান্তীয় ঘটনার বিবরণ আছে। কিন্তু 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ সেই ঘটনাটি কেবল পশ্চাৎপট, সেই পুনঃপুনঃ উল্লেখিত বিচ্ছেদ। এই গ্রন্থটিতে কবি তাঁর সত্তার চূর্ণবিচূর্ণ অংশগুলি কবিতার অমর, অটল সংযমের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন — যেন বরফের চাঁই-এর মধ্যে জমানো ভাঙা কাচের গ্লাস। এরকম মিতকথিত সর্বনাশের কবিতা আমাদের ভাষায় আর নেই। এই গ্রন্থটিতে এসে,

অবশেষে, বুদ্ধদেব বসুর চতুর, ফ্যাশনেবল, সার্থক, প্রচ্ছদ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো। তিনিও এক হতভাগ্য, নগ্ন প্রাণীতে পরিণত হলেন। এবং এখন তাঁর স্বজাতীয়রা হ'লো যে-কোনো নির্বাসিত জীব।

কোনো কুকুরের প্রতি

আমাকে দিও না দৃষ্টি। বিচ্ছেদে ভ'রে আছে মন
যত গাঁথি মালা, তত স'রে যায় দূর আর কাছে।
বহুদিন-প্রতিশ্রুত আজ আর কালের চুম্বন
অবশেষে ঠেকে যায় স্বচ্ছ এক ক্ষমাহীন কাচে।

বরং কখনো যারা কাগজের নৌকোয় চ'ড়ে
দেয়নি সাগরপাড়ি, বেছে নাও তাদেরই কাউকে
পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত। গন্ধের অন্ধকারে ঢুকে
ঘুমোবে, দুপুরবেলা, মেয়েদের হাতের আদরে।

যাবে না? তবে কি ভাবো সমানুকম্পনে
উঠবো হঠাৎ বেজে আমি এক অদ্ভুত বাঁশরি,
এঁকে দেবো তোমার হরিণ-চোখে স্মরণের ছবি?

... কেবল অর্ধেক ঠিক। জানি আমি, স্বর্গের অপ্সরী
তুমি, শাপভ্রষ্ট। কিন্তু সেই শাপের মোচনে
আমার আসেনি ডাক। এখনও যথেষ্ট নই কবি।

ভুল। এতোদিনে এসেছে ডাক। বুদ্ধদেব এই অপ্সরীর শাপমোচন করেছেন। এখন বুদ্ধদেব বসু হয়েছেন শুধু যথেষ্ট নয়, বাংলাভাষার ঐতিহ্যের এক প্রধান কবি। এবং প্রধান কবি শুধু নয়, তিনি এখন এক বিধ্বস্ত মানব, এক সর্বস্বান্ত প্রেমিক। বিচ্ছেদের, অপেক্ষায়, ব্যবধানের প্রেমের অলৌকিক অতৃপ্তির কবি হিশেবে তাঁর স্থান চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের পাশে।

মানুষ বুদ্ধদেব



আমাদের সাম্প্রতিক সমস্যাজটিল ও বিবর্ণ জীবনের মধ্যে তুই আর জ্যোতি যে আনন্দে আছিস তা ভাবতে আমার ভারি ভালো লাগছে। কিন্তু তোদের 'কেশমারি'র ব্যাপার শুনে বড্ড দ'মে গেছি। কলকাতার জোচ্চোরেরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই —এই ত্রিশ বছরে কত রকমই যে শুনলুম! এক-এক সময়ে এক-একটা উজিয়ে ওঠে, একটা কায়দা চেনা হ'য়ে যাবার পরেই অন্য কায়দা কারো-না-কারো মগজে চাড়া দেয় — এই রকম প্রতিভা অন্যান্য দেশে ব্যবহার হয় কলকব্জার উদ্ভাবনে; তবে সেখানে আবার সশস্ত্র গুণ্ডামির চরম চেহারা দেখে এই ভেবে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা

বিদেশ থেকে লেখা টুকরো চিঠি

পাওয়া যায় যে 'কেশমারি'-শিল্পীরা অন্ততপক্ষে প্রাণে অথবা হাতে মারে না।

মানুষ বুদ্ধদেব

বিদেশ থেকে লেখা টুকরো চিঠি

১৬ জানুয়ারি, ১৯৬৪
ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানা

আমাদের সাম্প্রতিক সমস্যাজটিল ও বিবর্ণ জীবনের মধ্যে তুই আর জ্যোতি যে আনন্দে আছিস তা ভাবতে আমার ভারি ভালো লাগছে। কিন্তু তোদের 'কেপমারি'র ব্যাপার শুনে বড্ড দ'মে গেছি। কলকাতার জোচ্চোরেরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই — এই তিরিশ বছরে কত রকমই যে শুনলুম! এক-এক সময়ে এক-একটা উজিয়ে ওঠে, একটা কায়দা চেনা হ'য়ে যাবার পরেই অন্য কায়দা কারো-না-কারো মগজে চাড়া দেয় — এই রকম প্রতিভা অন্যান্য দেশে ব্যবহার হয় কলকব্জার উদ্ভাবনে; তবে সেখানে আবার সশস্ত্র গুণ্ডামির চরম চেহারা দেখে এই ভেবে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাওয়া যায় যে 'কেপমরি'-শিল্পীরা অন্তত পক্ষে প্রাণে অথবা হাতে মারে না।
...একটা সুখবর — প্রদীপকে তার মাস্টার মশাই এতদিনে থীসিস লেখার অনুমতি দিয়েছেন। প্রদীপের মাল-মশলা সবই তৈরি ছিল — মনে হচ্ছে আগামী গ্রীষ্মের আগেই ওর ডিগ্রি হ'য়ে যাবে। রুমির আরো বছর খানেক লাগবে — এই সময়টা ওরা কোন শহরে থাকবে এখনো অনিশ্চিত। আগামী জুনের পরে অমিয়রও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমরা অনেকগুলো মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে ভেসে চলেছি — কিন্তু তা নিয়ে আর চিন্তা করি না; প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন চুকিয়ে দিয়ে, রাত্তির দুটো নাগাদ ঘুমিয়ে সাতটায় আবার জেগে উঠছি। ব্লুমিংটনে শীত কম, দিনগুলো বেশির ভাগই রোদ্দুরে, আকাশে ও তুষারে পরিব্যপ্ত, এমন ঝকঝকে ঠাণ্ডা উজ্জ্বলতাকে আগে কখনো দেখিনি। — দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবরে চিন্তিত আছি। স্থানীয় পত্রিকায় চার লাইন মাত্র খবর থেকে কিছুই বোঝা গেল না — সত্যিকার ব্যাপার কী জানাস, কলকাতা আবার উগ্র হ'য়ে ওঠেনি তো? তোরা সাবধানে থাকিস।

রেকর্ড দুটো পৌঁচেছে — রুমি খুব খুশি।

ব্রুকলিন

ব্রুকলিন, ন্যুইয়র্ক
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

কাল সন্ধেবেলা ন্যুইয়র্কে পৌঁচেছি, এবং পৌঁছোনোমাত্র বাড়ি-বদলের হাঙ্গামা শুরু হ'য়ে গেছে। ব্রুকলিন কলেজের দু-জন অধ্যাপিকা আমাদের জন্য যে ফ্ল্যাটটিস করেছিলেন, তার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা — আর দৃশ্যটা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। বারো তলায় ফ্ল্যাট, জানালার বাইরে উপসাগর, বন্দর, দুটো-তিনটে ছড়ানো দ্বীপ, দ্বীপধারিণী বিখ্যাত তরুণীকে কোনাকুনি দেখা যায়, আর ঠিক চোখের সামনে ম্যানহাটানের একটি স্কাইস্ক্রেপার পুঞ্জ — ছুচের মতো সরু শিখা মাথায় নিয়ে এম্পায়ার স্টেটে বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। জলের উপর প্রকাণ্ড ব্রিজ, স্টীমারের যাওয়া-আসা — ইত্যাদি। আজ সকাল থেকে অবিরাম বরফ পড়ছে, জল আকাশ ঝাপসা হ'য়ে মিশে গেছে দিগন্তে — মাটির উপরে গাঢ় শাদা আস্তরণ সূর্যহীন দিনকে আলো দিচ্ছে। ব্লুমংটনের নীল আকাশ আর প্রচুর রোদ্দুরের পরে আজ এক খাশ ন্যু ইয়র্কের দিন।

কিন্তু শুধু দৃশ্য দিয়ে "পেট ভরে না" — আক্ষরিক অর্থেও না, ভাবার্থেও না। এই ফ্ল্যাটে রান্নাঘর নেই, শোবার ঘরেই রেফ্রিজারেটর আর দুটো হীটার বসিয়ে রেখেছে — তার সাহায্যে যথোচিতভাবে রান্না হবার উপায় নেই। ঘর দুটো ছোটো, বাথরুমে কল খুললে মেঝে ভিজে যায়, অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রেও ফ্ল্যাটের দরজা খোলে না — এই ধরনের অনেক ত্রুটি আমার পৌঁছনোমাত্র ধরা পড়েছে। ব্লুমিংটনের আধুনিকতম ফ্ল্যাটের পরে এখানে এসে কাল বড্ড মুষড়ে পড়েছিলুম দু-জনেই — আজ ততটা খারাপ লাগছে না, কিন্তু এ দৃশ্যসর্বস্ব ফ্ল্যাটে থাকবো না, সেটা নিশ্চিত — হয় এই হোটেলেই অন্য ফ্ল্যাটে যাবো, নয়তো অন্যত্র।...

চেখভ

ব্লুমিংটন ইলিনয়
৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫

... টেক্সাস থেকে বাস-এ আসতে-আসতে চেখভের সবগুলো নাটক প'ড়ে ফেললাম — সেই ছেলেবেলার পরে আর পড়িনি। আশ্চর্য ভালো লাগলো। দৈব বা পাশবিক প্রতিভা দেখেছি, কিন্তু মনে হয় অন্য কারো লেখায় এমন সৌকুমার্য পাইনি (যাকে ইংরেজিতে বলে delicacy) — এমন মৃদু ও কোমলভাবে হৃদয়কে ছুঁয়ে যান যে স্পষ্ট ব'লে বোধ হয় না — অথচ বহুক্ষণ ধ'রে অনুরণন চলতে থাকে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিনা-প্লটের নাটক চেখভই বোধহয়

প্রথম লেখেন — বুড়ো আরিস্টটলের দাড়ি ধ'রে নেড়ে দেয়া যেন, একজন য়োরোপীয়ের পক্ষে এটা কম কৃতিত্ব নয়। অবশ্য বিভিন্ন নাটকের চরিত্রগুলো প্রায় বিভিন্ন নামে একই মানুষ — চেখভের পরিসর খুব ছোটো — সংলাপে মুদ্রাদোষের ব্যবহারও একটু বেশি — কিন্তু এই সব দোষ ছাপিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায় তিন বোনের ব্যর্থ জীবন, আর চেরি গাছ কেটে ফেলার শব্দ। 'Uncle Vanya' নাটকটা আমার একেবারেই মনে ছিল না — একটু ভিন্ন ধরনের — শেষ অঙ্কে মামাভাগ্নিকে (শস্তা আশাবাদ সত্ত্বেও) বড়ো ভালো লাগলো। কত ভাগ্য আমার যে এখনো কিছু অপঠিত বা বার বার পাঠযোগ্য বই আছে — কী রকম মনটা ভ'রে ওঠে একটা ভালো জিনিশ পড়লে। নিজের সুখদুঃখ ছোটো মনে হয়, যেন হঠাৎ অনেক দূরের দিকে একটা জানালা খুলে যায়। তুই যেটা অনুবাদ করেছিস সেটা নিশ্চয়ই 'The proposal' — একাঙ্ক প্রহসন? কোনো-একসময়ে 'তিন বোন' করতে পারিস (রুমি ফেরার পরে) আমাদের জীবনের সঙ্গে এতটা মেলে যে বাঙালি নামে ভাবানুবাদও করা যায়।

'মেতে থাকা'র প্রয়োজনীয়তা

ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা

৫ মার্চ ১৯৬৫

কলকাতা থেকে যত চিঠি আসে তার মধ্যে একমাত্র তোরগুলোতেই আশা, আলো ও আনন্দের স্পর্শ পাওয়া যায়। এত সব বিপর্যয় পেরিয়ে তুই আর জ্যোতি যে আনন্দিত ও উৎসাহিতভাবে দিন কাটাচ্ছিস, এটা আমার মনের মধ্যে একটা গোপন ও অস্ফুট সুখের মতো কাজ ক'রে যাচ্ছে। তোর স্বভাবে আমারই মতো বায়ুর প্রাদুর্ভাব বেশি। (ভাগ্যক্রমে জ্যোতিরও তা-ই) — এই যে নানা জিনিশ নিয়ে মেতে থাকা, এরই জন্য আমরা পরকে আপন করতে পারি, জীবনের পরিধি বিস্তৃত হয়, সেই সনাতন শত্রু নির্বেদও এরই কাছে হার মানে। সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে শম্ভু আবার প্রফুল্ল ও উদ্দীপিত হয়েছে — এই দু-বছরের মধ্যে মাঝে-মাঝেই ওকে মনে পড়েছে আমার, ওর কথা অনেকের কাছেই জানতে চেয়েছি, তুই প্রথম সুসমাচার শোনালি। "বিপন্ন বিস্ময়" নাটক হ'তে পারে না তা নয়, কিন্তু বইটা অসমাপ্ত — শম্ভু যদি অপেক্ষা করতে রাজি থাকে, শেষ অঙ্কটা আমি ফিরে গিয়ে লিখতে পারি। ...

... শম্ভুকে আজ একটা আধুনিক নাটকের বই পাঠালাম ২০২-এর ঠিকানায়। ওকে বলিস, ও যদি আমার ম্যানেজার হ'তে রাজি হয়, তাহ'লে আমি ফিরে গিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করি। ...

ফ্রিস্কোতে কবিতা পাঠ

ব্লুমিংটন, ইলিনয়
১১ এপ্রিল '৬৫
রাত্রি

সিয়াটল সান ফ্রানসিস্কো ঘুরে কাল ফিরেছি। দুটো জায়গাতেই ইংরেজি অনুবাদে বাংলা কবিতা পড়লাম — সান ফ্রানসিস্কোতে একই দিনে দু-বার, সেখানকার শ্রোতারা নিঃসাড় ছিল না দেখে আশা হচ্ছে আমাদের অনুবাদের চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হবে না। এক বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে জ্যোতি ও সুনীল পর্যন্ত সকলেরই কিছু-কিছু নমুনা প'ড়ে শোনালাম, আমার পক্ষে (মনে হয় অন্যদের পক্ষেও) সেটা খুব তৃপ্তিকর হয়েছিলো। কর্তব্য শেষ ক'রে নবনীতা অমর্ত্যর সঙ্গে চ'লে এলাম বাকালিতে — ওদের বাড়িতে দু-দিন খুব জমাট বাঙালি আড্ডা দেয়া গেল। আমেরিকার দুই প্রান্তে দুই নগর — ন্যুয়র্ক ও সান ফ্রান্সিস্কো, এই দুটোই সবচেয়ে জীবন্ত ও আধুনিক — আমি এ-যাত্রায় অধিকাংশ সময় যে-অঞ্চলে কাটিয়ে গেলুম, পাপ্পা অমিয় এখন যেখানে আছে, এবং তোরা এসে যেখানে থাকবি — সেই মধ্যপশ্চিম এ-দেশের মধ্যে সবচেয়ে রক্ষণশীল, যদিও এখানে পরিবর্তনের হাওয়া পৌঁছয়নি তা নয়। ন্যুয়র্কের সঙ্গে আমার প্রেম চলছে বহুদিন ধ'রে — সেখানে পৌঁছনোমাত্র আশ্চর্য চেনা ও আপন লাগে; যদি এ-জন্মে আমার কিছুমাত্র সুকৃতি জ'মে থাকে, পরজন্মে যেন এমন অবস্থায় পড়ি যাতে কলকাতা ও ন্যুয়র্কের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে জীবনটা কেটে যায়। ...

... আজকের তারিখটা এখানে প্রথম বসন্তের দিন — এতদিনে ওভারকোট ত্যাগ করা গেল, ঘাস অকস্মাৎ সবুজ হয়েছে, আর সন্ধ্যার পরে দেখছি চাঁদের আলো প্রায় বাংলার মফস্বলের মতো উজ্জ্বল। গেল বছর এই সময়ে ছিলুম ব্রুকলিনে — মনে পড়ে সকালে যখন কাগজ কিনতে বেরোতাম, কী আশ্চর্য ভালো লাগতো রোদ্দুর আর স্নিগ্ধ বাতাস — প্রকৃতির প্রসাদের সঙ্গে মানবজীবনের তীক্ষ্ণতা মিশে এমন এক উদ্দীপনা দেয় অন্য কোথাও আমি পাইনি। ন্যুয়র্কের জন্য আমার নস্টালজিয়া অচিকিৎস্য। ...

কলকাতা থেকে

ডারিনা সিলোনে
....

কলকাতা ২৯
৮/৩/৬৬

রোম থেকে, প্যারিস থেকে লেখা তোদের সব চিঠি পৌঁচেছে, কিন্তু তার পরে এখনো কোনো বার্তা পাইনি। অনুমান করছি, ইংলণ্ডেও তোদের সময় খুব ভালো কেটেছিলো, আর এতদিনে তোরা শিকাগোতেও পৌঁছে গেছিস। তবু, খবর না-পাওয়া পর্যন্ত মনের তলায় অশান্তি

থেকে যায়।

মিসেস সিলোনি যে তোদের এতদূর পর্যন্ত আপ্যায়ন করবেন এটা আমারও আশাতীত ছিল — আমাদের সঙ্গে কতটুকুই বা তাঁর পরিচয়, আর আমার বই প'ড়ে মুগ্ধ হবারও তাঁর উপায় নেই। জীবনে এগুলোই হচ্ছে বিশুদ্ধ ভাগ্যের দান, আমি যে এর জন্য মনে-মনে কত কৃতজ্ঞ বোধ করি তা ভাষায় বলা যায় না। শিকাগোতে গুছিয়ে বসার পর শ্রীমতীকে একটা চিঠি লিখিস (ভাগ্যিশ তোর চিঠি লেখায় আলস্য নেই), আমাদের কথাও লিখে দিস তাতে।

সত্যি বলতে, আমি আরো বেশি আনন্দিত হয়েছি ঝর্ণা তে'দের আন্তরিকভাবে আদর-আপ্যায়ন করেছে ব'লে। সম্প্রতি আমার কয়েকটি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর ব্যবহারে আমার 'জীবনবিশ্বাস' আরো কিছুটা ট'লে গেছে, আমার পূর্ববর্তী পরিবেশের মধ্যে যেন কারো কাছেই কোনো প্রত্যাশা নেই; সেই অবস্থায় ঝর্ণার খবর আমার মনে যেন বসন্তের বাতাস বইয়ে দিলো ...

... হঠাৎ সেদিন স্টেটসম্যানে জ্যোতির ফিল্ম-রিভিয়ুর বিরুদ্ধে এক কলামভর্তি চিঠি বেরিয়েছে — সবশেষে একটা অতি মৃদু সমর্থনসূচক চিঠি। 'I hope he enjoys his holiday so much that he never comes back' — এই হ'লো অধিকাংশ চিঠির বক্তব্য। ... নিজেদের একজন লোকের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে এতগুলো চিঠি এ কি কোনো দেশেই সাংবাদিক সৌজন্য সম্মত? আর দৈনিকপত্রে ফিল্মসমালোচনা এমন কিছু জরুরি ব্যাপারও নয়, যার জন্য স্টেটসম্যানের মতো পত্রিকা (যেখানে জীবনানন্দর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয় না, এবং তার প্রতিবাদ ক'রে আমি যে চিঠি লিখেছিলাম তাও ছাপা হয়নি — সম্পাদক আমাকে লিখেছিল 'Of course we cannot print it' – 'of course' কেন?) — সেই পত্রিকা আস্ত এক কলম জায়গা নষ্ট করতে পারে। জ্যোতি যেন দ্যাখে চিঠিগুলো — তারিখ বোধহয় ৪ঠা মার্চ।

এদিকে সেই 'বিবর' নিয়ে টাইনিকেও বেশ নাজেহাল হ'তে হ'লো কিছুদিন। শুধু কলকাতায় "বিক্ষোভ" নয় — দিল্লিতে অনেক চিঠি গেছে এর বিরুদ্ধে, বেনামি এবং স্বাক্ষরিত চিঠি — কর্তৃপক্ষ জবাবদিহিও তলব ক'রে ছিলেন। টাইনি অবশ্য সসম্মানে উৎরে গেছে — কিন্তু আশঙ্কা হয় এর পর থেকে ওকে অনেক বেশি সতর্ক হ'য়ে চলতে হবে। ...

কবিতা-ঘন্টিকী

কলকাতা ২৯

৫ মে ১৯৬৬

তাহ'লে আমার দুই দৌহিত্রই আমেরিকায় এবং বৈশাখ মাসে জন্মালো! আমেরিকা ভালোই, কিন্তু আজকাল আর বৈশাখ মাসকে আমি "সবচেয়ে ভালোবাসি" না — রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্র-ভক্তেরা ওটাকে পচিয়ে দিয়েছেন, যামিনী রায়ের পয়লা বৈশাখেও সেই একই ন্যাকামি চলছে। (ভাগ্যে বাঙালিরা এখনো আবিষ্কার করেনি যে শেক্সপীয়রও বৈশাখ মাসে জন্মেছিলেন!) কলকাতায় এবার বৈশাখ মাসে মারাত্মক গরম, আসন্ন পঁচিশে তারিখে রবীন্দ্র-স্মরণী নিয়ে ...

প্রমুখ মনীষীদের "বিক্ষোভ প্রদর্শন" আর তরুণ "কবিদের" "কবিতা"র দৈনিক, 'কবিতা' ঘুন্টিকী (ঘন্টায়-ঘন্টায় বেরোবে, বাৎসরিক ২,০০০ টাকা চাঁদা!), চন্দননগরে "কবিতা"র দৈনিক, সুন্দরবনে "কবিতা"র পাক্ষিক — মনে হয় জ্যোতির হিশেবে ভুল হয়েছিল, এই মুমূর্ষু মহানগরে বেশ্যাদের চেয়েও বর্তমানে বোধহয় "কবি"র সংখ্যা বেশি। আর কোন দেশে 'কবিতা' এমন বিসূচিকার মহামারীর মতো প্রাদুর্ভূত হয়, বা রোমকূপ থেকে ঘামের মতো, অথবা সুস্থ যুবকের বৃক্ক থেকে মূত্রের মতো এমন অনর্গলভাবে বেরিয়ে আসে, তা কি তোমরা বলতে পারো? (দোহাই তোমাদের, এই খবরটা 'টাইম' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়ো না — কিন্তু ওরা বোধহয় নিজেরাই তার ব্যবস্থা করছে, শুনছি 'কবিতা'-দৈনিকের কয়েকটা সংখ্যা "ইংরেজি"তেও বেরোবে— আমেরিকায় ওদের অ্যান্থলজি বেরোলো ব'লে!)

আমি আশীর্বাদ করি — আমার দুই দৌহিত্র চাঁদে যাক, বা আন্দামানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক, বা হিমালয়ে আলুর ফসল ফলাক, অথবা হোক প্রথম বাঙালি ন্যাকামি-মুক্ত চিত্রকর — কিন্তু কবিতার ক-অক্ষর কখনো যেন তারা না জানে!

নিশ্চয়ই এতদিনে মিমি স্বাভাবিক উদর ও ততোধিক প্রফুল্ল মুখশ্রী নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে, তিতির বুয়ানের জ্বরও আর নেই, এবং নবজাতকটিও শীতের মাচায় কুমড়োর মতো দর্শনীয় ও মনোহরভাবে দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিতিরের সঙ্গে মাসির আর বুয়ানের সম্ভাষণটা কী-রকম হ'লো, শিশুটির প্রতি তার মাতৃভাব ইতিমধ্যেই উচ্ছল কিনা — রুমির সঙ্গে জ্যোতি কী-ধরনের ইয়ার্কি চালাচ্ছে, এই সব কিছুর বিস্তৃত বিবরণ সমেত একটা চিঠির প্রত্যাশা করছি।

কাল সন্ধ্যায় প্র. ব. তাঁর নাকতলার ছাতে আমাদের একটা পূর্ণিমা পার্টি দিলেন, মেঘের জন্য জ্যোৎস্না তেমন উজ্জ্বল হয়নি, কিন্তু মৃদুমন্দ বাতাস ছিল — সময়টা নেহাৎ মন্দ কাটলো না। অধিকাংশ বই ও বইয়ের আলমারি সরানো হবার পর ২০২-এর ঘরটাকে বিধবার মতো দেখাচ্ছে — এখন আর নাকতলায় বদলি না-হ'য়ে উপায় নেই, পয়লা জুন থেকে আমাদের ঠিকানা P-364/19 Netaji S.c.Bose Road, Calcutta-47. মে-র শেষ সপ্তাহ থেকে ঐ ঠিকানায় চিঠি প্রেরিতব্য। এ-মাসের শেষে ২০২-এ আমাদের উনতিরিশ বছর পূর্ণ হবে, যকন এসেছিলাম আমার বয়স তখন উনতিরিশ, মিমির দেড়, আর প্র. ব. তখন বাইশ বছরের ছুকরি।...

টাকার জন্য লেখা

কলকাতা ৪৭
১৩/৭/৬৬

তোকে নিশ্চয়ই লিখেছিলাম যে পাপ্পা 'দেশ'-এ আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ে একটা সিরিজ লিখছে, জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রতি সংখ্যায় বেরোচ্ছে। ভালোই লিখছে, টাকা রোজগারের চাড় থাকলে যে অনেক সময় অনেক কাজ হ'য়ে যায়, অর্থাভাব যে অবিমিশ্র অমঙ্গল নয়, আমি তা জীবন ভ'রে দেখে আসছি। পাপ্পার বেলাতেও তার প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রতি লেখায় পঁচিশ টাকা ক'রে পাচ্ছে, এখন ওর হাত খরচটা চ'লে যায়। ওর গল্পটা এখনো বেরোয়নি।...

নতুন পত্রিকার অভাব

কলকাতা ৪৭
৮/১২/৬৬

তোর মিজরি-ফেরতা চিঠি দুদিন আগে পেয়েছি। সেই বামন-সংক্রান্ত গল্পটা আমারই মুখে শুনেছিলি; আমি ওটা বহুকাল আগে পড়েছিলাম অল্ডাস হাক্সলির প্রথম উপন্যাস 'ক্রোম ইয়েলো'তে; এক বামন-দম্পতির একটি স্বাভাবিক পুত্র জন্মালো; ছেলে ছ-ফুট লম্বা হ'য়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে যখন বাড়িতে দাপাদাপি শুরু করলে তখন তার পিতামাতা বাথটবে গরম জল ছেড়ে ব্লেড দিয়ে শিরা ছিন্ন ক'রে আত্মহত্যা করলে — এই হ'লো সেই গল্প। এটা 'ক্রোম ইয়েলো'র উপন্যাসের অঙ্গ নয়, স্বতন্ত্রভাবে খুব সংক্ষেপে বলা। ...

জ্যোতির নাটক 'কৃত্তিবাস'-এ ছাপার জন্য সুনীল আগ্রহ করছে — জ্যোতির মত থাকলে জানাস, আমি তাহ'লে বানান শুধরে সুনীলের হাতে দিয়ে দেব। বাংলাদেশে পত্রিকার অভাব এখন নিদারুণ, আমি বিরামবাবুকে খুব তাতাচ্ছি একটা-কিছু বের করার জন্য, কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় ভরসা পাওয়া শক্ত।

একটি ছাড়া, ওপরের চিঠিগুলি
কবির জ্যেষ্ঠকন্যা মীনাক্ষীকে লেখা।

বুদ্ধদেব বসু-র গ্রন্থপঞ্জি

(কাল'নুক্রমিক)

স্বপন মজুমদার

বুদ্ধদেব বসুর মতো যে-লেখক নিয়ত সৃষ্টিশীল তাঁর এ-ধরনের গ্রন্থপঞ্জি অসম্পূর্ণ হ'তে বাধ্য। অন্যপক্ষে স্বয়ং লেখকের অনুমোদন বা সংশোধনের ফলে এ-ধরনের কাজ নির্ভরযোগ্য হ'য়ে ওঠার বিরল সুযোগ পায়। গ্রন্থগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখছি নিজেকে। সম্পাদিত পত্রিকার এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনার তালিকাও দেওয়া গেলো না। স্কুল-পাঠ্য বইগুলিও আপাতত বাদ গেলো। এই পঞ্জি সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে কখনো প্রকাশ করা সম্ভব হ'লে, আশা করি ক্রটিগুলি দূর করা যাবে।

কবিতাভবন প্রকাশিত 'বুদ্ধদেব বসু-র সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী (১৯৩০-৪৫)', এবং 'রণন' ১ম বর্ষ সংখ্যায় শ্রী সূর্য মিত্র সংকলিত গ্রন্থপঞ্জি ব্যবহার ক'রে উপকৃত হয়েছি। যে-সব গ্রন্থাগার এই সংকলনকর্মে সহায়তা করেছেন তার মধ্যে বালিগঞ্জ ইনস্টিট্যুট ও বয়েজ ওন লাইব্রেরি অ্যাণ্ড ইয়ং মেন্‌স্ ইনস্টিট্যুট-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। গ্রন্থাগারে পাইনি এমন বহু বই দেখতে দিয়েছেন লেখক স্বয়ং, শ্রী নরেশ গুহ এবং শ্রী অলোক রায়। গ্রন্থাগারিক শ্রী দিলীপ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর রচনার প্রতি অনুরাগবশত তথ্য পরীক্ষায় সহায়তা করেছেন। এঁরা সবাই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রথম প্রকাশের পর 'খ', 'গ' দিয়ে সংস্করণভেদ নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে কোনো- কোনো তথ্যের উল্লেখ না-থাকলে ধ'রে নিতে হবে সেগুলি পূর্বতন সংস্করণের অনুগামী। নিছক শিশুপাঠ্য বই বুদ্ধদেব বসু কখনো রচনা করেননি। তবে শিশুরা যে-সব গ্রন্থের উপলক্ষ সেখানে (*) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। — সংকলক।

১. **মর্ম্মবাণী** (কবিতা) রচনাকাল : ১৯২৩-৪। (৮) + ৯৬ পৃ ১৬ ক্রাউন। উৎসর্গ : দাদামহাশয়। প্রকাশকাল অমুদ্রিত। ভূমিকার তারিখ : ১২ই আশ্বিন ১৩৩১। প্রকাশক : গঙ্গাচরণ দাস। ঢাকা। দশ আনা।

২. **সাড়া** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯২৮-২৯। (৮) + ২২১ পৃ। ১৬ ক্রাউন। প্রচ্ছদ : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। উৎসর্গ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩০। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্। দু টাকা।

খ. পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৪৭। (১০) +২২৪ পৃ। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রচ্ছদ : সৌরেন সেন। কবিতাভবন। চার টাকা।

গ. পরিমার্জিত সংস্করণ : ২৮ পৌষ ১৩৬৬। (৮) + ১৩৬ পৃ। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : প্রথম সংস্করণের অনুসরণে বিভূতি সেনগুপ্ত। গ্রন্থম্। তিনটাকা।

৩. **অভিনয়, অভিনয় নয়** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৩৩৪-৩৬। (১২) +২৫২ পৃ। ১৬ ক্রাউন। জ্যাকেটের ছবি : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। উৎসর্গ : ভৃগুকুমার গুহ ও সুধাংশু দাশগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩০। মুখবন্ধের তারিখ : ৯.৩ ১৯৩০। চতুরঙ্গ প্রকাশালয়। তিন টাকা।

খ. গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্। তিন টাকা।

৪. **বন্দীর বন্দনা** (কবিতা) : রচনাকাল ১৯২৬-২৯। (৮) + ৫৮ পৃ। ৮ রয়্যাল। প্রচ্ছদ : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। উৎসর্গ : অজিতকুমার দত্ত। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩০। উৎসর্গের তারিখ : ১৯.১০.১৯৩০। ডি. এম লাইব্রেরি। দু-টাকা।

খ. (৮) + ৮৪ পৃ। ১৬ ডিমাই। নতুন প্রচ্ছদ : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৪০।

গ. তৃতীয় সংস্করণ : আগস্ট ১৯৪৭। আড়াই টাকা।

ঘ. চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬২। ৮০ পৃ। ৮ রয়্যাল। প্রচ্ছদ ও চিত্র : জ্যোতির্ময় দত্ত। পাঁচ টাকা।

৫. **রেখাচিত্র** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯২৮-২৯। (৮) +১৬০ পৃ। ১৬ ক্রাউন। উৎসর্গ : অমলেন্দু বসু। প্রথম প্রকাশ। : ১৯৩১। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্।

৬. **অকর্ম্মণ্য** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯২৯। উৎসর্গ : প্রভু গুহঠাকুরতা। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৩১। ডি. এম. লাইব্রেরি।

৭. **এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৩০-৩১। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

খ. পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৪৬। (৬) + ২৫০ পৃ। ১৬ ক্রাউন। ডি. এম. লাইব্রেরি। চার টাকা।

৮. **মন-দেয়া-নেয়া** (উপন্যাস)) : রচনাকাল : জুলাই ১৯৩২। (৬) +১৫৪ পৃ। উৎসর্গ : প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৩২। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স। এক টাকা বারো আনা।

৯. **যবনিকা-পতন** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩১। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৩২। গ্রন্থকার।

খ. (৪) + ২৫২ পৃ। ১৬ ক্রাউন। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৫২। চার টাকা।

১০. **রডোডেনড্রন-গুচ্ছ** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩২। (৪) + ১৬৩ পৃ। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৩২। এন. এম্. রায়চৌধুরী এণ্ড কোং। দু-টাকা।

১১. **একটি কথা** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৩০-৩১। ১৬ পৃ। ১৬ ডিমাই। প্রথম প্রকাশ :

ডিসেম্বর ১৯৩২। গ্রন্থকার। চার আনা।

১২. **সানন্দা** (উপন্যাস) : রচনাকাল : মার্চ-এপ্রিল ১৯৩২। (৮) + ১০৩ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। **প্রথম প্রকাশ** : মে ১৯৩৩। গ্রন্থকার।

১৩. **রঙিন কাচ** (গল্প) : রচনাকাল : ১৯২৯-৩১। **প্রথম প্রকাশ** : মে ১৯৩৩। দেব সাহিত্য কুটীর। আট আনা।

খ. (২) +৫২ পৃ°। ১৬ রয়্যাল ক্রাউন। পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৪৮।

১৪. **পৃথিবীর পথে** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯২৬-২৮। (৪) + ৪৪ পৃ°। ১৬ ডিমাই। জ্যাকেটের ছবি : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। **প্রথম প্রকাশ** : জুলাই ১৯৩৩। গ্রন্থকারমণ্ডলী। এক টাকা।

১৫. **অদৃশ্য শত্রু** (ছোটো গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩২-৩৩। (৬) +১৮৪ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। **প্রথম প্রকাশ** : ১৯৩৩। প্রকাশক : শ্যামসুন্দর মজুমদার।

১৬. **আমার বন্ধু** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩২। (৬) +১০৫ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। উৎসর্গ : সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু। প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৩৩। প্রকাশক : জি.সি. সোম। এক টাকা চার আনা।

খ. পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৫৪। (২) + ৯৯ পৃ.। ১৬ ক্রাউন। **প্রচ্ছদ** : রমেন্দ্র কুণ্ডু (গু)। জিজ্ঞাসা। দু টাকা।

১৭. **যেদিন ফুটলো কমল** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৩। (৪) +২৫২ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। **প্রথম প্রকাশ** : অগস্ট ১৯৩৩। প্রকাশক : শ্যামসুন্দর মজুমদার। দু-টাকা।

খ. কাত্যায়নী বুক স্টল।

গ. পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৪৬। (৪)+ ২০২ পৃ° ১৬ ডিমাই। সাড়ে তিন টাকা।

ঘ. পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬২। (৬) +১৮২ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। **প্রচ্ছদ** : সুব্রত ত্রিপাঠী। এম. সি. সরকার। চার টাকা।

১৮. **হে বিজয়ী বীর** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৩। (৪) +২২২ পৃ°। ৮ ক্রাউন। **প্রথম প্রকাশ** : অক্টোবর ১৯৩৩। বরেন্দ্র লাইব্রেরি। দু-টাকা।

খ. (৪) +২১৬ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। **প্রচ্ছদ** : অজিত গুপ্ত। নূতন সংস্করণ : ১৯৫৩। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড। সাড়ে তিন টাকা।

গ. সংক্ষিপ্ত তৃতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৫৫।

১৯. **ধূসর গোধূলি** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৩। **প্রথম প্রকাশ** : ১৯৩৩। প্রকাশক : জি.সি. সোম।

খ. পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৪৭। (৪) +২১৪ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। **প্রচ্ছদ** : ধরণী সেনগুপ্ত। নিউ এজ। চার টাকা।

২০. **অনেক রকম** (নাট্যোপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩০। ১৬২ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। **প্রথম প্রকাশ** : ১৩৪০। দেব সাহিত্য-কুটীর। এক টাকা।

খ. সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৪৯। (২)+১২২ পৃ.। এক টাকা।

গ. সংক্ষিপ্ত তৃতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৫৫।

২১. **অসূর্যম্পশ্যা** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৩। (৪) +১৬০ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। **প্রথম প্রকাশ** :

ডিসেম্বর ১৯৩৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরি। দেড় টাকা।

খ. দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫০ (?)। আড়াই টাকা।

২২. **ঘুম-পাড়ানি (*গল্প)** : রচনাকাল : ১৯৩১-৩২। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৩। দি বুক স্টল।

২৩. **এলোমেলো (*উপন্যাস)** : রচনাকাল : ১৯৩২। (৪) +৭২ পৃ॰। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৩। এম. সি. সরকার। আট আনা।

খ. ক্যালকাটা বুক ক্লাব। এক টাকা চার আনা।

গ. ৯৬ পৃ॰। ১৬ ডিমাই। চিত্রশিল্পী (প্রচ্ছদ?) : বিমল দাস। পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬৮। দু-টাকা।

২৪. **জলতরঙ্গ (*নাট্যোপন্যাস)** : রচনাকাল : ১৯৩০। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৩। যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস।

২৫. **মিসেস্ গুপ্ত** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪। (৮) +২০১ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৩৪। শ্রীগুরু লাইব্রেরি।

২৬. **একদা তুমি প্রিয়ে** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৩। (৪) +১৪১ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৩৪। লেক বুক স্টল। দেড় টাকা।

খ. পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ : জুলাই ১৯৪৬। (২) +১৪৫ পৃ.। কাত্যায়নী বুক স্টল। আড়াই টাকা।

২৭. **সু(সূ)র্য্যমুখী** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৪। (৮) +১৬৪ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৩৪। শ্রীগুরু লাইব্রেরি। দেড় টাকা।

খ. (২) +১৩৬ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। দ্বিতীয় সংস্করণ : (?)। প্রকাশক : প্রভাষ(স) চন্দ্র মজুমদার। দু-টাকা চার আনা।

২৮. **প্রেমের বিচিত্র গতি** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল ১৯৩৩-৩৪। (৪) +পৃ॰। ৮ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪। বরেন্দ্র লাইব্রেরি। দেড় টাকা।

২৯. **শ্বেতপত্র** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪। (৪) +১২৯ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪। বরেন্দ্র লাইব্রেরি। এক টাকা চার আনা (অতিরিক্ত চার আনা)।

৩০. **বিসর্পিল** (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৪। (৪)+২০০ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৪১। এম. সি. সরকার। দু-টাকা।

খ. (২) + ১৯৮ পৃ.। ১৬ ডিমাই। নূতন সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৩। তিন টাকা।

৩১. **বনশ্রী** (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৪। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪। কাত্যায়নী বুক স্টল।

৩২. **রূপালি পাখি** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৪। (৬) +১০৯ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। উৎসর্গ : পঙ্কজকুমার দাশগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৩৪। ডি. এম. লাইব্রেরি। এক টাকা।

৩৩. **লাল মেঘ** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৪। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪। শ্রীগুরু লাইব্রেরি।

খ. পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ : ১৯৫৩। (৪)+২০৪ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড। তিন টাকা।

৩৪. **পরস্পর** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩২-৩৪। (৮)+২১৮ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৩৪। ডি. এম. লাইব্রেরি। দু-টাকা।

৩৫. **অসামান্য মেয়ে** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল ১৯৩৩-৩৪। (৬) +১১০ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৩৪। কাত্যায়নী বুক স্টল। এক টাকা।

৩৬. **বাড়ি-বদল** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৪। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৩৫। ডি. এম্. লাইব্রেরি। এক টাকা।

৩৭. **ঘরেতে ভ্রমর এলো** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪। (৪) +১০৭ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৩৫। প্রকাশক : রমেন্দ্রকুমার শীল। এক টাকা।

৩৮. **বাসর ঘর** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৫। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। ডি. এম. লাইব্রেরি।

খ. (৪) +২২৪ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩। সাড়ে তিন টাকা।

৩৯. **হঠাৎ-আলোর ঝলকানি** (প্রবন্ধ) : রচনাকাল : ১৯৩২-৩৪। (৬) +১৬৪ পৃ°। ৮ ডিমাই। উৎসর্গ : রমেশচন্দ্র মজুমদার ও জগন্নাথ হল্। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্। এক টাকা বারো আনা।

খ. পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ১৯৪৬। (৪)+১২৪ পৃ°। ১৬ ডিমাই। দু-টাকা।

গ. পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৫৮। (৪) +১১৫ পৃ°। বেঙ্গল পাবলিশার্স। আড়াই টাকা।

৪০. **সাগর-রহস্য** (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে *গল্প) : রচনাকাল ১৯৩৫। (২)+ ৬৭ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৪২। এম্. সি. সরকার। আট আনা।

৪১. **কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড** (গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৫। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৫। কমলা পাবলিশিং হাউস।

খ. (৪) + ৭১ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র : মণীন্দ্র মিত্র। নতুন সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৯। আনন্দধারা। এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

৪২. **অপরূপ রূপকথা** (আণ্ডেরসন-এর অনুবাদ) : দুই খণ্ডে। রচনাকাল : ১৯৩৫। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৫।

খ. (৮)+১৫০ পৃ°। ১৬ ডিমাই। চিত্র (প্রচ্ছদ?) : জে. সেন। প্রথম অভ্যুদয় সংস্করণ : মে ১৯৬২। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। তিন টাকা।

গ. (৮) +১৪৮ পৃ°। দ্বিতীয় অভ্যুদয় সংস্করণ : জুন ১৯৬৮। চার টাকা।

৪৩. **পারিবারিক** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৫ (৪) +২০৮ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৩৬। ডি. এম. লাইব্রেরি। দু-টাকা।

৪৪. **নতুন নেশা** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৩২-৩৩। (৪) +পৃ°। ১৬ ক্রাউন প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৩৬। নাথ ব্রাদার্স। দেড় টাকা।

৪৫. **আজগুবি জানোয়ার** (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগে * গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৬। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৬। সেন ব্রাদার্স।

৪৬. **শনিবারের বিকেল** (* গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩২-৩৫। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৬। নাথ ব্রাদার্স।

৪৭. **কঙ্কাবতী** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯২৯-৩২ ও ৩৪। (৮) + ৭৪ পৃ°। প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৩৭। কবিতাভবন। দু-টাকা।

খ. পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৪৩। (৬) + ৬৬ পৃ.। ৮ রয়্যাল।

প্রচ্ছদ : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। দু-টাকা চার আনা।

গ. পরিবর্ধিত সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৫৭। ৯৮ পৃ। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : সৌরেন সেন ও অর্ধেন্দুশেখর দত্ত। নাভানা। তিন টাকা।

৪৮. **সমুদ্রতীর** (ভ্রমণ) : রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৭। (৬) + ৮১ পৃ। ১৬ ক্রাউন। উৎসর্গ : দিলীপকুমার রায়। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৩৭। কবিতাভবন। এক টাকা।

খ. লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত নিউ এজ সংস্করণ : ১৯৫৩ (৪) + ৮১ পৃ। ১৬ ডিমাই। দেড় টাকা।

৪৯. **আমি চঞ্চল হে** (ভ্রমণ) : রচনাকাল : ১৯৩৫-৩৬। (৪) + ১০৮ পৃ। ১৬ ডিমাই। প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৩৭। ডি. এম্. লাইব্রেরি। এক টাকা চার/আট/বারো আনা।

৫০. **গল্প-ঠাকুর্দা** (* গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৪। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৪৫। ইস্টার্ণ ল-হাউস। ছ-আনা।

খ. নব ভারতী। এক/দেড় টাকা।

৫১. **পরিক্রমা** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৬। (৪) + ২০৩ পৃ। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। ডি. এম. লাইব্রেরি। দু টাকা।

খ. আষাঢ় ১৩৬১। সাড়ে তিন টাকা।

৫২. **এক পেয়ালা চা** (* গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩২-৩৮। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৪৫। ইস্টার্ণ-ল-হাউস। ছ আনা।

খ. নব ভারতী। বারো আনা।

৫৩. **নতুন পাতা** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৩৩-৩৯। (৮) + ১১৫ পৃ। ৮ ডিমাই। উৎসর্গ : প্রতিভা বসু। প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৪০। কবিতাভবন। দু টাকা।

৫৪. **পথের রাত্রি** (* গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৮। ৬২ পৃ। ১২ রয়াল ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৪৭। ইস্টার্ণ-ল-হাউস। আট আনা।

খ. ভারতী বুক স্টল। এক টাকা।

৫৫. **দস্যুর দলে ভোমরা** (* উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৩৯। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪০। বি. এন. পাবলিশিং হাউস।

৫৬. **ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৭-৩৯। (৬) + ১৬১ পৃ.। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৪১। ডি. এম. লাইব্রেরি। দেড় টাকা।

৫৭. **সব-পেয়েছি দেশে** (ভ্রমণ) : রচনাকাল : ১৯৪১। (৮) + ১০৬ পৃ। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। উৎসর্গ : অমিয় চক্রবর্তী। প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৪১। কবিতাভবন। দেড় টাকা।

খ. ৮ ডিমাই। দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৪৪। দু-টাকা।

গ. নতুন সংস্করণ : মে ১৯৫৩। ১৪১ পৃ। ১৬ ইম্পিরিয়াল। চিত্র : ইন্দ্র দুগার। নাভানা। আড়াই টাকা।

৫৮. **ঘুমের আগের গল্প** (* গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৮। ১৬ ইম্পিরিয়াল। উৎসর্গ : মিমিমণি। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৪৮। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। বারো আনা।

৫৯. **ভদ্রতা কাকে বলে** (* গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৬-৩৮। ১৬ ক্রাউন। উৎসর্গ : বাবলুবাবুকে। প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৪৮। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। বারো আনা।

৬০. **এক পয়সায় একটি** ('এক পয়সায় একটি' কবিতা গ্রন্থমালার প্রথম সংখ্যা) : রচনাকাল ১৯৩৭-৪১। ১৬ পৃ"। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : যামিনী রায়। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৪২। কবিতাভবন। চার আনা।

খ. দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ১৯৪৩।

৬১. **কালো হাওয়া** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৩৩৯ ৪০/(৪) + ৩৮৩ পৃ"। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৪২। ডি. এম. লাইব্রেরি। তিন টাকা।

খ (৪) +৩৮৩ পৃ"। দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৪৬। পাঁচ টাকা।

গ. (২) +৩৮৩ পৃ"। তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। ছ-টাকা।

৬২. **২২শে শ্রাবণ** ('এক পয়সায় একটি' কবিতা গ্রন্থমালার পঞ্চম সংখ্যা) : রচনাকাল : ফাল্গুন ১৩৪৮-শ্রাবণ ১৩৪৯। ১৬ পৃ। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : শম্ভু সাহা। প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৪২। কবিতাভবন। চার আনা।

৬৩ **ছায়া কালো-কালো** ('কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিরিজের পঞ্চম * উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৪২। ১০০ পৃ। ১৮ ইম্পিরিয়াল। প্রথম প্রকাশ ১৯৪২। দেব সাহিত্য কুটীর। আট আনা।

৬৪. **ভূতের মত অদ্ভুত** ('কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিরিজের ষোড়শ * উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৪২। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪২। দেব সাহিত্য-কুটীর। আট আনা।

৬৫. **জীবনের মূল্য** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৪২। (৪) +১৩৭ (১৩৯) পৃ"। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪২। শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরি। এক টাকা বারো আনা।

৬৬. **বিদেশিনী** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৪১-৪৩। ৩২ পৃ"। ১/২ ডিমাই। প্রচ্ছদ : যামিনী রায়। উৎসর্গ : রানু। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৪৩। কবিতাভবন। আট আনা।

৬৭. **দময়ন্তী** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৩৫-৪২। (৬) +৮২ পৃ"। ৮ রয়্যাল। প্রচ্ছদ : যামিনী রায়। উৎসর্গ : সমর সেন ও জীবনানন্দ দাশ। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৪৩। কবিতাভবন। আড়াই টাকা।

৬৮. **খাতার শেষ পাতা** (ছোটো গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩৬/৩৭-৪৩। (২) +১৮১ পৃ"। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৩। শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরি। দু-টাকা চার আনা।

৬৯. **মায়া-মালঞ্চ** ('কালো হাওয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ) : রচনাকাল : ১৯৪৩। (৮)+ ১০৫ পৃ"। প্রচ্ছদ : যামিনী রায়। উৎসর্গ : রমা। প্রথম প্রকাশ : ৩ মার্চ ১৯৪৪। কবিতাভবন। দেড় টাকা।

৭০. **হাউই** (অস্কার ওয়াইল্ড-এর অনুবাদ) : রচনাকাল : ১৯৩৭-৪৪। (৮) +১০৯ পৃ"। ডিমাই। চিত্র (প্রচ্ছদ?) : সত্যজিৎ রায়। প্রথম প্রকাশ : ১৩৫১। ভূমিকার তারিখ : ১লা আষাঢ় ১৩৫১। সিগনেট প্রেস। দু-টাকা চার আনা।

খ. দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৫৩।

গ. অনুবাদক কর্তৃক পরিশোধিত সংস্করণ : জুলাই ১৯৬৮। ১১২ পৃ"। প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র : বিমল দাস। শ্রীপ্রকাশভবন। তিন টাকা।

৭১. **রূপান্তর** (সংখ্যাযুক্ত ও লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিমিত সংস্করণ কবিতা) : রচনাকাল : ৩০ জানুয়ারি-২৬ জুন ১৯৪৪। (৮) +২৩ পৃ"। উৎসর্গ : সৌরেন সেন। প্রথম প্রকাশ : ১৯ জুলাই ১৯৪৪। কবিতাভবন। পাঁচ টাকা।

৭২. **হাওয়া বদল** ('ছোটোগল্প' গ্রন্থমালার সপ্তম সংখ্যা) : রচনাকাল : ১৯৪৪। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪। কবিতাভবন। পাঁচ আনা।

৭৩. **অদর্শনা** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৪৩-৪৪। (৪) +২৩৬ পৃ`। ১৬ ক্রাউন। **প্রথম প্রকাশ**: ১৯৪৪। শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরি। তিন টাকা।

৭৪. **পিরানদেল্লোর গল্প** (সম্পাদনা, ভূমিকা ও দু-টি গল্পের অনুবাদ) : রচনাকাল : ১৯৪৪ (৪) +২০৬ পৃ`। ১৬ ক্রাউন। প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র : সত্যজিৎ রায়। **প্রথম প্রকাশ** : ১৩৫২। সিগনেট প্রেস। তিন টাকা।

৭৫. **একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা** ('ছোটোগল্প' গ্রন্থমালার ১৭-১৮ যুগ্ম সংখ্যা) রচনাকাল : ১৯৪৫। (৪) +২৪ পৃ`। ৮ ডিমাই। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল-মে ১৯৪৫। কবিতাভবন। আট আনা।

৭৬. **কালবৈশাখীর ঝড়** ('প্রহেলিকা' সিরিজের চতুর্দশ * উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৪৩। প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২। দেব-সাহিত্য-কুটীর।

খ. পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৬২। এক টাকা।

৭৭. **উত্তর তিরিশ** (প্রবন্ধ) : রচনাকাল ১৯৩৭-৪৪। (৮) +১৮৪ পৃ`। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রচ্ছদ : সৌরেন সেন। উৎসর্গ : যতীন্দ্র মোহন ও শোভনা মজুমদার। প্রথম প্রকাশ : ১৯ জুলাই ১৯৪৫। কবিতাভবন। সাড়ে তিন টাকা।

খ. রচনাকাল : ১৯৩৭-৪৫ ও ৪৭। (৮) +২১৬ পৃ`। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৫২। নিউ এজ। চার টাকা।

৭৮. **গল্প সংকলন** (গল্প-সংকলন) : রচনাকাল : ১৯২৮-৪৫। (৮) +৩১২ পৃ`। ৮ রয়্যাল। প্রথম প্রকাশ : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। কবিতাভবন। পাঁচ/ছ-টাকা চার আনা।

৭৯. **গ্রন্থপঞ্জী** (১৯৩০-৪৫) (গ্রন্থপঞ্জি) : ১২ পৃ`। ডিমাই। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৪৫। কবিতাভবন। চার আনা।

৮০. **একটি কি দুটি পাখি** ('ছোটোগল্প' গ্রন্থমালার ২৯ সংখ্যা) : রচনাকাল : ১৯৪৬। ১৬ পৃ`। ১৬ ডিমাই। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৪৬। কবিতাভবন। পাঁচ আনা।

৮১. **বিশাখা** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৪৫। (৪) +১২৪ পৃ`। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রচ্ছদ : সৌরেন সেন। প্রথম প্রকাশ : ১৯ জুলাই ১৯৪৬। কবিতাভবন। আড়াই টাকা।

খ. (৪) + ১০৬ পৃ`। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। নতুন সংস্করণ : মে ১৯৬২। আনন্দধারা। দু-টাকা।

৮২. **কালের পুতুল** (সমালোচনা) : রচনাকাল : ১৯৩৫-৪৫। (৮) +১৮৬ পৃ`। ৮ ডিমাই। প্রচ্ছদ : যামিনী রায়। উৎসর্গ : যামিনী রায়। প্রথম প্রকাশ : ২ অক্টোবর ১৯৪৬। কবিতাভবন। চার টাকা।

খ. নতুন সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৫৯। রচনাকাল : ১৯৩৫-৫৫। (৮) +১৪৭ পৃ`। ১৬ ডিমাই। নিউ এজ। সাড়ে তিন টাকা।

৮৩. **দ্রৌপদীর শাড়ি** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৪৪-৪৭। (৬)+ ৮৪ পৃ`। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রচ্ছদ : সৌরেন সেন। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৪৮। কবিতাভবন। আড়াই টাকা।

৮৪. **An Acre of Green Grass** (সমালোচনা) : (১০) +১০৭ পৃ`। ১৬ ডিমাই। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৮। ওরিয়েন্ট লংম্যানস্। সাড়ে চার টাকা।

৮৫. **তিথিডোর** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৪৬-৪৯। (৮) +৭৭৬ পৃ`। ১৬ ডিমাই। জ্যাকেট : ধরণী সেনগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। নিউ এজ। আট টাকা।

খ. দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ১৯৫৪।

গ. তৃতীয় মুদ্রণ : মে ১৯৫৭।

৮৬. **অন্য কোনখানে (* উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৪৭। (৮) + ১৬৬ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রচ্ছদ : ধরণী সেনগুপ্ত। উৎসর্গ : রুমি। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫০। নিউ এজ। দু-টাকা।**

খ. (৪) +১৪৮ পৃ.। ১৬ ক্রাউন। দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ১৯৫৮। আড়াই টাকা।

৮৭. **মনের মতো মেয়ে** (উপন্যাস) : (৪) +১৫৭ পৃ°। ইম্পিরিয়াল। প্রকাশ : শুভ বৈশাখ ১৩৫৮। দেব সাহিত্য-কুটীর। দু-টাকা।

খ. (৪) +১৬৩ পৃ°। পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৯।

৮৮. **নির্জন স্বাক্ষর** (উপন্যাস) : রচনাকাল ১৯৫১। (৪) + ২১১ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৫১। ডি. এম. লাইব্রেরি। তিন টাকা।

খ. দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৬৫। সাড়ে তিন টাকা।

৮৯. **তুমি কি সুন্দর** ('অদর্শনা' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ) : (৪) +২৫০ পৃ°। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রকাশ : ১৩৫৮। দেব সাহিত্য-কুটীর। দু-টাকা।

৯০. **তাসের প্রাসাদ** ('অলকানন্দা' সিরিজের অষ্টাদশ * উপন্যাস) : (৮) ১০৪ পৃ°। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৮। শরৎ-সাহিত্য-ভবন। এক টাকা।

৯১. **শ্রেষ্ঠ গল্প** (গল্প-সংকলন) : রচনাকাল : ১৯২৭-৪৬। (৬) +১৯০ +২৫৮ পৃ°। ১২ ডিমাই। প্রচ্ছদ : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। উৎসর্গ : (স্বর্গত) পরিমল রায়। প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯। বেঙ্গল পাবলিশার্স। পাঁচ টাকা।

৯২. **মৌলিনাথ** (উপন্যাস) : (৮) +২০৩ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৫২। ডি. এম্. লাইব্রেরি। সাড়ে তিন টাকা।

৯৩. **ক্ষণিকের বন্ধু** ('অনেক রকম' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ) : (৪) +১৮৬+ (২) পৃ°। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯। দেব সাহিত্য-কুটীর। দু-টাকা।

৯৪. **শ্রেষ্ঠ কবিতা** (কবিতা সংকলন) : রচনাকাল : ১৯২৬-৫২ (২) + ১৩৬ পৃ°। ৮ রয়্যাল। প্রচ্ছদ ইন্দ্র দুগার। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। নাভানা। পাঁচ টাকা।

খ. ১৬২ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : মণীন্দ্র মিত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ১৯৬০।

৯৫. **আধুনিক বাংলা কবিতা (সম্পাদিত সংকলন) : (২০) +২৫৬ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬০। এম. সি. সরকার। পাঁচ/সাড়ে ছ-টাকা।**

খ. দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ১৯৫৪

গ. (২২) +২৬৮ পৃ°। তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৫৯। ছ-টাকা।

ঘ. (২৪) +২৭৬ পৃ°। চতুর্থ সংস্করণ : অগস্ট ১৯৬৩।

৯৬. **বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (প্রতিভা বসুর সহযোগে উপন্যাস) : (৪) +১৬৬+ (১৬) পৃ°। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রকাশকাল : ১লা বৈশাখ ১৩৬১। দেব সাহিত্য-কুটীর। তিন টাকা।**

খ. (৪) +১৬৬ পৃ°। পুনর্মুদ্রণ : দশহরা ১৩৬৭।

৯৭. **সাহিত্যচর্চা (সমালোচনা) : রচনাকাল : ১৯৪৬-৫২। ১৯৪ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬১। সিগনেট প্রেস। তিন টাকা।**

খ. পরিমার্জিত সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৮। ত্রিবেণী প্রকাশন। (৮) +১৫৯ পৃ°। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। তিন টাকা বারো আনা।

৯৮. **শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৪০-৫৪। ১১৪ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : সৌরেন সেন ও রণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫। নাভানা। আড়াই টাকা।

খ. দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ১৯৫৬।

গ. তৃতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৬০।

৯৯. **চার দৃশ্য** (ছোটোগল্প) : (৪) + ১৩০ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রচ্ছদ : রমেন্দ্রকুমার কুন্ডু। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬২। জিজ্ঞাসা। আড়াই টাকা।

১০০. **স্ব-নির্বাচিত গল্প** (গল্প-সংকলন) : (১২) + ২২৩ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : ৭ই বৈশাখ ১৩৬২। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড। চার টাকা।

১০১. **রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য** (সমালোচনা) : রচনাকাল : ১৩৪৬-৫৯ বঙ্গাব্দ। (৮) +২০৪ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ অজিত গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৫৫। নিউ এজ। সাড়ে তিন টাকা।

খ. (৮) +১৪১ পৃ°। দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ১৯৫৯।

গ. ১৪০ পৃ°। তৃতীয় সংস্করণ : মে ১৯৬২।

১০২. **ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প** (* গল্প) : রচনাকাল : ১৯৩০-৪৫। ৮ (৮) +১৩৬ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : মণীন্দ্র মিত্র। ভিতরের ছবি : কার্তিক মজুমদার ও বিমল দাস। উৎসর্গ : পাপ্পা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৫৫। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির। দু টাকা।

খ. (৮) +১২৬ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : সমীর রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ১৯৫৭।

১০৩. **একটি কি দুটি পাখী** (ছোটোগল্প) : (৬) + ১২৮ পৃ°। ১৬ ক্রাউন। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৫৫। ত্রয়ী প্রকাশনী। দু টাকা।

১০৪. **বারোমাসের ছড়া** (* কবিতা) : রচনাকাল : ১৯২৯-৫৫। (৮) +১১২ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ ও নামপত্র। : জ্যোতির্ময় দত্ত। ভিতরের ছবি : সৌরেন সেন, মণীন্দ্র মিত্র, দময়ন্তী বসু। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। এম. সি. সরকার। তিন টাকা।

১০৫. **রান্না থেকে কান্না** (* গল্প) : (৮) + ৭১ পৃ°। ১৬ রয়্যাল ক্রাউন। প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : ৭ই আশ্বিন ১৩৬৩। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড। এক টাকা চার আনা।

১০৬. **শেষ পাণ্ডুলিপি** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৫৫-৫৬। (৮) +১৭৫ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ : বিরাম মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৫৬। এম. সি. সরকার। তিন টাকা চার আনা।

খ. দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৭৬। পাঁচ টাকা।

১০৭. **সুখী রাজপুত্র** (* গল্প) (৪) + ৬০ (৪) পৃ°। ৮ রয়্যাল ক্রাউন। চিত্র : শৈল চক্রবর্তী ও ধীরেন বল। প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৩। শরৎ-সাহিত্য-ভবন। এক টাকা চার আনা।

১০৮. **স্বার্থপর দৈত্য** (* গল্প) : (৪) +৫৬+ (৪) পৃ°। ৮ রয়্যাল ক্রাউন। চিত্র : শৈল চক্রবর্তী ও ধীরেন বল। শরৎ-সাহিত্য-ভবন। এক টাকা চার আনা।

১০৯. **স্বদেশ ও সংস্কৃতি** (সমালোচনা) : রচনাকাল : ১৯৪৫-৫৭। (৪) + ১৩৭ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৭। বেঙ্গল পাবলিশার্স। আড়াই টাকা।

খ. পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬০। রচনাকাল : ১৯৪৫-৫৮। (৮) + ১৮৯ পৃ°। চার টাকা।

১১০. **কালিদাসের মেঘদূত** (মূলসহ অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা) : রচনাকাল : (৮) + ১৯৬ পৃ°। ১৬

ডিমাই। প্রচ্ছদ : সৌরেন সেন। বর্ণলিপি : অর্ধেন্দু দত্ত। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৭। এম. সি. সরকার। সাড়ে পাঁচ টাকা।

খ. দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৫৯। ছ-টাকা।

গ. তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ১৯৬৩। সাড়ে ছ-টাকা।

ঘ. পরিশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৬৮। (৮) +১৯৮ পৃ˝। সাড়ে সাত টাকা।

১১১. **যে-আঁধার আলোর অধিক** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৫৪-৫৮। ৭২ পৃ˝। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : সৌরেন সেন। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৫৮। এম. সি. সরকার। আড়াই টাকা।

খ. প্রচ্ছদ : শুদ্ধশীল বসু ও ধ্রুব রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ . মে ১৯৬৬। তিন টাকা।

১১২. **জ্ঞান থেকে অজ্ঞান** (* গল্প) : (৬) + ৮৮ পৃ˝। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রচ্ছদ : গণেশ বসু। প্রথম প্রকাশ . মহালয়া ১৩৬৫। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। এক টাকা ষাট পয়সা।

১১৩. **শোণপাংশু** (উপন্যাস) · রচনাকাল · ১৯৫৮। ১৯৩ পৃ˝। ১৬ ডিমাই। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৫৯ . এম. সি. সরকার। চার টাকা।

১১৪. **নীলাঞ্জনের খাতা** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৫৬। (৬)+ ১৯৪ পৃ˝। ১৬ ক্রাউন। প্রচ্ছদ : নিতাই মল্লিক। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬০। বেঙ্গল পাবলিশার্স। চার টাকা।

১১৫. **দুই ঢেউ, এক নদী** ('পারিবারিক' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ) : ১৯১ পৃ˝। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : বীরেন দে। প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৭। উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির। আড়াই টাকা।

১১৬. **একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু** : (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৫৪-৫৯। (৮) +১৮৪ পৃ˝। ১৬ ক্রাউন। প্রচ্ছদ : মণীন্দ্র মিত্র। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬০। এম. সি. সরকার। তিন টাকা।

১১৭. **ডাক্তার জিভাগো** (কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা) : (৮) +৭৮২ পৃ˝। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : নিতাই মল্লিক। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০। বেঙ্গল পাবলিশার্স ও রূপা অ্যাণ্ড কোং। সাড়ে বারো টাকা।

১১৮. **হ্যামেলিনের বাঁশিওলা** (৬) + ৯০ পৃ˝। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : চারু খান। উৎসর্গ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৭। শ্রীপ্রকাশভবন।

খ. ৯৬ পৃ˝। দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭০।

১১৯. **শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা** (অনুবাদ, ভূমিকা, টীকা) : রচনাকাল : ১৯৪৯-১৯৫৮। (১৬) +২৮৫ পৃ˝। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬১। নাভানা। আট টাকা।

১২০. **কিশোর সঞ্চয়ন** (সংকলন) : (৬) +২২৭ পৃ˝। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : চারু খান। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬১। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির। চার টাকা।

খ. (৪) +২১৪ পৃ.। দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ১৯৬৫।

১২১. **হৃদয়ের জাগরণ** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৫৮-৬০। (৮) +১৬৮ পৃ˝। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৬৮। ত্রিবেণী প্রকাশন : সাড়ে তিন টাকা।

১২২. **জাপানি জার্নাল** (ভ্রমণ) : রচনাকাল : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬১। (৮) +১৪৩ পৃ˝। ক্রাউন। প্রচ্ছদ ও চিত্র : সুব্রত ত্রিপাঠী। উৎসর্গ : হেবর্নার ফ্রীডরিশ। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬২। এম. সি. সরকার। সাড়ে তিম টাকা।

১২৩. **Tagore : Portrait of a Poet** (সমালোচনা) : রচনাকাল : ১৯৬২। (৮) +১১৪ পৃ˝।

৮ রয়্যাল। প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬২। বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। আট টাকা বারো আনা।

১২৪. **সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ** (সমালোচনা) : রচনাকাল : ১৯৫২-৬২। (৮) +২২৮ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : সুব্রত ত্রিপাঠী। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৩। এম. সি. সরকার। পাঁচ টাকা।

১২৫. **দময়ন্তী : দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা** (কবিতা) : প্রথম পরিমার্জিত যুগ্ম সংস্করণ : জুলাই ১৯৬৩। রচনাকাল : ১৯৩৫-৪৭ ও ১৯৫৪। (১০) +১৬৮ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। এম. সি. সরকার। চার টাকা।

১২৬. **ভাসো আমার ভেলা** (গল্প-সংকলন) : রচনাকাল : ১৯২৮-৬২। (১০) +৫৮২ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ : নরেশ ও চিনু। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৩। এম. সি. সরকার। বারো টাকা।

১২৭. **ছোটোদের ভালো ভালো গল্প** (* গল্প) : ৯৬ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : চারু খান। প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭০। শ্রীপ্রকাশ ভবন। দু-টাকা।

১২৮. **বই ধার দিয়ো না** (* গল্প) : (৪) +৭৬ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ ও চিত্র : মণীন্দ্র মিত্র। প্রথম প্রকাশ : বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৭৩। অন্যলেখা। এক টাকা আশি পয়সা।

১২৯. **দেশান্তর** (ভ্রমণ) : রচনাকাল ১৯৫৩-৫৪, ৬১, ৬৪-৬৫। (৮)+৩০৯ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : সুনীলমাধব সেন ও ধ্রুব রায়। উৎসর্গ : হুমায়ুন কবির। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬৬। এম. সি. সরকার। দশ টাকা।

১৩০. **প্রবন্ধ-সংকলন** (সমালোচনা ও প্রবন্ধ) : রচনাকাল : ১৯৪৩/৪-৬২ ও ১৯৩২-৬৫। (৮) +৩৯৩ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬৬। ভারবি। চোদ্দ টাকা।

১৩১. **কবি রবীন্দ্রনাথ** (সমালোচনা) : রচনাকাল : ১৯৬৫। ১৪৩ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পাণ্ডুলিপির ছবি। অক্ষরবিন্যাস : পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ : আবু সয়ীদ আইয়ুব। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৬৬। ভারবি। পাঁচ টাকা।

১৩২. **তপস্বী ও তরঙ্গিণী** (নাটক) : রচনাকাল : জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬। ১০০পৃ°। ১৬ লাইনো ইম্পিরিয়াল। প্রচ্ছদ : কোনারকের ভাস্কর্য। অক্ষরবিন্যাস : সুবোধ দাশগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৬৬। আনন্দ পাবলিশার্স। তিন টাকা। ১৯৬৭ সালের অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত।

খ. দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৬৮।

গ. তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৬৮।

১৩৩. **মরচে-পড়া পেরেকের গান** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৫৮-৬৬। ৭২ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৬। ভারবি। সাড়ে তিন টাকা।

১৩৪. **পাতাল থেকে আলাপ** (উপন্যাস) : রচনাকাল : মার্চ-এপ্রিল ১৯৬৬। (৮) +১৭১ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৭ : আনন্দ পাবলিশার্স। পাঁচ টাকা।

খ. (৪) +১৭১ পৃ°। দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৬৭।

১৩৫. **রাত ভ'রে বৃষ্টি** (উপন্যাস) : রচনাকাল : মে-জুন ১৯৬৬। ১৬৮ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬৭। এম. সি. সরকার। পাঁচ টাকা।

১৩৬. **তুমি কেমন আছো** (গল্প ও নাটিকা-সংকলন) : রচনাকাল : ১৯৬২-৬৬। (৮) +২২৯ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৬৭। আনন্দ পাবলিশার্স। ছয়-টাকা।

১৩৭. **হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা** (অনুবাদ, ভূমিকা, টীকা) : রচনাকাল : ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৬৬-৬৭। ৮২ পৃ॰। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৭। এম. সি. সরকার। সাড়ে তিন টাকা।

১৩৮. **গোলাপ কেন কালো** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৬৭। (৮) +১৬৯। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮। আনন্দ পাবলিশার্স। পাঁচ টাকা।
খ. দ্বিতীয় মুদ্রণ : অগস্ট ১৯৬৮।

১৩৯. **কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ** (নাটক) রচনাকাল : ১৯৬৭। ১৬৬ পৃ॰। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৬৮। আনন্দ পাবলিশার্স। পাঁচ টাকা।

১৪০. **হাসির গল্প** (* গল্প) : (৪)+৭১ পৃ॰। ৮ রয়্যাল ক্রাউন। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : ধীরেন বল। এ. কে. সরকার এণ্ড কোং। দু-টাকা। (এই গ্রন্থের প্রকাশকাল কেউ বলতে পারলেন না।)

১৪১. **আয়নার মধ্যে একা** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৬৭-৬৮। ১৫৬ পৃ॰। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬৮। এম. সি. সরকার। পাঁচ টাকা।

১৪২. **কালসন্ধ্যা** (কাব্যনাট্য) : রচনাকাল : ১৯৬৭-৬৮। ৯৪ পৃ॰। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। আনন্দ পাবলিশার্স। তিন টাকা।

১৪৩. **বিপন্ন বিস্ময়** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৫৯-৬৯। উৎসর্গ : অমিয় দেব/ স্নেহাস্পদেষু/উৎসাহদানের জন্য ধন্যবাদ। ২৭১ পৃ॰। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। আনন্দ পাবলিশার্স। আট টাকা।
খ. দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৭১।

১৪৪. **পুনর্মিলন** (নাটক) : রচনাকাল : ১৯৬৯। ১৪০ পৃ॰। ১৬ ক্রাউন। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৭০। আনন্দ পাবলিশার্স। চার টাকা।

১৪৫. **রাইনের মারিয়া রিলকে-র কবিতা** (অনুবাদ, ভূমিকা, টীকা) : রচনাকাল : ১৯৪৬-৬৮। ২২৮ পৃ॰। ছবি ৫। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পাউলা বেকার অঙ্কিত প্রতিকৃতি অবলম্বনে পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : অগস্ট : ১৯৭০। এম. সি. সরকার। সাড়ে পাঁচ টাকা। সূচি :
ভূমিকা রাইনের মারিয়া রিলকে : তাঁর কবিতা ও তাঁর জীবন (১১); অনুবাদকের বক্তব্য (৭০); 'প্রহর-পুঁথি' (৭৩) (১-৮); 'চিত্র-পুঁথি' (৮৩) (প্রবেশিকা, অশ্বারোহী, শৈশব, প্রতিবেশী, নিঃসঙ্গ, আশান্টিরা, হেমন্তদিন, হেমন্ত, সন্ধ্যা, গম্ভীর প্রহর, পূর্বানুভূতি, ঝোড়ো রাত্রি ৬ ও ৮); 'নতুন কবিতা' (৯৫) (অর্ঘ্য, আবিশাগ, বুদ্ধ, মধ্যযুগে ভগবান, চিতাবাঘ, নারীর অদৃষ্ট, শেষ সন্ধ্যা, বারাঙ্গনা, নাগরদোলা, হিস্পানি নর্তকী, অর্ফিয়ুস। ইউরিদিকে। হের্মিস, ভেনাসের জন্ম, দন হুয়ানের নির্বাচন, প্রেমে-পড়া মেয়ে, গরীয়ান বুদ্ধ); 'ডুয়িনো এলিজি' (১১৫) (১,২,৩,৯,১০); 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট : প্রথম খণ্ড' (১৩৭) (১-৩, ৫, ৭-৯, ১৫, ১৮-২০, ২২, ২৪-২৬); 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট : দ্বিতীয় খণ্ড' (১৫১) (১-৩, ৬, ১৩, ১৯, ২১-২৩, ২৫-২৮); অনুলিখন : আবিশাগ (১৬৫); টীকা (১৬৯); সংশোধন (২২৮)।

১৪৬. **অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ** (কাব্যনাট্য) : রচনাকাল : ১৯৬৯-৭০। ১৫৬ পৃ॰। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭০। পাঁচ টাকা।
সূচি :
অনাম্নী অঙ্গনা (১১); প্রথম পার্থ (৭৫)।

১৪৭. **একদিন : চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা** (কবিতা) (কলকাতা গ্রন্থমালা ৪) : রচনাকাল : ১৯৫২-৭০। ৭৮ পৃ॰। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : আলোকচিত্র : দেবব্রত রায়; নামাঙ্কন : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম

প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭১। কলকাতা। সাড়ে তিন টাকা।

সূচি :

১৪৮. **স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা** (কবিতা) : রচনাকাল : ১৯৬৭-৭০। ৭৩ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭১। আনন্দ পাবলিশার্স। চার টাকা।

সূচি :

১৪৯. **An anthology of Bengali Writings** (বাংলা সাহিত্যের সম্পাদিত সংকলন) : [XII]+168 pp Demy 1/16. First published : 1971 (Date of Editor's Foreword : January 1971) The Macmillan Company of India Ltd. (Sponsored by International Association for Cultural Freedom). Rs. 22.50

১৫০. **রুক্মি** (উপন্যাস) : রচনাকাল : ১৯৭১। ১৬০ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭২। দে'জ পাবলিশিং। ছয় টাকা।

১৫১. **প্রেমপত্র** (ছোটোগল্প) : রচনাকাল : ১৯৬৭-৭০। ১৬০ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ ও নামপত্র : দেবব্রত রায়। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭২। দে'জ পাবলিশিং। ছয় টাকা।

সূচি :

১৫২. **আমার ছেলেবেলা** (স্মৃতিকথা) : রচনাকাল : ১৯৭২। ১১৬ পৃ°। ১৬ ইম্পিরিয়াল। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৩। এম. সি. সরকার। তিন টাকা।

১৫৩. **সংক্রান্তি/প্রায়শ্চিত্ত : ইক্কাকু সেন্নিন** (কাব্যনাট্য) : রচনাকাল : ১৯৭০-৭১। ১১৫ পৃ°। ১৬ ডিমাই। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭৩। আনন্দ পাবলিশার্স। চার টাকা।

সূচি :